বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা : মতাদর্শ ও গদ্যশৈলী

মুনিরা সুলতানা

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০৯

শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মুনিরা সুলতানা** কর্তৃক উপস্থাপিত **'বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনা : মতাদর্শ ও গদ্যশৈলী'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. বেগম আকতার কামাল
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা : মতাদর্শ ও গদ্যশৈলী শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ডক্টর বেগম আকতার কামাল-এর তত্ত্বাবধানে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল. গবেষণাপত্র রূপে রচিত। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তাঁর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার অন্যতম প্রবর্তনা। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কিত তাঁর সংগ্রহে থাকা সমস্ত গ্রন্থ; তাঁর নিজ রচনা; এমনকি বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রিকা ও তথ্যাদি সরবরাহ করে তিনি প্রতিনিয়ত আমাকে এ কাজে গতিশীল রেখেছেন। এ গবেষণায় আমার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টায় তাঁর অবদান অপরিসীম।

আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি আমার শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন-এর ঋণ, যাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মটিকে করেছে পরিশীলিত।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা : মতাদর্শ ও গদ্যশৈলী শীর্ষক অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত– এক. 'বাংলা সমালোচনার পটভূমি ও ধারা'; দুই. 'বুদ্ধদেব বসুর সমালোচকমানস ও নন্দনচিন্তা : পরিপ্রেক্ষিত।' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে সমালোচনার সংজ্ঞার্থ, ধরন তথা প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা করে পাশ্চাত্য ও বাংলা সমালোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের সমালোচনা ভাবনা ও তাঁদের শিল্পদর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর শিল্পচিন্তা ও সমালোচনা বিষয়ক মতাদর্শের রূপ-রূপান্তর আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত– এক. 'রবীন্দ্র-কবিসত্তা ও কবিতার মূল্যায়ন'; দুই. 'রবীন্দ্র-উপন্যাস বিষয়ক বিবেচনা'; তিন. 'গল্পগুচ্ছ : ভাবাদর্শ ও শিল্পরূপ অন্বেষা'। এ অধ্যায়ের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের সাথে বুদ্ধদেব বসুর নানামাত্রিক সম্পর্ক বিশেষত রবীন্দ্র-সমালোচনায় তাঁর প্রাতিস্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কয়েকটি সূত্রে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর চিন্তা ও রবীন্দ্র কবিতার মূল্যায়ন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুদ্ধদেবের নিজস্ব উপন্যাস-চিন্তার আলোকে রবীন্দ্র-উপন্যাস কীভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা

হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর সমালোচনা-ভঙ্গির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বুদ্ধদেবীয় মতামত বা তাঁর রবীন্দ্র গল্পপাঠ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত– এক. 'পূর্বজ সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন'; দুই. 'আধুনিক কবি ও কবিতা : মতাদর্শিক অবস্থান ও নান্দনিক রূপাদর্শ'। অধ্যায়ের শুরুতে পূর্বসূরি ও সমকালীন সাহিত্যিক প্রসঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে একজন প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর নানা ভাবনাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে পূর্বসূরি সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন তথা দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা; পরিচ্ছেদে দুই-এ আধুনিক কবি ও কবিতার সাথে বুদ্ধদেব বসুর বৈচিত্র্যময় সম্পৃক্তি, তাঁর মতাদর্শ ও সমালোচনা রীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম– 'সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর গদ্যশৈলী : রূপ-রূপান্তর'। এ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনামূলক রচনাসমূহকে লক্ষ্য করে গদ্যকার হিসেবে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি (style), গদ্যরূপের বিভিন্ন নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে। বাংলা সমালোচনার গদ্যরীতিতে তাঁর গদ্যের অবস্থানকেও সংক্ষেপে নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যসমালোচনামূলক রচনা তথা প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। গবেষণার সময় *কালের পুতুল* (১৯৪৬), *An Acre of Green Grass* (1948), *সাহিত্যচর্চা* (১৯৫৪), *কালিদাসের মেঘদূত* (১৯৫৭), *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* (১৯৬১) ও *কবিতার শত্রু ও মিত্র* (১৯৭৪)– এই গ্রন্থসমূহসহ তার অন্যান্য রচনার উৎস হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক ২০০৭, ২০০৯, ২০১০ সালে প্রকাশিত *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত বুদ্ধদেব বসুর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (২০০৯) ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এ অভিসন্দর্ভের কম্পিউটার মুদ্রাকর সন্তোষ দত্তকে, তার যত্নশীল পরিশ্রমের জন্য। আমার মা ও বাবা, যাঁদের নিরন্তর উৎসাহ, পরিচর্যা ও নিবিড় স্নেহে প্রস্তুত আমার জীবনবোধ ও মন, তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। আমার এ অভিসন্দর্ভ আমার পরম শ্রদ্ধেয় নানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কৃতী ছাত্র ও

Dhaka University Institutional Repository

দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মানিকগঞ্জ-এর প্রাক্তন অধ্যাপক মোঃ আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকী ও নানী নুরুন্নাহার সিদ্দিকার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। গবেষণা-চলাকালীন সময়ে আমাকে সহযোগিতা করে উৎসাহ যুগিয়েছেন রেজাউল করিম। সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ **মুনিরা সুলতানা**

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়			১-৫৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	॥	বাংলা সমালোচনার পটভূমি ও ধারা	১-২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	॥	বুদ্ধদেব বসুর নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা ও সমালোচক মানস : পরিপ্রেক্ষিত	২৮-৫৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		বুদ্ধদেব বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬-৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	॥	রবীন্দ্র-কবিসত্তা ও কবিতার মূল্যায়ন	৬১-৬৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	॥	রবীন্দ্র-উপন্যাস বিষয়ক বিবেচনা	৬৯-৮৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	॥	‘গল্পগুচ্ছ’ : ভাবাদর্শ ও শিল্পরূপ অন্বেষা	৮৪-৯৩
তৃতীয় অধ্যায়		পূর্বসূরি ও সমকালীন সাহিত্যিক প্রসঙ্গে	৯৪-১৬৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	॥	পূর্বজ সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন	১০১-১১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	॥	আধুনিক কবি ও কবিতা : মতাদর্শিক অবস্থান ও নান্দনিক রূপাদর্শ	১১৫-১৬৪
চতুর্থ অধ্যায়		সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর গদ্যশৈলী : রূপ-রূপান্তর	১৬৫-১৮১
উপসংহার			১৮২-১৮৫
পরিশিষ্ট			১৮৬-১৮৯

প্রথম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ
বাংলা সমালোচনার পটভূমি ও ধারা

সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণই যদিও সমালোচনার উদ্দেশ্য তবে তা বিশেষ মূল্যবোধের মানদণ্ডে সাহিত্য-সৃষ্টির স্বরূপ নির্ণয় করে, ফলে সমালোচনার নানামাত্রিক ভঙ্গি বা গোত্রের জন্ম হয়। সাহিত্য-শিল্পের রূপ ও রসের বিচার থেকেই কালে কালে সমালোচনার নানা শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য উভয় সমালোচনার শুরুটা বিবেচনা করলে দেখা যায়, সঠিকভাবে সাহিত্য-সমালোচনা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র মেনে নন্দনতাত্ত্বিকেরা সমালোচনা শুরু করেন নি। সমালোচনার সাধারণ বিভাগ দুটি প্রকারান্তরে তিনটি। একটি হল তাত্ত্বিক সমালোচনা অপরটি বিচার-বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা। তাত্ত্বিক সমালোচনায় সমালোচনার মূল তত্ত্বগুলো সামনে রেখে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কোনো রচনার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে তাঁর মূল তাৎপর্য, বিভাগ-বিন্যাস, কলাকৌশল, স্রষ্টার মানসিক অভিরুচি ইত্যাদি বিচার করা হয়। এ ধরনের আলোচনা থেকেই আধুনিক কালের সংরূপগত বিচার এসেছে। এর পথিকৃৎ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং মূলত আরিস্টটল। সমকালে দুটো গ্রন্থকে রূপবাদী সমালোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়, তা হল- ইংরেজ সমালোচক আই. এ. রিচার্ডস (Ivor Armstrong Richards,1893-1979)-এর *Principles of Literary Criticism* এবং কানাডিয়ান সাহিত্যতাত্ত্বিক নরথ্রপ ফ্রাই (Northrop Frye, 1912-1991)-এর *Anatomy of Criticism*। এ ধরনের সমালোচনায় সাহিত্যকৃতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারই মূল্য পায় না। নিজে যথাসম্ভব নিস্পৃহ থেকে সমালোচক একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রূপবাদী সাহিত্যবিচার করে থাকেন।

সমালোচনার অপর ভঙ্গিতে সাহিত্যের বিভিন্ন তত্ত্বের চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে একজনের সাহিত্য বা একজন সাহিত্যিকের একটি বিশেষ সাহিত্যকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞান সমালোচককে সাহায্য করতে পারে, তবে তিনি তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না। এ ধরনের সমালোচনাকে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত বলে মনে করা হয়েছে- একটি শাখাকে বলা হয়েছে প্রতীতিমূলক সমালোচনা (Impressionistic/creative criticism) এবং অপর শাখার নাম বিশ্লেষণাত্মক।[১] প্রথমোক্ত সমালোচনায় সমালোচকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা প্রধান হয়ে ওঠে। কোনো বিচার্য সাহিত্যবস্তু সমালোচকের মনে যেসব অনুভূতির উদ্রেক করে, যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সমালোচক সেটাই এ পর্যায়ে বুঝিয়ে বলতে চান, যাকে বলা হয়েছে, æthe adventure of soul among masterpiece।"[২] আর বিশ্লেষণাত্মক রীতির বিচার একটি বিশেষ সাহিত্যকৃতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

এর বিষয়বস্তু, উদ্দিষ্ট সংবেদন ও শিল্প প্রকৌশল ইত্যাদির দিকে নজর রেখে করা হয়। অর্থাৎ বিচার্য শিল্প বা গ্রন্থই সমালোচকের পথ নির্দেশ করে। তাই সমালোচনা এখানে হবে ব্যাখ্যা, ভাষ্য, বিশ্লেষণ। জ্ঞানের যে বিশেষ ক্ষেত্রে সমালোচক তাঁর সমালোচনাকে সীমিত করতে ইচ্ছুক অথবা যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি একটি সাহিত্যকৃতির সমালোচনা করেন, সেই বিশেষ ক্ষেত্র বা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমালোচনার বিভিন্ন শ্রেণী বা গোত্র চিহ্নিত হয়ে থাকে। যুগভেদে সাহিত্যের জিজ্ঞাসা ও এর ব্যাখ্যা অন্বেষণের মাত্রাগত পরিবর্তন অনেক হয়েছে, ফলে বদলেছে সমালোচনার রীতি, প্রকৃতি, পদ্ধতি ও প্রকরণ। এসব পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ঐতিহাসিক সমালোচনা, তুলনামূলক সমালোচনা, প্রকরণবাদী সমালোচনা, সংরূপগত সমালোচনা, প্রকাশবাদী, মনোবৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক বা মার্কসবাবাদী সমালোচনা প্রভৃতি। সাহিত্যের বোধের সাথে জড়িয়ে আছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সমালোচকের আদর্শ। আর সে আদর্শ হবে শিল্পে প্রকাশিত জীবনের আদর্শ– শিল্পজীবন বহির্ভূত অন্য কোনো সামাজিক বা নৈতিক আদর্শ নয়। এ দাবি প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যের ইতিহাসে নানাভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে। সমালোচক যে রীতি বা পদ্ধতিরই আনুগত্য করেন না কেন, সমালোচককে একইসাথে সাহিত্য-শিল্পবস্তুর নিরাসক্ত নির্মোহ ব্যাখ্যাতা, প্রয়োজনে তত্ত্বাশ্রিত বিচার ও সর্বোপরি শিল্পরস আস্বাদনে পারঙ্গম হতে হবে, তিনিও হবেন এক ধরনের শিল্পী– আদর্শ সমালোচকের এইরকম সংজ্ঞাই দিতে চেয়েছেন কেউ কেউ।[৩]

পাশ্চাত্য সমালোচনা শাস্ত্রের উৎস হিসেবে ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪২৮ অব্দে আবির্ভূত দার্শনিক প্লেটোর *রিপাবলিক* নামক গ্রন্থটিকে। প্লেটো কাব্যের মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর সমকাল (খ্রিঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দী) থেকেই গ্রিসে তত্ত্ব ও তর্কমূলক আলোচনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্লেটো প্রধানত কাব্যসৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা এবং অনুকরণের স্থান সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তবে তিনি রাষ্ট্রনীতি, সামাজিকতা ও চরিত্রনীতির দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হয়েছিলেন বলে সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথাগুলো ধরতে পারেন নি। আরিস্টটল প্লেটোর ভাববাদী মতামতকে যুক্তি- শৃঙ্খলের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। 'অনুকরণ' কথাটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের উপায় এবং মাধ্যম– এই তিনটি ব্যাপারে একটি শিল্প অপর শিল্প অপেক্ষা পৃথক হয়ে পড়ে। তাছাড়া কবি একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তুরই অনুসরণ করেন বটে, কিন্তু কবির সৃষ্টিকৌশলে তা পরিণত হয় সর্বজনীন সত্যে। এছাড়া আরিস্টটল সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে কতগুলো মৌলিক সমস্যার অবতারণা ও সমাধান করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যবিচার পদ্ধতিতে আরো যাঁরা যুগান্তর এনেছিলেন তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন ক্যাসিয়াস লঙ্গিনুস (২১৩-৭৩ খ্রিঃ অঃ), রোমান

সমালোচক হোরেস (Quintus Horetius Flaccus, খ্রিঃ পূঃ ৬৫-৮) কুইন্টিলিয়ান (Macus Fabius Quintilianus,খ্রিঃ ৪০-১০০) প্রমুখ।

গ্রিক-রোমান সমালোচনার পরবর্তী ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।[৪] এসব বিভাজনের অভিধা হল– রেনেসাঁসীয় সমালোচনা, নব্য-ধ্রুপদী সমালোচনা, রোমান্টিকতাবাদী সমালোচনা, ভিক্টোরীয় এবং বিশ শতকীয় আধুনিক ও বিশ-একুশ শতকীয় সমালোচনা। সমালোচনার ইতিহাস লক্ষ করলে বোঝা যায় কী ভাবে পশ্চিমা তথা বিশ্বসাহিত্যে নানা মতবাদ-বিচার বিতর্ক সাহিত্যবিচারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। কখনও সমালোচনা নীতিবাদী আদর্শকে মেনেছে, কখনও সৌন্দর্যকে সাহিত্যের অবলম্বন মনে করেছে, কখনও কোনো বিশেষ ব্যক্তিগোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত মতবাদ ধরে এগিয়েছে। ঊনিশ শতকের মধ্যেই সাহিত্য-শিল্পের মূল্য সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্যগুলো বলা হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতন্ত্রবাদ, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রতন্ত্র এর কোন্‌টি যে সাহিত্যবিচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে তা নিয়ে ঊনিশ ও বিশ-একুশ শতক ধরে মতবৈষম্য চলেছে। অধুনা সমালোচনায় শিল্প-বিষয়ের চেয়ে অবয়ব, কাঠামো তথা শিল্পের ফর্মভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এরই ধারায় জন্ম হয়েছে প্রকরণবাদ (Formalism), শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics), আকরণবাদ, (Structuralism) বিনির্মাণবাদ, (Deconstructionism) ইত্যাদি। বাচনের বহুমাত্রিক উপস্থাপনাকেও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের মত সমান এবং কিছুমাত্রায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবার কারণে আধুনিক সমালোচনায় ফর্ম বা প্রকরণের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে।[৫]

বাংলায় ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মূলত সাহিত্যের বস্তু-উপাদান, রচনারীতি ও ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ বা ব্যাপক মূল্য পরিবর্তিত হল। সেই সাথে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের প্রকাশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক চর্চা, গদ্যসাহিত্যের বিকাশ প্রভৃতি কারণে এবং বলা যায় অনেকটা ‘ইউরোপীয় সাহিত্য সমালোচনার প্রভাবে ভারতের আধুনিক ভাষাতে নিজস্ব সাহিত্য বিচার পদ্ধতি গড়ে উঠেতে থাকে।[৬] ঊনিশ শতকের আগে সমালোচনার কোনো মূল্যমান স্থির হয়নি, এমনকি সমালোচনা-সাহিত্য বলতে কি বোঝায় তার-ও স্পষ্টতা তৈরি হয়নি। কারণ, প্রথমত তখনও পর্যন্ত বাংলা গদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যসমূহকে সাহিত্য হিসেবে বিচার না করে ধর্মচর্চার উপকরণ হিসেবেই বিবেচনা করার একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। যদিও সংস্কৃত ভাষায় রসশাস্ত্র বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও অনেকাংশে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন, কাব্যবিচার করেননি। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই (১৮২৪-১৮৭৩) প্রথম ‘religious bias’ ত্যাগ করে কাব্যকে কাব্য হিসেবে বিচার করতে বলেছিলেন। মধুসূদনের বন্ধু

রাজনারায়ণ বসু রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাই *ব্রজাঙ্গনা* কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে (১৮৫৭) তিনি তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'when you sit down to poetry leave aside all religious bias'। মধুসূদন সমালোচনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব না দিলেও তাঁর নতুন সাহিত্যচিন্তা ছিল যা প্রকারান্তরে সমালোচনার সূত্রও নির্দেশ করে। উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ('বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ', ১৮৫৪), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ('বিবিধার্থসংগ্রহে' প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই ('সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৩) সর্বপ্রথম সাহিত্যের রূপ, রীতি, তত্ত্ব প্রভৃতির সার্থকতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পক্ষ সমর্থন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যে অশ্লীলতা এবং অন্যান্য গুণাগুণ প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেন। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিল। এ পত্রিকায় ১৮৭২ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ছ-সাত বছর ধরে তিনি সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন, এগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল: 'উত্তরচরিত' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ), 'গীতিকাব্য' (১২৮০), 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব ' (১২৮০), 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা ' (১২৮২), 'আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প' (১২৯১), 'দ্রৌপদী' (১২৮২), 'বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' (১২৯১), 'বাঙ্গালা ভাষা ', (১২৮৫)। ১৮৭২ বা ১২৭৯-এর 'বঙ্গদর্শন' সপ্তম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদকীয় কৈফিয়তে সমালোচনা সম্পর্কে কতগুলি সাধারণ উক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোনো উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। ...গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা: যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থে অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য আপাত বিরোধপূর্ণ হলেও সমালোচনার বা গ্রন্থের নান্দনিক বিচারের ওপর সাহিত্যবোধ থেকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে পাঠককে জ্ঞান বা সুখলাভে সহায়তা করা, গ্রন্থকারের সমালোচনাকালে ভ্রান্তি সংশোধন করা অর্থাৎ যদি অনিষ্টকারী গ্রন্থ হয়, তবে তা পাঠকের সামনে তুলে ধরা ইত্যাদিকে সামাজিক হিতসাধনের কাজ বা 'খাঁটি নীতিধর্মী প্রক্রিয়া'[৮] হিসেবে আখ্যা

দেয়া হয়েছে। সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মবোধ, নীতিজ্ঞান, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদি ভাবনা জড়িত হয়ে উনিশ শতকের শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনাকে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া একথা স্মর্তব্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনায় মিল-বেন্থামের 'হিতবাদী তত্ত্বে'র (Utilitarianism) কিছুটা প্রভাব ছিল। 'ইতিহাসের পাঠক এবং সমাজ সচেতন শিল্পী বঙ্কিম সাহিত্য শিল্প ধর্মচর্চা উৎসব আনন্দ ইত্যাদির সঙ্গে সদাসক্রিয় এবং সদাপরিবর্তনশীল সমাজের একটা নিগূঢ় যোগাযোগে বিশ্বাস করতেন। ... তদুপরি শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য চর্চায় তাঁর সমাজচিন্তা এবং সমাজদর্শনকে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন।[৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক দীর্ঘ পদক্ষেপ; তাঁর সচেতন সংগঠনমূলক প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা সাহিত্য জগতে একটা আন্দোলন এবং আলোড়নের সৃষ্টি হল যার ফলে শিক্ষিত সাহিত্যরসিক অনেক ব্যক্তি সাহিত্য-সমালোচনাকে একটি নিয়মানুগত, ফলপ্রদ সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুশীলন করতে শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিনব সাহিত্য চর্চা তথা সমালোচনার জন্মদাতা। 'A Popular Literature for Bengal' এবং 'Bengali Literature'[১০] প্রবন্ধ দুটি সমালোচক বঙ্কিমের চিন্তাধারার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বহন করছে। সাহিত্য সমালোচনার প্রধান যা অবলম্বন অর্থাৎ সমকালীন সাহিত্যসৃষ্টি– বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সে যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনার ক্ষেত্রে কাব্য এবং নাটককে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও সাধারণভাবে সাহিত্যের মূলতত্ত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত তবে প্রগাঢ় মন্তব্যও কিছু আছে। কাব্যের আলোচনায় মহাকাব্য এবং গীতিকাব্য এই উভয় দিকেই বঙ্কিমের লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়েছিল। 'তবে ঐতিহাসিক কারণে মহাকাব্যের আলোচনায় প্রয়োগগত দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে এবং গীতিকাব্যের আলোচনা প্রধানত তত্ত্বগত এবং ইতিহাসগত আলোচনাতে পর্যবসিত হয়েছে।[১১] যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ সমালোচনা বা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন সেটি ছিল ইংল্যাণ্ডে ভিক্টোরীয় যুগের অন্তিম পর্ব।[১২] সমকালীন বাংলাদেশে তখন বায়রন ছিলেন সাহিত্যের আদর্শস্থল এবং শেক্সপিয়র পাঠ একই সঙ্গে ছিল ছাত্র-সমাজের বিশেষ বিলাস।[১৩] শেক্সপিয়রের রচনার সাথে বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন; সেই সাথে যদি তিনি শেক্সপিয়র বিষয়ক সমালোচনা পড়ে থাকেন তবে বলা যায় যে Neo-classical, Restoration এবং আঠার শতকের সমালোচনাও তিনি লক্ষ করেছেন। হিপোলাইত তেইন (Hippolyte A. Taine, *History of English literature* গ্রন্থের রচয়িতা, ১৮৬৪) ও কার্লাইল-এর রচনার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। 'জীবনের মধ্যে নীতিকে দেখা বঙ্কিমের এই প্রবণতার মধ্যে ভিক্টোরীয় যুগের মানসিকতা বিশেষভাবে কার্লাইল, রাসকিন প্রভৃতির গূঢ় প্রভাব অনুমান করা চলে।'[১৪] তবু

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূচনা পর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে মতামত দিয়েছেন তা থেকেও তাঁর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুধাবন করা যায়। কাব্য কি? সাহিত্য কি? কবি কে?- এইসব জটিল এবং বহুবিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন বঙ্কিমচন্দ্র হয়েছেন স্বেচ্ছাক্রমে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি বিভিন্ন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তিনি তার মীমাংসা করতে চেয়েছেন। সাহিত্য স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত গুণসম্পন্ন হবে; সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি করে চিত্তোৎকর্ষ বা চিত্তশুদ্ধি সাধন কাব্যের উদ্দেশ্য, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ইন্দ্রিয়পরতা এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়বিধ বৈপরীত্যের যথার্থ সামঞ্জস্য বজায় থাকবে; কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্পর্ক এইটুকু যে উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে; যিনি সুকবি তিনি বাহ্য ও অন্তর প্রকৃতির সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ চিত্রিত করেন; গীত হওয়াই কাব্যেই আদিম উদ্দেশ্য– বিভিন্ন প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত সহযোগে বঙ্কিমচন্দ্র এইসব সাহিত্যতাত্ত্বিক মতামত ব্যাখ্যাও করেছেন।[১৫] শিল্পসাহিত্যের সমগ্রতা বোঝার গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল, যাকে তিনি বলতে চেয়েছেন 'অনন্ত বিস্তার'।[১৬] অর্থাৎ শিল্পসাহিত্যকর্মের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী তিনি। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব তথা শিল্পসাহিত্য বিষয়ক নানা জিজ্ঞাসাগুলো বিভিন্ন সমালোচ্য বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গেই এসেছে, কখনও তরুণ লেখকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক উপদেশের সূত্রেও তা উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ রচনাবিশেষের আস্বাদনের সঙ্গে, কোনো না কোনো গ্রন্থপাঠের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে তাঁর এসব সাহিত্যজিজ্ঞাসা জড়িত। ফলে তাঁর তত্ত্বে পৌঁছুবার পদ্ধতিকে বলা চলে আরোহী বা ইনডাক্‌টিভ পদ্ধতি।[১৭] যেমন- জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক বিচারে সমালোচক উভয়ের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার এবং উভয় কবির বৈশিষ্ট্য নিরূপণকালে গীতিকবিতা, কাব্যের বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতি, কাব্যের সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয়ক অনুসন্ধান করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলোকে ধরন অনুযায়ী সাধারণভাবে দু'একটি ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর রচনাগুলির অধিকাংশই ব্যবহারিক সমালোচনা; আর দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তা কখনও ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, কখনও তুলনামূলক বিশ্লেষণ, কখনও বা লেখকের জীবনীর সাথে সৃষ্টিকর্মকে সমান্তরালে রেখে বিচার-বিবেচনা। সেই সাথে সাহিত্যমূল্য অনুসন্ধানও করেছেন তিনি। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেন :

> যদি এই দীর্ঘ সমালোচনার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিনী শক্তির কিঞ্চিৎমাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ সফল বিবেচনা করিব।[১৮]

পাঠকের কাব্যানুরাগ বৃদ্ধি সমালোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য– এই অভিনব কথা সমালোচনার ইতিহাসে বঙ্কিমই প্রথম বললেন। তাঁর নিজের সমালোচনাতে বিচার, রসপরিচয় ও ব্যাখ্যা অচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। এছাড়া সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর মন অনেকটাই কার্যকারণসন্ধানী এবং 'বিজ্ঞানমুখী' (যুক্তিনিষ্ঠ অর্থে) তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাখ্যাবাদী সমালোচক মাত্রেই সাহিত্যবস্তুর 'কনটেক্স্ট' বা প্রসঙ্গপট সম্পর্কে সচেতন, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার ভঙ্গি ও কিছু বক্তব্য লক্ষ করলে বোঝা যায়, তিনি সাহিত্যবস্তুকে তার প্রসঙ্গপটে রেখে দেখতে আগ্রহশীল। সমাজ ও সাহিত্যের যোগাযোগ বিষয়ে তিনি নানাভাবে মতামত প্রকাশ করেছেন :

> সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। ...সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই। ... তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।[১৯]

এই ধরনের মতামত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের প্রারম্ভেও আছে :

> বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানস বিকাশের সমালোচনায় কথিত হইয়াছে যে, যেমন অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদে ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে ... বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহসুখনিরতির ফল।[২০]

উক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও তদনুবর্তী বৈষ্ণব কবিদের কৃষ্ণচরিত্র– এই সব কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে প্রভেদ আছে কি-না। যদি থাকে, তো সে প্রভেদ কী? 'যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে?'[২১] এ প্রশ্নের অনুসন্ধান বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সমাজগত কার্যকারণেই খুঁজেছেন। বিশেষভাবে ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজ জীবনের নিগূঢ় প্রভাব সম্পর্কে বা এর গতি-প্রকৃতি নির্ণয়কল্পে কয়েকটি ইঙ্গিত তিনি করেছেন, যেমন রামায়ণ বিজয়ী আর্যজাতির প্রথম মহাকাব্য; মহাভারত সমৃদ্ধশালী অথচ, আভ্যন্তরিক বিবাদে ব্যস্ত ভারতবাসীর কাহিনী। সুখী ও কৃতি ভারতীয়গণ ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের রচয়িতা। 'মোহের ফল

পুরাণ', 'বিলাসিতা ও ঐহিক সুখের চরমাবস্থা কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি'; 'প্রদেশ বিশেষে বাঙলা দেশের তেজহানিকর জলবায়ুর প্রভাবে কোমল অলস উচ্চাভিলাষশূন্য আর্য প্রকৃতি তথা বাঙ্গালী জাতি এক অভিনব গীতিকাব্যের স্রষ্টা'।[২২] এছাড়া 'বেঙ্গলী লিটারেচার' (১৯৪০) প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে অর্থাৎ জয়দেব, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম আবার মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র পর্যন্ত কবিদের বিষয়ে শুধু তথ্যসংগ্রহ জাতীয় আলোচনা নয়, গভীর অনুভবসমৃদ্ধ; আস্বাদনপ্রধান অথচ যুক্তিনির্ভর মন্তব্য করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই সাথে লক্ষণীয় যে কবি ও কাব্যের বিভিন্নতার সঙ্গে সমাজ ও কালের বিচিত্র অবস্থার গূঢ় যোগাযোগকে সমালোচক আবিষ্কার করেছেন। বঙ্কিমের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ফরাসি সমালোচক হিপোলাইত তেইনের 'ঐতিহাসিক পাঠ' বা সমালোচনা ভঙ্গির মিলের কথা বলেছেন কেউ কেউ।[২৩] তবে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রে জাতি, সামাজিক বা গোষ্ঠীগত পরিমণ্ডল এবং কাল (তেইনের মতে race, milieu and moment)-এর প্রভাবকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করলেও শিল্পস্রষ্টার আত্মস্বভাবের দিকটাও সমান জোর দিয়ে বলেছেন, যা তেইনের আলোচনায় অনেকটাই উপেক্ষিত হয়েছে। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে তিনি একথা স্পষ্ট করেছেন:

> প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে ইহা বিবেচনা করা অকর্তব্য। কাব্যে প্রভেদ নানা প্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবি মাত্রেরই বিশেষ দোষ গুণ আছে যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাঁহাদিগের জাতীয় গুণ। প্রাচীন কবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষগুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র্য আছে। সেগুলি তাঁহাদিগের নিজগুণ।
>
> অতএব, কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ– জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারিজন কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা।[২৪]

সমালোচনায় শিল্পীর আত্মস্বভাবের স্বাধীনতাকে স্বীকার করার প্রত্যয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী বা কবির ব্যক্তিত্বকেও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অবশ্য কবিজীবনী অর্থাৎ জীবনীভিত্তিক সমালোচনা অনেক আগে থেকেই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে এই গোত্রের সার্থক সমালোচনার নিদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (বাংলা ১২৯২, ১৮৮৫ খ্রি:) এবং 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সমালোচনা' প্রবন্ধের 'কবিত্ব' শীর্ষক সংযোজন (১৮৮৬ খ্রি:)। এছাড়া তুলনামূলক সমালোচনায়ও বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সমালোচনায় পথিকৃৎ। 'উত্তরচরিত' বিশেষত 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ

করা যায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যবস্তুর শ্রেণীগত চরিত্রধর্মের দিক এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যের শ্রেণী (genre) সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নাটক ও আখ্যান কাব্যের নিজ নিজ শ্রেণী ধর্মের দাবির ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা ভঙ্গির নানা দিক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে, বাংলা ব্যবহারিক সমালোচনায় তিনি প্রধান পথপ্রদর্শক এবং একজন সফল সমালোচক। সমালোচনায় তাঁর শিল্পীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির অভাব নেই। 'জ্ঞান এবং রস এদের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করা, উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।'[২৫] এছাড়া জীবন ও শিল্পের মধ্যে এক প্রকার ঔচিত্যের ধারণাকে তিনি তাঁর চিন্তায় সুসঙ্গতভাবে স্থাপন করেছিলেন। 'কিন্তু তাঁর সেই ঔচিত্যবোধ বা বিশেষ অর্থে বলা চলে নীতিবোধকে শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্য আস্বাদনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে জীবন-দর্শন গড়ে তুলেছিলেন।'[২৬] তবে নীতি, কল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত যা-ই থাকুক, তাঁর সমালোচনাতত্ত্বের আসল পরিচয় সমালোচনার মধ্যে। 'ঘোষণায় বঙ্কিমচন্দ্র আধা-ক্লাসিকপন্থী, কিন্তু কার্যকালে তিনি মোটামুটি রোমান্টিক গোত্রেরই সমালোচক।'[২৭] এছাড়া একথাও স্মর্তব্য যে, সমালোচনার পরিভাষা সৃষ্টিতে তাঁর চেষ্টা অস্ফূট হলেও উল্লেখ্য। বিশেষ শব্দ বা সমালোচনার যথাযোগ্য পরিভাষা নির্মাণে উনিশ শতকের দান প্রায় কিছুই নয়। বাংলা ভাষার এই অপরিপক্ক অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র আপন সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা যেমন একটি আদর্শ উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, তেমনি সমালোচনার মাধ্যমেও বাংলা ভাষার চর্চা করে ভাষাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য যে তিনি বিশেষ আদর্শের সাহিত্যতত্ত্বও প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমত এবং প্রধানত সমালোচক এবং সেই সমালোচনার প্রয়োজনেই তিনি সাহিত্যতাত্ত্বিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে কথা বলা যাবে না। ব্যাখ্যা ও রসপরিচয়- সমালোচনার এই দুই ভঙ্গি প্রসঙ্গে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা বা বিচার স্পষ্ট, অকুণ্ঠ, সু-উচ্চারিত এবং সর্বোপরি ব্যাখ্যাধর্মী। অন্যদিকে ব্যাখ্যার দিকে রবীন্দ্রনাথেরও আকর্ষণ রয়েছে, তবে রসপরিচয়ে তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিচিত্র ভাবনাসমূহের বিশ্লেষণ করেও সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে অনেক রবীন্দ্র-সমালোচকই স্বীকার করেন যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের বেশ কিছু মূলসূত্র তাঁর জগৎ-জীবনতত্ত্ব তথা তাঁর মানবতত্ত্বের সাথে জড়িত। সাহিত্যের সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের কাছে কী তা বুঝলে

তাঁর সাহিত্য বা সমালোচনা তত্ত্বও অনুধাবন কারা যায়। সাহিত্য কথাটার বুৎপত্তিতে যে 'সহিত' শব্দটি আছে, যার অর্থ মিলন, সেই মিলনকে অবলম্বন করে কোনো কোনো প্রাচীন আলঙ্কারিক বলেছেন, সাহিত্য হ'লো শব্দ আর অর্থের মিলন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যুৎপত্তিকে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা ভিন্নতর। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে (*সাহিত্যের পথে)* রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্য, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশ্যে।...
> এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।'[২৮]

এই হৃদয়ের যোগ বা মিলন সর্বতোমুখী। প্রথমত তা ব্যক্তির বা লেখকের সঙ্গে তাঁর বহির্বিশ্বের মিলন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-বক্তব্য হল :

> বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং গানই সাহিত্য।[২৯]

সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমত জগতের সঙ্গে স্রষ্টার যোগযুক্ত হওয়া ও দ্বিতীয়ত সৃষ্টি করা, জগৎসত্যকে অঙ্গীকার ও তাকে স্বী-কৃত করার মধ্য দিয়ে সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠা, নিজেকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, রবীন্দ্রনাথের মতে এই হলো মানবধর্ম। সুতরাং মানবস্বভাবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা। আর জগৎসত্যই যেহেতু সাহিত্যের মৌল উদ্‌বেজনা, তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, সাহিত্য যথার্থই জগৎসত্যের রূপায়ণ। এ সূত্রেই এসেছে উপনিষদীয় অনুভবে সৃষ্টিলীলা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে স্রষ্টার আনন্দবাদিতা ও প্রকাশ (রূপ) তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন :

> ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত, মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎ সৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই-যে মানস সংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিঃশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।[৩০]

সুতরাং সৃষ্টির জগৎ আত্মসৃজনলীলা ও আনন্দের জগৎ। আর সর্বোপরি মানুষের প্রকাশের জগৎ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। যাকে সহিতত্ব বলা হয়েছে, তা

প্রকাশ থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। আর এই প্রকাশচেষ্টার মূলে রয়েছে মানুষের অন্তহীন আত্মবিস্তার, বহুকে ও বিচিত্রকে লাভ করবার প্রেরণা। প্রকাশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মস্বরূপের সত্যম্, জ্ঞানম্ ,অনন্তম্ এই তিন দিকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

> চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হ'লো, আমরা আছি;আর একটি - আমরা জানি; আর একটি কথা তার সঙ্গে আছে, ... সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়- I am, I know, I express। মানুষের এই তিন দিক এবং তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য।[৩১]

আর এই প্রকাশ কেমন করে হবে তা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন কল্পনার ওপরে। তিনি মনে করেন, কল্পনাই বিশ্বজগৎকে মানবিক ও মানসিক করে তোলে এবং সত্য করে তোলে। কল্পনার বিশেষত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি; এই কল্পনাশক্তি মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে মনোময় করে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ।[৩২]

সৃজনশীল কল্পনার গুরুত্ব পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বেও অসামান্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাতত্ত্বকে সৃষ্টিকর্তা মানুষের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে, একটি সার্বভৌম বৃত্তি হিসেবে কল্পনাকে এমন এক দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, উনিশ শতকীয় রোমান্টিকদের মধ্যে যার সন্ধান মিলবে না। কান্ট প্রমুখ পূর্বসূরীদের মধ্যে মিলতে পারে, খাঁটি রোমান্টিকদের মধ্যে নয়, কোলরিজের মধ্যেও না।[৩৩] সুদীর্ঘকালব্যাপী রবীন্দ্রনাথের নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনা তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও জীবনদর্শনেরই ইতিহাস। সৃষ্টিলীলা কিংবা, রূপকে অবলম্বন করে অরূপ ভাবের রাজ্যে অনুপ্রবেশ, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-রস-আনন্দ-আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি দর্শনের তত্ত্বকথা। যা সত্য মঙ্গল সুন্দর, তা-ই আনন্দরূপ। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের সত্য, মঙ্গল, সৌন্দর্য, ও আনন্দ লৌকিক ধারণার সত্য, মঙ্গল, সৌন্দর্য ও আনন্দ থেকে পৃথক। এ সত্য ও সৌন্দর্য শিল্পের। রবীন্দ্রনাথ কীট্সের Beauty is truth, truth beauty বাক্যটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। এছাড়া প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, সত্য-তথ্য, বাস্তব-অবাস্তব সম্পর্কে লৌকিক ধারণার সঙ্গে সাহিত্যের ধারণার মৌলিক পাথর্ক্যের কথা তিনি বহুভাবে বহুবার ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্যে তথা আর্টে বাস্তবতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> ইংরেজিতে যাকে বলে রীয়ল, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তা'ই যাকে আপন অন্তর থেকে অব্যবহিত ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা।[৩৪]

সুতরাং শিল্পের সত্য বস্তুর অস্তিত্বগত সত্য নয়। সাহিত্যে যা হৃদয়ের আনন্দময় স্বীকৃতি পায়, বাইরের জগতে তার অস্তিত্ব না থাকলেও তা বাস্তব। তবে শিল্পস্রষ্টার আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকেও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বলেননি; যে পক্ষপাত বিশ্বজীবনকে আত্মীয় বলে মনে করে, যে ব্যক্তিত্ব বিশ্বজগৎ ও জীবনে সম্প্রসারিত– সেই পক্ষপাত ও ব্যক্তিত্বই সাহিত্যের। তার সঙ্গে নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক জীবনদৃষ্টির কোনো পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে, সে নিরাসক্তির প্রমাণ আধুনিক কাব্যে দুর্লভ। আধুনিক-পূর্ব সাহিত্যে যদি সুন্দর মধুর মহৎ ভাব নির্বাচনের দোষ থাকে– সে দোষে আধুনিক সাহিত্যও দুষ্ট। আধুনিক সাহিত্যের আসক্তি কুৎসিত রুগ্ন ভগ্ন জীর্ণ জিনিসের প্রতি। এর মধ্যে বলিষ্ঠ মনের পরিচয় নেই– আছে মানসিক রুগ্নতা ও ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একপ্রকার মোহ। এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।[৩৫] শিল্প বা সাহিত্যের অন্য ফল নিরপেক্ষত্বে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ। তবে তা 'art for art's sake'-এর একক অনুসমর্থন নয় 'আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।[৩৬] এই 'আনন্দ'কে তিনি ব্যাপক ও গভীর অর্থে নিয়েছেন। সাহিত্যের স্বাধিকারে আস্থাশীল এবং সাহিত্যের আনন্দমূল্যের অকুণ্ঠ সমর্থক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-আলোচক হিসেবেও মূলত রসপিয়াসী। অবশ্য সাহিত্যবিচার কী তা তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছেন। প্রবাসীর ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যায় (১৯২৯) প্রকাশিত 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধের শুরুতে তিনি বলেন, 'বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য।'[৩৭] তিনি আরো বলেন:'যাকে আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্যবিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো; আর বিচার হল পরিচয়– তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য। ... সাহিত্যবিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই, একথা বলাই বহুল্য। কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়।'[৩৮] কিংবা,'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিকবিচার হতে পারে। সেরকম বিচারের শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।'[৩৯] বিচার, পরিচয় আর ব্যাখ্যা রবীন্দ্র-বক্তব্যে থাকা এই তিন প্রক্রিয়াকে তাঁর সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ড ধরে নেয়া যেতে

পারে। এদের অর্থের ভিন্নতা স্বীকার করেও বলা যায়, 'রবীন্দ্রনাথ এই তিনের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন।'[৪০] আবার *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের 'রামায়ণ' (১৯০৩) প্রবন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

> কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা। এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমাদের আজ-কালকার সমালোচনা বাজার দর যাচাই করা; কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস। ... এরূপ যাচাই-ব্যাপারের উপযোগিতা আছে, কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

এখানে পূজা শব্দটির জন্য রবীন্দ্র-বক্তব্যে স্ববিরোধ আবিষ্কার করা সম্ভব। পূজা সমালোচকের আন্তরিক মনোযোগের সমার্থক হতে পারে। এখানে তা কেবল সাহিত্যবস্তুর আস্বাদন এবং তার প্রতি ইতিবাচক সমর্থন নয়। মূল্যায়ন ও বিগলিত ভক্তি কিংবা বিচার আর আবেগাপ্লুত পূজা পরস্পরের সহগামী নয় যদিও। সাহিত্য বিষয়ক রবীন্দ্র-রচনাসমূহ বিশেষত 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় তিনি সমালোচকের যুক্তিনিষ্ঠা ও মননশীলতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব কিংবা সমালোচনার ভঙ্গির প্রকাশ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, এর কেন্দ্রে রয়েছে আস্বাদন তথা আনন্দবাদিতা। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ জীবনবাদেরই নামান্তর।[৪১] এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় তিনি বলেন, 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড়ভাবে অস্মিতাসূচক।' সৃষ্টির আনন্দ আর সমালোচনায় আস্বাদন দুটো শব্দ সমার্থক বলেই মনে হয়। ১৩৪৮-এ বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পণ্ডিতেরা বিচার করে সাহিত্যের ভালোমন্দ স্থির করেন। কিন্তু তোমরা একত্র করেছ বিশুদ্ধ উপভোগের আনন্দ।[৪২] তাঁর সমালোচনা সাহিত্য কার্যত এই কথাই বলে যে, ব্যাখ্যা পরিচয় বিচার–সাহিত্যের সাহিত্যগুণের সঙ্গে যুক্ত হলে, অর্থাৎ সাহিত্য-পাঠের আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হলে সবই সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকর্মের সূচনা ১৮৭৬-এ শেষ ১৯৪১ সালে। এই সমালোচনাকর্মের তিনটি পর্ব-বিভাগ করা যায়। যেমন :

(ক) প্রথম পর্ব : ১৮৭৬-১৮৯২ খ্রি:। 'সমালোচনার' অন্তভুক্ত কয়েকটি রচনা; 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র সমালোচনা এবং 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র ভূমিকা।

(খ) দ্বিতীয় পর্ব : ১৮৯৩-১৯০৭ খ্রি:। 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'সাহিত্য' গ্রন্থের রচনাসমূহ।

(গ) তৃতীয় পর্ব : ১৯১৪-১৯৪১ খ্রি:। 'সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের রচনাসমূহ।

'সমালোচনা'র অন্তর্ভুক্ত মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা, 'ডি প্রোফন্ডিস', 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', 'বসন্ত রায়ের পদাবলী', বাউলের গান ও পূর্ববর্তী 'ভুবনমোহিনী প্রতিভার সমালোচনা' এবং পরবর্তী 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা– এইসব সমালোচনায় বিচার, ব্যাখ্যা ও পরিচয় লক্ষ করা যায়। এছাড়া 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' ('জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', ১২৮৩ কার্তিক) সমালোচনায় অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে অধিকার অর্জন করে তুলানামূলক পদ্ধতিতে সমালোচনা করেছেন।[৪৩] দ্বিতীয় পর্বে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ 'মেঘদূত' প্রবন্ধটিকে অনেকেই সমালোচনা বলতে ইচ্ছুক নন। সাহিত্যে হিসেবে 'মেঘদূত' প্রবন্ধটিকে অসামান্য সৃষ্টি বলা হয়েছে।[৪৪] এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত করার যে সমালোচনা ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন[৪৫] বলে বলা হয়েছে; প্রবন্ধটি তা-ই। 'মেঘদূতে'র একটি হৃদয়গ্রাহী রসমূর্তি পাঠকের সামনে তুলে ধরাই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। এ কাব্যের বিরহবোধ কবি-সমালোচকের চোখে ধরা পড়ে এভাবে :

> রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।...
>
> অতএব, যক্ষের যে মেঘ নগনদীনগরীর উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে পাঠকের বিরহকাতরতার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহচর হইয়াছে। সেই কবির ভারতবর্ষ, যেখানকার জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই এবং পুরবধূদিগের ভ্রূলতাবিভ্রমে-পরিচিত নিবিড়-পক্ষ্ম কৃষ্ণনেত্র হইতে কৌতূহলদৃষ্টি মধুকরশ্রেণীর মতো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেখান হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি; এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না।

একে সৃজনশীল রসাত্মক সমালোচনা তথা নতুন সৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায়। *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (১৩০৭) প্রবন্ধটিও এর সমধর্মী। এছাড়া 'রাজসিংহ' *(আধুনিক সাহিত্য)* প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল সমালোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা হয়েছে।[৪৬] *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থে সমালোচনাশক্তির পরিচয়দান, বিচার ও সামগ্রিক মূল্যায়ন সামর্থ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে যে তিনটি প্রবন্ধকে উপস্থিত করা যায়, সেগুলো বঙ্কিমচন্দ্রকে অবলম্বন করে লিখিত। *লোকসাহিত্য*

গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধগুলোতে লোকসাহিত্যের সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করে এর ঐতিহাসিক মূল্য ও রসসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একজন সাহিত্যরসিক ও দেশসন্ধানী হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যেও অনুসন্ধান করেছেন। সাহিত্যের দিক থেকে সরলতাই লোকসাহিত্যের আদিম গুণ; সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সেই সহজ গুণেই আকর্ষণ বোধ করেছেন।

ব্যবহারিক সমালোচনায় বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গের গুরুত্ব কিংবা সামাজিক পটভূমির গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, 'তথ্য ব্যাখ্যায় নয়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা প্রবন্ধগুলির প্রধান পরিচয় তাদের সৃজনশীলতায়। আর এক্ষেত্রে 'কল্পনা' বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সহায়তা করেছে নব সৃজনে। তাঁর সমালোচনায় সহমর্মিতা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়, আছে অন্তর্দৃষ্টিও (Imaginative insight)। তাঁর সমালোচনাকে কবি-সমালোচকের সমালোচনাও বলা চলে। কবিত্বপূর্ণ সমালোচনা অর্থে নয়, 'কবি-স্বভাবের স্বেচ্ছাবিহার কিংবা মুক্ত মেজাজপূর্ণ' সমালোচনা বোঝাতে তাঁকে কবি-সমালোচক বলা যায়। স্বাধীন সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্যেই অধিকাংশ সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ কারণে সমালোচক হিসেবে তাঁর ভাষায় কবিচিত্তের স্বাভাবিক প্রণোদনা আছে। এর একটি প্রকাশ আছে উপমার প্রয়োগে। একই বক্তব্যে তিনি নানা উপমার সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। উপমার বাহুল্য তাঁর সমালোচনার একটি সমস্যা, কারণ উপমা যুক্তি নয়। তবে সাহিত্যকে তিনি দেখতে চেয়েছেন অখণ্ড রসদৃষ্টি দিয়ে। আর সাহিত্যের সঠিক বিচার বা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষিত রুচির অনুমোদন কিংবা বিচারের প্রতিভার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিচারকের যোগ্যতা বিষয়ে 'সাহিত্যের বিচারক' (১৯০৩) প্রবন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, তা তাঁর সমালোচনাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

> যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, বিচারের প্রতিভাও আছে, এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীরও পরিশুদ্ধ বিদগ্ধ ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু বীরবলী রচনারীতি রবীন্দ্র-রীতি থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মভাববিমুগ্ধ কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি সঞ্জাত যুক্তির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। তার 'প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে মুখ্যত বিদগ্ধ মনীষীর বুদ্ধিজাত চিন্তা-ভাবনার লঘু চপল খেয়ালী রূপের প্রকাশ'[৪৭] ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেন :

> যখন তিনি (প্রমথ চৌধুরী) সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন, তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হইনি।[৪৮]

'সবুজপত্রে'র (১৯১৪) স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়টি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় চিহ্ন রেখে গেছে, যার সবচেয়ে বড় কাজ একটি বিরাট ভাষা-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আধুনিক পরিণত বাংলা গদ্যের আদর্শ তৈরি করা। ভাষাই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক আদর্শের মূল জায়গা দখল করে আছে। অর্থাৎ তাঁর ভাষা-ভাবনা। বাংলা সাহিত্যে তিনি সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে সর্বপ্রথম দেখা দেন। তিনি যখন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র তখন জয়দেবের (১২৯৭) ওপর একটি সমালোচনা লেখেন। এছাড়া তার সাহিত্য-সমালোচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো হচ্ছে- 'মহাভারত ও গীতা' (১৩৩৪), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৩৩৪), 'ভারতচন্দ্র' (১৩৩৫)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ হল- 'মলাট সমালোচনা', 'বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ' (১৩২০), 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' (১৩২২)। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য সম্পর্কিত নানা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসারও মীমাংসা করতে চেয়েছেন। সাহিত্যতাত্ত্বিক মতামত প্রকাশিত হয়েছে এমন প্রবন্ধগুলো হল: 'সবুজ পত্রের মুখপত্র' (১৩২১), 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' (১৩২১), 'সাহিত্যে খেলা' (১৩২২), 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' (১৩৩২), 'কাব্যে অশ্লীলতা-আলঙ্কারিক মত (১৩৩৬) ইত্যাদি। সমসাময়িক সাহিত্যিক-বিতর্কের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অনেকগুলি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ তৎকালীন সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদ অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। সাহিত্য বিষয়ক নানা অনুসন্ধান থেকে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর

সাহিত্যতাত্ত্বিক মতাদর্শ। সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণার সাথে মানসিক যৌবনের বা প্রাণের গতির গভীরতর সম্বন্ধের কথা বলেছেন প্রমথ চৌধুরী। এই বিশ্বাস থেকেই 'সবুজপত্রে'র জন্ম। সাহিত্যাদর্শে নবীনত্ব, বিদ্রোহ ও অগ্রগতি চেয়েছিলেন তিনি, সেই সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উদার মেলবন্ধন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, 'সেখানে দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধ প্রবেশ করতে পারবে'- এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। সমাজে কিংবা সাহিত্যে প্রাচীন কিংবা নবীন কোনো সংস্কারকেই প্রাধান্য দিতে রাজী নন তিনি। পরিবর্তে বিশ্বমানবিকতার সাধন, বুদ্ধির মুক্তি, জ্ঞানচর্চা চেয়েছেন। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এসবের বিকল্প নেই এই মতামত প্রকাশ করে তিনি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়।[৪৯] কারণ মনোরঞ্জন করতে গেলে তা স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। সাহিত্যের আরো উদ্দেশ্য 'মানুষের মনকে জাগানো' এবং সর্বোপরি আনন্দসৃষ্টি। এছাড়া 'কাব্য, ধর্ম, আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মার লীলা', তাই সাহিত্য কোনো বিশেষ যুগধর্মের দাসত্ব করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে প্রমথ বলেন, 'যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার কারণ, প্রথমত যুগধর্ম বলে কোনো যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম নেই। ... নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তা হলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য।[৫০] সাহিত্য নিত্যবস্তু, তাই তাঁর সিদ্ধান্ত 'কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। ... The light the never was on land or sea, সেই আলোকে বিশ্বদর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্যজগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।[৫১]

সাহিত্যে বাস্তবতা, নীতি বনাম অশ্লীলতা, সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলোতে প্রমথ চৌধুরী তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন সেগুলো হল: 'জয়দেব', 'ভারতচন্দ্র', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত', 'যৌবনে দাও রাজটীকা'। সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন অবান্তর ও অ-সাহিত্যিক বলে মনে করেন তিনি, আর এক্ষেত্রে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে চাননি। 'কাব্যে অশ্লীলতা-আলঙ্কারিক মত' ও 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর এই শিল্পজিজ্ঞাসা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নীতির চেয়ে 'এসথেটিক ইমোশনের' গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে করেন তিনি। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে কেবল শ্লীলতা-অশ্লীলতা, নৈতিকতা, সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়ে নয়, সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গেও প্রমথের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত হয়েছে। হিপোলাইত তেইনের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচনা যেভাবে করা হয়েছে, প্রমথের মতে, কখনও কখনও তা 'কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে একটি অন্তরায় মাত্র'। ঐতিহাসিক সমালোচনা ভঙ্গিতে সমালোচকের দৃষ্টি

প্রধানত ইতিহাস, ও সমালোচ্য বস্তুর পটভূমিকার ওপর নিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ কাব্যরস আস্বাদনের চেয়ে সমাজ-ইতিহাস প্রভৃতি বীক্ষণের ফলে সমালোচনায় এক ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে বলে মনে করেন প্রমথ চৌধুরী। যদিও সমালোচনায় দর্শন ও যুক্তিকে স্বীকার করেছেন তিনি। চিত্রাঙ্গদা কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি কাব্যবিচারের নানা বৈশিষ্ট্যেরও অবতারণা করেছেন। সমসাময়িক সমালোচকেরা বিশেষত এডওয়ার্ড টমসন-কৃত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে দুর্নীতিমূলক কাব্য বলা হয়েছিল। অভিযোগগুলো প্রমথ অত্যন্ত 'সংযতভাবে অথচ যুক্তির' মধ্য দিয়ে অস্বীকার করেছেন। 'মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility'- একথা উল্লেখ করে *চিত্রাঙ্গদা*র বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রশ্নে তিনি বলেন, 'কাব্যের আবেদন মানুষের moral sense-এর কাছে নয়, spiritual sense-এর কাছে। এছাড়া এ কাব্যকে 'মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'জীবনে যা ক্ষণিকের তাকেই মনোজগতের চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যের মর্মকথা, একটি ক্ষণমুহূর্তকে অনন্ত মুহূর্তে পরিণত করার সাধনা। তাঁর মতে, *চিত্রাঙ্গদা* একাধারে কাব্য, চিত্র ও সংগীত। একজন সহৃদয় কাব্যরসিকের দৃষ্টিতে এ কাব্যের ভাবসৌন্দর্য এবং বাণীলাবণ্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রকাব্যের অন্তঃপ্রেরণা ও রসব্যঞ্জনার সার্থকতা তিনি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। সমালোচক হিসেবে নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও স্পষ্ট ভাষণ প্রমথের অন্যতম গুণ, তাঁর সাহিত্য-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যাদর্শের প্রতিফলন এসব প্রবন্ধেও আছে। 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' ও 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' এ দুটি প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯১৩-১৫ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির নবসাহিত্য আন্দোলনের দশ বছর পূর্বে। 'সাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি এর চরিত্রবিচার করেছেন। 'বিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সহমর্মিতা ও সমর্থন, সমালোচনা ও ত্রুটিনির্দেশ পরবর্তীকালের বিচারে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, এখানেই এ দুটি প্রবন্ধের সার্থকতা।[৫২] নবযুগের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে, তা হল- 'নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে।... নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা; কাউকে ছাড়া নয়, কাউকে ছাড়তে দেওয়া নয়।' এছাড়া সাহিত্য-মাধ্যমের আকার ছোটো হয়ে যাওয়াও আধুনিক যুগের একটা লক্ষণ, কিন্তু স্বল্পায়তন হলেও লেখা নিরেট হওয়া দারকার এবং সেইসাথে গালভরা ফাঁপা বুলি নয়, বরং প্রমথের দাবি, 'সাহিত্যে কস (grip) থাকা আবশ্যক। কারণ, 'অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি

ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা।' তাই কবিদেরকেও 'পরের মনোবীণার বাদক' হিসেবে নিজেদের দেখতে শিখতে হবে, তাহলেই কেবল 'তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পারবেন।' নব্যলেখকদের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যতাত্ত্বিক মতামত ও সমর্থন 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' (১৩২২) প্রবন্ধেও আছে। সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে অনুভূতি ও বৌদ্ধিকতার সাথে তা যাচাই বা পরীক্ষা করতে হয় এমন মত প্রকাশ করেই তিনি নবসাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এছাড়া বিশ শতকীয় আধুনিক-পর্বের লেখাগুলোর বিরুদ্ধে তোলা বিভিন্ন অভিযোগেরও প্রত্যুত্তর দিয়েছেন সমালোচক। 'জাতীয় আত্মা গড়ে তোলার একটা প্রধান উপায় সাহিত্য', সুতরাং নবযুগের লেখকের রচনাপ্রাচুর্য 'জাতীয় মনের উপর ছাপ রেখে যাবে' একথা তিনি মনে করেন। তিনি জানেন, সাহিত্যজগতও 'যোগ্যতরের উদ্‌বর্তনের নিয়মের অধীন।' সাম্প্রতিক বা নবকবিদের রচনা 'ভাষার পরিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছন্নতায় পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ' মনে হয়েছে সমালোচকের। 'এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি' এবং 'শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে।' যুগধর্মের প্রভাবে রচিত ছোটোগল্পকেও স্বাগত জানিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। সাম্প্রতিক বঙ্গসাহিত্যে যে বহুবিস্তার ও বৈচিত্র্য, বহুজনসমাগম ও কলরব,স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব, রুচি ও ভাবের নব নব রূপ লক্ষ করা যায়, তা সমালোচকের মতে অভিনন্দনযোগ্য। এই কারণে রচনার নাতিদীর্ঘতা, বহু লেখকের সমাগম, গদ্যের বহুচর্চা, ছোটোগল্পের প্রাধান্য, কাব্যদেহের পরিবর্তন, ঊনিশ-শতকী সাহিত্যগুরুদের প্রাধান্যলোপ প্রভৃতিকে প্রমথ তাঁর সাহিত্যবোধে যুগলক্ষণ বলে মেনে নিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অতিবিস্তৃত অপ্রতিহত প্রভাব যে আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, তা ঘোষণা করেছেন। বিশ শতকের প্রারম্ভেই বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তন সম্পর্কিত সমালোচনা করে প্রমথ তাঁর 'মানসিক উদার্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।[৫৩]

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যাত্ত্বিক চিন্তায় সৌন্দর্য বিষয়ে যে দর্শনভাবনা প্রকাশিত হয়েছে, তার মাধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের সাধনা বা রূপজ্ঞান। কলা বা আর্টের উপকরণ আসে বাহ্য জগৎ থেকে। আর বাহ্যজগতের জ্ঞান হল রূপের জ্ঞান। সাহিত্য আলোচনায় প্রমথ প্রায় সর্বএই তাঁর এই রূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এ সৌন্দর্যচেতনা, রূপজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপের প্রতি অনুরাগের পরিচয় আছে 'জয়দেব', 'ভারতচন্দ্র', 'চিত্রাঙ্গাদা', 'বাংলার কাদম্বরী', 'সবুজপত্র',

'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রভৃতি প্রবন্ধে। 'বাংলার কাদম্বরী' শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধে (পরিচয়', মাঘ ১৩৪৩) বাণভট্টের যে কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীকে আকৃষ্ট করেছে, সে আলোচনাতেই তাঁর রূপচিন্তার তত্ত্বটিও রয়েছে। আর্টিস্ট বাণভট্টকে তিনি নমস্কার করেছেন, 'কেননা এ রূপ নিত্য অথচ বস্তুভিত্তিক, এই রূপ হচ্ছে reality-র পরাকাষ্ঠা।' রূপের উৎস ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আর কবিকল্পনার ভিত্তি বস্তু জ্ঞান একথা বিশ্বাস করতেন তিনি।

সাহিত্য-সমালোচনায় সমালোচ্য বস্তুর প্রসঙ্গ অনুযায়ী প্রমথ চৌধুরী তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যতাত্ত্বিক মতামত প্রকাশ করেছেন। আর্টকে সকল কিছুর ওপরে স্থান দিয়ে, সংস্কৃতিতে বিশ্বনাগরিকত্বের পরিচয় দিয়ে, ভাবালুতা ও সংস্কারমোহের বিরুদ্ধে লড়াই, নির্মোহ বুদ্ধি ও যুক্তির উপাসনা করে সর্বোপরি স্বচ্ছ প্রসাদগুণ সমন্বিত কথ্য গদ্যরীতিতে মননশীল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে প্রমথ চৌধুরী বিশ শতকের প্রথম চার দশক বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ বা ভঙ্গি সমকালে তাঁকে বিশিষ্ট করেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর মনোযোগ ও একই সাথে বিশ্ববিদ্যার চর্চা তাঁর বিচারক মনের ঔদার্য যতটা বাড়িয়েছিল, তা তাঁর 'চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্যকে ক্রমশ আরো সমৃদ্ধ করেছে। সমালোচনায় প্রমথের বিদগ্ধ মনের পরিচয়েই তা প্রমাণিত।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদারের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা কবি হিসেবেই। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সমালোচক হিসেবে প্রসিদ্ধ স্থান অর্জন করেছেন তিনি। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানসী' পত্রিকায় (১৯০৮) মোহিতলালের প্রথম প্রবন্ধ 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথাক্রমে: 'মানসী', 'বীরভূমি', 'ভারতী', 'বাণী', 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী', 'নব্যভারত', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী', স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) ও 'বঙ্গভারতী'তে মোহিতলালের কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ঊনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের যুগে বাংলা সাহিত্যে যে দৃঢ় প্রত্যয় ও সত্য-সুন্দরের গভীর সাধনা ও আদর্শবোধ জাগ্রত হয়েছিল, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অস্থিত বা অদৃঢ় যুগমানসের সাহিত্যে পূর্বের সেই সুমহান আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনাকেই মোহিতলাল নবরূপ দান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[৫৪] তাঁর সাহিত্য-বিচার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হলো : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'

(১৯৩৬), 'সাহিত্য কথা' (১৯৩৮), 'সাহিত্য-বিতান' (১৯৪২), 'বাংলার নবযুগ' (১৯৪৫), 'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৯৪৭),'সাহিত্য বিচার' (১৯৪৭), 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' (১৯৫০), 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য' ১ম খণ্ড (১৯৫২), ২য় খণ্ড (১৯৫৩), 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৯৫৫) ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাবধারা, ভাষা, পরিণাম ও বিভিন্ন লেখকের সাহিত্যধর্মের পরিচয় আছে *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* (১৯০৬) গ্রন্থে। গ্রন্থটির তেরটি প্রবন্ধে মোহিতলালের সহজাত সাহিত্যবোধ ও মননশীল সাহিত্য-বিচারভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। কবি মোহিতলাল কেন সমালোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তার কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন :

> আমি আজীবন কাব্যচর্চাই করিয়াছি; কাব্যরসের স্বাদ-বৈচিত্র্য, সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, কবিপ্রেরণার গূঢ়রহস্য–প্রভৃতির ভাবনা ও জিজ্ঞাসা আমাকে চিরদিন আকৃষ্ট করিয়াছে। ১৩২৬ সনের 'ভারতী' পত্রিকায় আমি এ বিষয়ে লিখিয়া ভাবিতে আরম্ভ করি। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, এরূপ নির্বিশেষ তত্ত্ব আলোচনার দিন আমাদের সাহিত্যে এখনও আসে নাই; বাংলাভাষায় আধুনিক সাহিত্য যেটুকু গড়িয়া উঠিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেই আধুনিক রীতিসম্মত কোন সমালোচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এককালে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বসাহিত্য ও বাংলাসাহিত্য উভয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনা ছিল; কিন্তু সেগুলির মধ্যেও ব্যস্ততার লক্ষণ আছে; এবং আলোচনার প্রণালীও সুষ্ঠু নহে। তথাপি তাহাতে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার একটা ভিত্তি-স্থাপনা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর বিশেষ কিছুই হয় নাই; যাহা কিছু হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহা সাহিত্য অথবা বাংলাসাহিত্যের আলোচনা নয়–রবীন্দ্র-জয়ন্তী শরৎ-প্রশস্তির কলোচ্ছ্বাস।

সমালোচনায় শিল্পীসত্তার চেয়ে ব্যক্তিসত্তার ওপরে জোর দিলে বিচার অনেক সময় খণ্ডিত হয়, মোহিতলাল এর বিপক্ষে ছিলেন, রবীন্দ্র-সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাই বলেন, ''রবীন্দ্রনাথের মত কবি ও তাঁহার কাব্যকে এই যে বিশিষ্ট ভাববাদের বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছে এবং সেই কাব্যের রস-আস্বাদন নয় (সে পিপাসা কাহারও নাই) অথবা জীবনের সঙ্গে কোথাও তাঁহার যোগ হৃদয়ঙ্গম করাও কেবল তাহার অন্তর্গত ঐ একটা আদর্শকে ধর্মমন্ত্রের মত সকল ব্যাপারের অতীত করিয়া রাখা-ইহাতে যেমন রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় ব্যাহত হইয়াছে এবং সমাজের এক অংশে একটি মিথ্যা অভিমানের সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই বাংলা সাহিত্যেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, বাংলা-সাহিত্য পঙ্গু হইয়াছে।''[৫৫]

মোহিতলালের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায় তিনি অন্ধ-আনুগত্যহীন রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রতি সচেতন। সমালোচনায় কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও তিনিই প্রথম সমালোচক যিনি অযথা প্রশস্তি এড়িয়ে রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যের কোথায় দোষ বা গুণ তা সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন।[৫৬] আত্মপ্রত্যয় অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর বিরাট শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থের সমালোচনাকালে সমকালীন বাংলার যেসব সাহিত্যিকের রচনা তিনি নির্বাচন করেছিলেন তার বিচার কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে মত জানিয়ে 'মুখবন্ধে' বলেন :

> ঐতিহাসিক পদ্ধতি-প্রয়োগের অবকাশও এখানে নাই। কারণ, এ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহার প্রেরণা মুখ্যত অন্তর্মুখী, বহির্গত ব্যাপারের সহিত ইহার কার্য-কারণ সম্বন্ধ খুব অল্প। যে দুইটি ঘটনা গৌণ ও মুখ্যভাবে এই সাহিত্যকে সম্ভব করিয়াছে তাহা– ইংরেজের আইন ও ইংরেজী-শিক্ষা; বাকী যাহা-কিছু তাহা বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। আমার যে অভিপ্রায়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহার পক্ষে ঐ দুইটি ব্যাখ্যা-বিবৃতি সম্পূর্ণ অবান্তর। এ প্রসঙ্গে একটা প্রধান কথা এই যে, এই সাহিত্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাব্য-প্রধান, ভাবোচ্ছল, আদর্শপন্থী। অক্ষয়কুমার দত্তের জ্ঞান-পিপাসা বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মযোগ বাংলা গদ্য-সাহিত্যে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অকালেই নিবৃত্ত হইয়াছিল। মধূসুদনের মহাকাব্যও যেমন কবিতার গীতিচ্ছন্দ রোধ করিতে পারে নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের পুরুষোচিত প্রতিভাও তেমনই জাতির অতীত-গৌরবের ধ্যানে বাংলাসাহিত্যের যে মূর্তি নির্মাণ করিল, তাহাতে ভাব-কল্পনার আবেগই শেষ পর্যন্ত অটুট হইয়া রহিল। অতএব যে-প্রভাবে এ সাহিত্যের জন্ম, তাহা নিকট বাস্তবের নহে– পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব-রাজ্য হইতে তাহার বীজ অন্তরেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বাহিরের সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল না; বরং বাস্তবের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন, মুক্ত-স্বাধীন কবি-কল্পনাই জীবনের অতি ঊর্ধ্বে এক উদার নক্ষত্র-লোক বিস্তার করিয়াছিল। এজন্য সাল-তারিখ-সমন্বিত ঘটনার ঐতিহাসিক ফ্রেমে আমি এই আলোচনাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করি নাই।

মোহিতলালের উক্ত বক্তব্যকে পুরো সমর্থন করা যায় না প্রথমত এ কারণে যে, সাহিত্য-বিচারে ইতিহাসের তারিখ পর্যালোচনা করে সমালোচ্য-বস্তুর বিষয়বস্তুর সাথে স্রষ্টার সময় দেশ-কাল-সমাজ-পরিবেশের উপযুক্ত কার্যকারণ সম্বন্ধ সবসময় বস্তুনিষ্ঠভাবে পাওয়া না-ও যেতে পারে। শিল্পস্রষ্টার সৃষ্টির পেছনে সুক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল সমাজ-দেশ-কাল বাস্তবতার প্রতিক্রিয়াজাত কার্য-কারণ বিষয়ে মোহিতলাল তাঁর বক্তব্যে কিছু বলেননি। তবে তিনি কখনও কখনও তা অনুভব করে সমালোচনা করেছেন বলে মনে হয়। তাছাড়া সাহিত্যকারের মানস ও ভাবাদর্শের ব্যাখ্যান ছিল তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তা বোঝাবার জন্য তিনি সমালোচ্য-সৃষ্টির অংশবিশেষ সমূহ দৃষ্টান্ত বা নিদর্শনরূপে

ব্যবহার করতেন। অনেক সমালোচ্য গ্রন্থের কোনো বাক্যেই যদি মূলভাবটি ব্যক্ত হয়ে পড়ে তখন তার আলোচনাই হয়েছে তাঁর সমালোচনার বিষয়বস্তু। কিংবা সমালোচ্য গ্রন্থে কি আছে, তা তাঁর কাছে বড় হয়ে না উঠে, সেটি তাঁর মনে কি কি চিন্তার উদ্রেক করেছে তা ব্যাখ্যা করাই হয়েছে তাঁর আলোচ্য বিষয়। আবার অনেক সময় তাঁর মতে যা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাবাদর্শ, সমালোচ্য বস্তুতে তা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে সেটি যাচাই করে নিয়েছেন। 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে তিনি সমালোচনাকে বলেছেন ব্যাখ্যা; সৃষ্টিকে পাঠকের চিত্তে ধরিয়ে দেয়া যার অভিপ্রায়। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অধিকাংশ মতামত গঠিত হয়েছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক তথা ম্যাথু আর্নল্ড, অসকার ওয়াইল্ড, এবং দার্শনিক বেনেদিতো ক্রোচের প্রভাবে। সাহিত্যকে 'বাঙ্ময় বিগ্রহ' আখ্যা দিয়ে 'বাস্তবসৃষ্টির রহস্যবোধ,প্রত্যক্ষ প্রকাশমান রূপের নিবিড়চেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্যকে উৎকৃষ্ট রচনা মনে করেছেন। অর্থাৎ কেবল ভাবে নয়, জীবন ও জগৎঘটিত একটা সাক্ষাৎ উপলব্ধি রূপসমন্বিত হয়ে বিদ্যমান থাকতে হবে খাঁটি সাহিত্যরচনায়। সমগ্রতার এই রূপ-সংবেদনা স্রষ্টার অন্তঃপ্রেরণাসহ সাহিত্যবিচারকের চিত্তে ধরা পড়ে। মোহিতলাল একে প্রকৃত ও প্রথম বিচার বলতে চেয়েছেন। ঊনিশ শতকে ম্যাথু আর্নল্ড সাহিত্যকে বলেছেন, 'criticism of life', জীবনের অনুকরণ নয়, জীবন-সমালোচনা। সাহিত্যের রূপের বিচার প্রসঙ্গে মোহিতলাল অন্যান্য বিচার-পদ্ধতির সাথে আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান (stylistics) নিয়েও আলোচনা করেছেন। সাহিত্য-বিচারে অবশ্য তিনি একে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি মনে করেন নি। সমালোচনায় রূপের বিচারের সঙ্গেই রসাস্বাদন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর কাছে। আর গুরুত্বপূর্ণ হল মহাকাল বা সময় যা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের শক্তিকে মেপে নেয়। সাহিত্য-বিচারের নানা পদ্ধতি কিংবা খাঁটি সাহিত্যরচনা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন মোহিতলাল। 'তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যালোচনার একটা পরাদর্শ বা standard নির্দিষ্ট করা, 'সাহিত্য', 'স্ব' ও 'সমাজ' এই তিন দিকে সমান দৃষ্টি রেখে সমগ্রভাবে জীবনের একটা সংহত সার্থকতার সন্ধান তিনি দিতে চেয়েছেন।[৫৭]

সমালোচক মোহিতলালের কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। বিশ শতকীয় আধুনিকতা, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত নব জিজ্ঞাসা ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্য সৃষ্টির কিংবা সমকালীন প্রগতিকে মোহিতলাল মেনে নিতে পারেননি, পরিবর্তে ঊনিশ শতকীয় জীবনদর্শনকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। আধুনিক সমাজ-জীবন ও সৃষ্টির একটা ভিন্ন অর্থ করেছিলেন তিনি। 'শনিবারের চিঠিতে' তাঁর কল্লোল-সমালোচনাই তা প্রমাণ করে। 'Modern Bengali Prose' (*An Acre of Green Grass* গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু মোহিতলাল প্রসঙ্গে বলেন :

> Though a formidable prose-writer, endowed with a more genuine passion for literature than many of his antagonists, Mohitlal is unfortunately enthralled by precisely that aspect of our nineteenth century renaissance which, today, deserves nothing but denial: I mean the militaristic Hindu nationalism, corresponding to the angry righteousness of Luthen and Cromwell.[৫৮]

বুদ্ধদেবের মন্তব্য অযৌক্তিক না হলেও সমকালীন সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় মোহিতলাল তাঁর বিচারভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর ভাষাভঙ্গি, সৃজনীশক্তি ও অবিচল নান্দনিক মতাদর্শ ও আত্মপ্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২)

জন্মসূত্রে অবাঙ্গালি হলেও বাংলাভাষাকে মাতৃভাষার মতই চর্চা করে প্রবন্ধকার তথা সমালোচক হিসেবে একটা স্বকীয় 'স্টাইল' বা শৈলী নির্মাণ করতে পেরেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন যা সমকালে 'চতুরঙ্গ', 'কবিতা', 'পরিচয়', 'দেশ', 'জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাঁর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো হল: 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮), 'পান্থজনের সখা' (১৯৭৩), 'পথের শেষ কোথায় এবং পূর্ব প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ' (১৯৭৭), 'ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক' (১৯৯১)। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্ভোগ এবং সেই সূত্রে আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয়ই মুখ্যত *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য :

> ... একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে দেখাতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। অমঙ্গলের চেতনা রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কী ভাবে কখনো সংকুচিত, কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্বের কাব্যরচনায় কতো গভীর ও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে সেটা স্পষ্ট করে তোলা আমার রবীন্দ্র-কাব্যালোচনার একটা পক্ষ। অন্যপক্ষে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, প্রধানত এরই পরিণামে কবি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিশ্বনিরীক্ষা ও জীবনবোধ কেমন করে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিণত হয়েছে, রোমান্টিক উদ্বেলতা ও বিষাদ থেকে ঈশ্বরপ্রেমের সমাহিত প্রশান্তি; সেখান থেকে দুই ভিন্ন পথে একই কালে এগিয়ে চলেছে পাশ্চাত্য হিউম্যানিজম-এর দিকে এবং এক ট্র্যাজিক চেতনার দিকে যাতে নক্ষত্রের ভাঙ্গাগড়া, সভ্যতার উত্থান-পতন, মানুষের সেই দুঃখ, 'কোনো কালে যার অন্ত নাই'– সবকিছুর মধ্যে 'ভীষণের প্রসন্ন মূর্তি' দেখতে পাওয়া সম্ভব।

শিল্প-সাহিত্যের বিচারে শিল্পকর্মের ভেতরে প্রতিফলিত শিল্পীর অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির মহত্ত্ব বিচারকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুর। তাঁর এই মতাদর্শের সমর্থনে তিনি ওয়াল্টার পেটার, টলস্টয়, টি. এস. এলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ এমনকি প্রকরণবাদী সমালোচক ও তাত্ত্বিক আই. এ. রিচার্ডস-এর বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[৫৯] কেবল সাহিত্য-মাধ্যমের দোষ-গুণ বিচারই সমালোচনার নয়, একথা বলেন তিনি। আধুনিকতাবাদী শিল্প-আন্দোলন প্রসঙ্গে আইয়ুব বলেন, আধুনিকতার সংজ্ঞা তাঁর কাছে ব্যাপক। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে আধুনিক কবিতার প্রকৃতি ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। সমস্ত জাগতিক দুঃখ ও পাপের কথা মনে রেখেও জীবনকে ভালবাসতে চান সমালোচক, কিন্তু কিছুসংখ্যক 'আধুনিকবাদী' সাহিত্যিক সম্পর্কে (বোদলেয়ার ও অন্যান্য) তাঁর প্রতীতি এই যে, জীবনকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন তাঁরা এবং ঐ ঘৃণাভাবের উত্তম প্রকাশ তাঁদের কবিতায় রয়েছে, রয়েছে 'নতুন কালের আপ্তবাক্য, ইহজীবনের চূড়ান্ত অভিশপ্ততা।' আধুনিকতাবাদীদের সাথে আইয়ুবের বিরোধ একারণেই। তাঁর মতে, বিশ্বজগৎ থেকে শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হলে, তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। ফলে জগতের প্রতি অসীম রিক্ততা, বিতৃষ্ণাবোধ কিংবা অনুভূতির খণ্ডিত, প্রকাশ অর্থ্যাৎ একেবারে নৈব্যর্ক্তিক এক জগত সৃষ্টি হয়, যা শিল্পের জন্য কাম্য নয়। জীবনের সব ইতি-নেতি মিলিয়ে সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় আইয়ুবের কাছে। এই 'যথার্থ' শুধু বাচ্য-বাচকের সম্মতি নয়, সত্য ও সুন্দরের সম্পৃক্ত রূপ; যা আবার প্রচলিত সত্য বা বাস্তব কিংবা সুন্দর অর্থে নয়। এই বিবেচনা থেকেই প্রধান হয়ে উঠল সাহিত্যকে মূল্যমানের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখার প্রবণতা। অর্থাৎ শাস্ত্রনীতি নয়, মানবিক নৈতিকতায় এই মাত্রাঙ্ক নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। তত্ত্বের দিক থেকে সাহিত্যকে না দেখে, সাহিত্যের মধ্যে থেকেই তাত্ত্বিক অবস্থান নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন তিনি। একদিকে লেখকের প্রত্যয় থেকে প্রকাশে পরিণত মূল্যবোধ, অন্যদিকে সেই প্রকাশচিহ্নের ব্যাখ্যা থেকে পাঠকের প্রতীত মূল্যবোধ-এই দুয়ের সমন্বয়-সমস্যায় সাহিত্যপাঠের এক অন্যতর ও অনিবার্য দৃষ্টিকোণের সন্ধান দিলেন আইয়ুব।[৬০]

আইয়ুবের সমালোচনার ভঙ্গি বিশ্লেষণাত্মক, যার চর্চা সমকালীন সমালোচনা-সাহিত্যে খুব বেশি ছিল না। সমালোচনায় শিল্প-বিচার বা কাব্য মূল্যায়নের অনেক মৌলিক জিজ্ঞাসা তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে। একজন আধুনিক দার্শনিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বিচার করে প্রাতিস্বিক সমালোচক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। বস্তু ও যুক্তির প্রতি পাশ্চাত্য দর্শনলব্ধ পক্ষপাত, ভারতীয় দর্শনের প্রতি অনুরাগ, বস্তুবাদ-ভাববাদ-সৌন্দর্যচেতনার সমন্বয় প্রয়াস, বিশ্লেষণপ্রবণ মন,

প্রগাঢ় মননশীলতা ও চিন্তার গৌরবে, সর্বোপরি প্রাঞ্জল ভাষায়তন সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যভাবনার এক ভিন্নরকম সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে গেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ঊনিশ ও বিশ শতকের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে সমালোচনা ছিল, কিন্তু তার নিজস্ব বিশিষ্ট রূপটি গ্রিক কাব্যশাস্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত অর্থাৎ প্রাচীন লক্ষণাক্রান্তই থেকে গিয়েছিল। আধুনিক বাংলা সমালোচনা প্রয়োগের দিক থেকে অনেকটা পাশ্চাত্য প্রভাবজাত। শিল্পের বিচারে শিল্পনীতিকেই প্রাধান্য দেয়া ঊনিশ শতকীয় সমালোচনার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিম-পূর্ব সমালোচনায় সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের বিশেষ কোনো যোগস্থাপন করা হয়নি। তেইন, বাক্‌ল প্রমুখের চিন্তাপ্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে সমাজ ও সভ্যতা বিবর্তনের একটি প্রকৃষ্ট ফল বলে নির্দেশ করলেন। ভারতীয় মহাকাব্যের যুগ থেকে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের ধারাকে সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিম বিস্ময়কর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা প্রকাশের যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকার লেখকবৃন্দ, প্রধানত রবীন্দ্রনাথ আবার এই যুগের মধ্য থেকেই মৌলিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রধান আস্বাদনমূলক ভাবনাকে প্রকাশ করলেন। তিনি যে ভাবগ্রাহী সমালোচনার প্রবর্তন করলেন, প্রিয়নাথ সেন যে ধারায় বিশ্বাসী, আশুতোষ বা প্রমথ চৌধুরীর ফরাসি রোমান্টিক কাব্য কিংবা সাহিত্যচিন্তার অনুষঙ্গ যে যুগে প্রবল হয়ে উঠেছে, সেখানে স্বভাবতই ইংরেজি ও ফরাসি রোমান্টিক কাব্যজগতের গভীর পরিচয় নিহিত। রোমান্টিক সমালোচনার মূল সূত্রগুলো বঙ্কিম-উত্তর বাংলা সমালোচনায় বিশেষত রবীন্দ্র-যুগের সমালোচনায় গৃহীত হয়েছে। রোমান্টিক সমালোচনার মূল কথাটা হল- সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ সৃজন, কবিকল্পনা তার আত্মা, স্টাইল তার শরীর। আরো সূত্র হল-সাহিত্য নীতির অনুশাসন মানে না, কিন্তু রীতির শাসন মানে, বিষয়ের উপর কিছুই নির্ভর করে না, বিষয়ীয় উপরই সবকিছু নির্ভরশীল, অর্থাৎ কী বলা হল, তার চেয়ে কেমন করে বলা হয়, সেটাই বড় কথা। সাহিত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সমালোচকের প্রথম গুণ এই যে, তিনি যেকোনো সাহিত্যকর্মের ভাবটি (Impression) আপন হৃদয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম, দ্বিতীয় গুণ, সেই ভাবকে আপনার করে আবার পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে সক্ষম।[৬১] এছাড়া সাহিত্যের সাথে সত্য, সুন্দর মঙ্গল, নীতি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট হয়ে সাহিত্য-বিচার করা হয়েছে গোটা ঊনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম পাদে। যদিও সাহিত্য-বিচারে নীতিবোধকে সকল সমালোচক একইভাবে গ্রহণ করেননি। রোমান্টিক কবিকথিত beauty এবং truth এর সমন্বয় বা ভারতীয় মানসে সত্য-শিব ও সুন্দরের ধারণায় নীতিবোধ যতটুকু ছিল,ততটুকু গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সচেতনভাবে কাব্যের অভ্যন্তরে

নীতিচিন্তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতিকে স্বীকার করেছেন,সেখানে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব– যেন যথার্থ সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট কাব্য অনায়াসেই নীতিকে অন্তরে ধারণ করে আছে। এছাড়া 'Art for Art's sake', সাহিত্য উদ্দেশ্যহীন– এই অনুভূতিগুলো ঊনিশ শতকের শেষভাগে বিকশিত হয়ে উঠছিল। তবে খাঁটি Aesthetic বা Intellectual beauty'র ধারণা ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে সম্ভব ছিলনা বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্দরকে দেখার চেষ্টা করেছেন। 'Art for Art's sake আন্দোলন পাশ্চাত্যের যথাযথ অর্থে এখানে এইজন্যই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।'[৬২]

বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা সমালোচনায় নতুনত্ব দেখা দিল। ঊনিশ শতকের ইংরেজি সমালোচনার প্রতি বাঙালি সমালোচকের উৎসাহ তিরিশের দশক থেকে হ্রাস পাচ্ছিল। সমালোচক ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, ম্যাথু আর্নল্ড, ওয়াল্টার পেটার-এর সমালোচনা আদর্শের পরিবর্তে আধুনিক ইংরেজ সমালোচকের (যথা-টি.এস. এলিয়ট, এজ্রা পাউন্ড, আই.এ.রিচার্ডস) কাব্যপ্রত্যয়, সমালোচনা ভাবনা প্রভৃতির চর্চা ব্যাপকতর হল। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকায় সমালোচনায় এই নতুন সুরটি প্রথম শোনা গেল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখের সমালোচনা-কর্মে কথ্যচ্ছন্দের প্রতি মনোযোগ, গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধন, আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধির প্রাধান্য প্রভৃতি গুণ দেখা গেল। ধীরে ধীরে সাহিত্য-পর্যালোচনায় নানারকম পদ্ধতি এবং জ্ঞান প্রক্রিয়ার তত্ত্বের সমবায় ঘটেছে। নব্য সমালোচনা (New criticism) ছাড়াও নতুন কয়েকটি সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা পদ্ধতি পর্যালোচিত হয়েছে। সাহিত্যবিচারের মধ্যেই অন্যান্য বিষয়ের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি (Analytical approach) ঢুকে যেতে পারে, আধুনিক সমালোচনার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন। রচনাকে (Text) অধিক গুরুত্ব দেওয়াও সমকালীন সমালোচনার বৈশিষ্ট্য। বিশেষত রূপবাদী সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্ব (Formalist approach of criticism) বিশ শতক থেকে বাংলা সমালোচনায় পরিচিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। 'আধুনিক' ও 'উত্তর-আধুনিক' যুগপর্বে নানা শিল্প-আন্দোলন তথা সাহিত্য-মতাদর্শ অনুযায়ী সাহিত্যবিচারের বৈচিত্র্যময় রীতি বা দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম ও ক্রম-বিবর্তন হচ্ছে। বাংলা সমালোচনা এই সব কিছুকেই কম-বেশি ধারণ করে আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব বসুর নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা ও সমালোচক মানস : পরিপ্রেক্ষিত

ক.

বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় নতুন মাত্রা ও বৈচিত্র্যের যোগ করেছেন আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। এঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় আছেন বিশ শতকের তিরিশের দশকের কবিরা। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ তাঁদের প্রায় স্বতন্ত্র শিল্পাদর্শ ও বিচারবোধের প্রয়োগে বাংলা সমালোচনার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) তাঁর নিজস্ব শিল্প জিজ্ঞাসা ও সমালোচনা ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে অনন্য হয়ে আছেন। সমালোচক হিসেবে তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও সাহিত্যচিন্তার পরিচয়টিও এ সূত্রে জেনে নেয়া প্রয়োজন; যার পেছনে অনেকটা সক্রিয় তাঁর কালের জীবন-প্রবাহ এবং ব্যক্তি-জীবনের পঠন-পাঠন।

বুদ্ধদেব বসুর শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে কুমিল্লা, নোয়াখালি ও ঢাকা শহরে। মাতৃহীন বুদ্ধদেবের প্রতি মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহের আত্যন্তিক যত্নের কথা তাঁর স্মৃতিচারণেই রয়েছে। এছাড়া বিখ্যাত লেখকেরা ছিলেন তাঁর বাংলা ভাষার আদি শিক্ষক :

> ইংরেজি ছিলো আমাদের কাছে বইয়ের ও স্কুল-কলেজের ভাষা– জীবনের ভাষা বাংলা আমার বাংলার জন্য চিন্তাহরণকে কোনো শ্রম করতে হয়নি, আমার শিক্ষক ছিলেন লেখকেরা– যোগীন্দ্রনাথ উপেন্দ্র কিশোর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জাদুকরগণ। দাদামশাই আমাকে সংস্কৃতটাও ধরিয়ে দিয়েছিলেন।[১]

১৯২৩-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে যখন ভর্তি হন, সে সময়ে তাঁর বাংলা সূচিতে ছিল কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪১-১৯১০) *প্রভাত চিন্তা* (ঢাকা ১৮৭৭), লুত্ফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) *উন্নত জীবন* (১৯২৬) ও রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনী*। ১৯৫২-এ ভর্তি হন ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আই.এ ক্লাসে। তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন অপূর্ব কুমার চন্দ্র :

> তাঁর জন্য সেই ক্ষুদ্র ইন্টারমিডিয়েট কলেজের লাইব্রেরিটি আধুনিক য়োরোপীয় সাহিত্যে পরিপুষ্ট ছিলো, আসতো 'লন্ডন মার্কারি', আমেরিকার 'ডায়াল' পত্রিকা: ছাত্রদের কমন-রুমে সাজানো থাকতো থরে থরে সচিত্র বিলেতি সাপ্তাহিক, যার এক'টির পাতায় আমি প্রথম পড়েছিলাম চেস্টার্টনের 'লন্ডন নোটবুক' পত্রিকার-ঠিক এক-পৃষ্ট-জোড়া এক একটি মনোমুদ্ধকর প্রবন্ধ বা ছোট গল্প। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও অপূর্ব কুমার আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন এক ভল্যুম আন্তন চেখবের পত্রাবলি, আর অলডাস হাক্সলিক প্রথম উপন্যাস ক্রোম ইয়োলো।[২]

এছাড়া নয় থেকে দশ বছরের মধ্যেই হেম-নবীন-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের সাথেই ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়র, উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্থ, কুপার, টমাস গ্রে এবং তার কিছু সময় পরে জুলভার্ন, ভিক্টর হুগোসহ অনেকের রচনার সাথে বুদ্ধদেবের পরিচয় ঘটেছিল। বই পড়াই তাঁর প্রধান আনন্দ হয়ে উঠেছিল তখন। ইংরেজি সাহিত্যের সাথে গভীর অন্তরঙ্গতার আরো অনেক স্মৃতিচারণ রয়েছে 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন', 'আমাদের কবিতাভবন' ইত্যাদি আত্মজীবনীমূলক রচনায় । বুদ্ধদেবের প্রথম পাঠস্মৃতির মধ্যে আছে 'বালক' পত্রিকার নাম। মাসে মাসে কলকাতা থেকে আসত অনেকগুলো পত্রিকা, ভিপি-যোগে বই। তাঁর প্রিয় পত্রিকা ছিল সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ', সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক'। এছাড়া নোয়াখালি বাসকালেই নিয়মিত পড়েছেন 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। ষোল বছর বয়সের মধ্যে ঢাকা অবস্থানের প্রথম তিন-চার বছরে বুদ্ধদেবের পাঠ-তালিকায় (*আমার ছেলেবেলায়* বর্ণিত) যেসব গ্রন্থ ও লেখকের নাম পাওয়া যায় তাদের একটি তালিকা হল: চার্লস ডিকেন্স, বর্নর্ড শ', শেলী, রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে, লিপিকা, পূরবী, ক্ষণিকা,* উপন্যাস *কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো*, চেখহ্ব, টুর্গেনিহ্ব, ক্লুট হামসুন, য়োহান বোইয়ার, প্রভুচরণ গুহঠাকুরতার প্রবাস থেকে পাঠানো ইবসেন, ম্যাটারলিঙ্ক, গোর্কি, আন্দ্রীয়েহ্ব, অস্কার ওয়াইল্ড, শ্যন ও' কেইসি এবং সমকালীন মার্কিন কবিতার সংকলন। এছাড়া পলগ্রেভের সংকলন থেকে তিনি নিবিষ্ট মনোযোগে পড়ে নিয়েছেন শেলী, কীটস, বায়রন ও ব্রাউনিংয়ের কবিতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমন রুমে পড়েছেন 'পাঞ্চ', 'রিভিয়ু অব রিভিয়ুজ', তৎকালীন বিখ্যাত বিদেশি পত্র-পত্রিকা, 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসুর পাঠ্যতালিকায় ছিল *বেওউল্ফ*, আলেকজান্ডার পোপ, সুইনবার্ন, ভিক্টোরীয় কবিতা। এম.এ. পরীক্ষার স্কলারশিপের টাকায় কেনেন ডি. এইচ. লরেন্স এবং অল্ডাস হাক্সলির পুরো সেট।[৪] বুদ্ধদেবের রচিত অনেক উপন্যাসে এই দুজনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে বলে 'শনিবারের চিঠি'তে (ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৪৯) দাবি করা হয়। এম.এ পড়ার শেষ বছরে (১৯৩১) বুদ্ধদেবের হাতে আসে বোদলেয়ার-এর কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ এবং সেখান থেকে কয়েকটি কবিতা তিনি তখনই অনুবাদ করেন। পাঠ্য-বিষয়ের নানা চর্চা প্রসঙ্গে বলেন :

> আমাদের পাঠক্রমে প্রধান কবি আলফ্রেড টেনিসন... কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন ব্রাউনিং তাঁর এবড়োখেবড়ো ছন্দ আর ইতালির গালগল্প নিয়ে, একটি উন্মাদনা ছিলেন সুইনবার্ন; একটি প্রণয় প্রিয়্যাফেলাইট গোষ্ঠী– এবং চিত্রকলায় আমার প্রথম প্রবেশের সরু রাস্তাটিও তাঁরাই। আমার এই তখনকার প্রিয় কবিদের কাছে আমি যে কিছু শিখেওছিলাম, আমার 'কঙ্কাবতী' বইটাতে তার নিদর্শন আছে।[৫]

ভিক্টোরিয়ান যুগ কিংবা ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণের প্রতি বুদ্ধদেবের অনুরাগ ছিল তা তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যায়। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিশেষ পত্র হিসেবে ভিক্টোরীয় কবিতা নেন তিনি। এই বিশেষ পত্র নেয়ার কারণ, 'প্রথম শুধু কবিতা বলে, আর যেহেতু ইংরেজের এই দূর উপনিবেশে ভিক্টোরিয়ানরাই তখনও প্রায় সর্বাধুনিক, জর্জিয়ানরা সবে পৌঁছেছেন।'[৬] এরই মধ্যে বাংলা কবিতায় নতুন কাব্যাদর্শের সন্ধান করেছেন তিনি। ফলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) কবিতা পড়েছেন বুদ্ধদেব। কারণ হিসেবে বলেছেন, "যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমারা আটকা না থাকি চিরকাল, তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য করে তুলতে পারি। লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবীন্দ্র-বিদ্রোহ... কখনও কখনও এ নিয়ে তর্ক-বাগবিতণ্ডাকে নিস্ফল ভেবে তাঁর মনে হতো, 'নিজের ধরণে নিজের কাজ করে যাওয়ার মতো ভালো আর কিছু নেই।'[৭] সতের থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই সাহিত্যবিষয়ক বিচিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন বুদ্ধদেব। ইউরোপীয় ভাবাদর্শ, সাহিত্যবোধ ও রোমান্টিক বোধ-ব্যাকুলতা এবং ভারতপুরাণ তাঁর অন্তর্চৈতন্যে প্রভাব ফেলেছিল।

শৈশব থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যপাঠেই বুদ্ধদেব ছিলেন অতি উৎসাহী। এর মাঝে সম্ভবত রোমান্টিক কবি-সাহিত্যিকেরাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। রিপন কলেজে অধ্যাপনাকালে কলেজ-লাইব্রেরির সংগ্রহে থাকা উনিশ-বিশ শতকী সাহিত্য, বালজাক, আনাতোল ফ্রাঁন্স ও প্রিয় নানা লেখকের নতুন রচনা পড়েছেন গভীর আগ্রহে। তাঁর 'প্রধান নেশার কেন্দ্র' ছিল বই পড়া। এছাড়া দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে বুদ্ধদেব বসু জাতিক-আন্তর্জাতিক অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসেছেন, অনেকের সঙ্গেই তাঁর গড়ে উঠেছে আন্তরিক সম্পর্ক। ১৯৫৩ সালে (১৯৬৩ সালের পর পর্যন্ত) অধ্যাপনা সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলে সেখানকার কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সমকালীন যে-সব বাঙালি ব্যক্তিত্বের ও তাঁদের রচনার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে, তাঁদের মধ্যে আছেন- সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শচীন দেববর্মণ, প্রবোধচন্দ্র গুহ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, আশালতা সিংহ, শিবনারায়ণ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হুমায়ুন কবির, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, ভবতোষ দত্ত প্রমুখ। ১৯৩১-এ ঢাকা থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতা যান বুদ্ধদেব। কলকাতায় তাঁর এককালীন বাসভবন ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ হয়ে উঠেছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মিলনকেন্দ্র, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। সমকালীন এসব ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ

বুদ্ধদেব বসুর প্রাতিস্বিক জীবনবীক্ষা ও মননচৈতন্য বিকাশে পালন করে সুদূরসঞ্চারী ভূমিকা।[৮] আন্তর্দেশিক কবি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধদেব বসু জেনেছেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক সাহিত্যধারার মৌল প্রবণতাসমূহ।

বুদ্ধদেবের জন্ম কুমিল্লায়, কিন্তু তাঁর শৈশব কেটেছে নোয়াখালিতে- তাঁর সাহিত্যরচনার শুরু সেখানেই। যে বয়সে তিনি 'সন্দেশ', 'মৌচাক', এমনকী 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ'-এর মতো পত্রিকারও মুগ্ধ ভোক্তা, তখন নিজেও প্রকাশ করেছেন 'বিকাশ' অথবা 'পতাকা' নামে হাতে লেখা মাসিকপত্র, যার সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকার– সবই বুদ্ধদেব। নোয়াখালির নির্মল প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতা, সবুজ আঞ্চলিক পরিবেশে তিনি শৈশব কাটিয়েছেন। যেখানে তখন 'জীবন চলে মন্থর, বিশ-শতকী ব্যস্ততা থেকে সুদূর, দিনের পর দিন একই বৃত্তে ঘুরে ঘুরে', সেখানে "গাছপালা অজস্র, যেখানে-সেখানে পুকুর, সারা শীত গৃহস্থের উঠোন আলো করে রেখেছে লাল আর হলদে রঙের গাঁদাফুল, ফুটে আছে পথের ধারে ধারে পাতার ফাঁকে রক্ত-লাল জবা আর হলুদ-রাঙা ঘন্টার মতো টগর... আছে আকাশ-জোড়া ঝিমঝিম জ্যোস্না, আর শীতের জ্যোস্নায় ঘন কুয়াশার আস্তরণ, যাতে চেনা জিনিস রহস্যময় হয়ে ওঠে...।"[৯] পুরনো অথচ নোয়াখালির সবচেয়ে ভালোর মধ্যে একটি বাংলোতে (ডেল্‌নি হাউস) তাঁর বেড়ে ওঠা, সেখানে দক্ষিণের ছোটো ঘরটিতে এক সন্ধ্যাবেলা ইংরেজিতে একটি কবিতা লিখে ফেলার পর প্রায় দিনই নিয়ম করে লিখেছেন তিনি। ১৯২২-এ ঢাকায় আসার পর ওয়াড়ির (তেইশ নম্বর র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে) পাঁচিল-ঘেরা কম্পাউণ্ডওলা একটা বাড়িতে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে সগর্ভ ও প্রভাবশালী পর্ব।' কৈশোর থেকে নবযৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার এই সময়- এই ঢাকাবাসের প্রায় দশ বছর ভেঙেচুরে গড়ে তুলছিল পরিণত বুদ্ধদেবকে। তার বেড়ে ওঠার এইসব পরিবেশ প্রকৃতি একটা বিরাট ভূমিকা রেখেছে। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রবেশ করার কিছুদিন আগে (১৯২৫) সতের বছর বয়সে দিদিমার সঙ্গে এসেছেন পুরানা পল্টনের বাড়িতে। প্রথম যৌবনের দু'বছর এখানেই কেটেছে তাঁর। পুরোনো পল্টনের উদার অকৃপণ প্রকৃতির সমারোহ ও অভ্যস্ত নির্জনতায় লেখাও শুরু হয়েছিল। "মেঘের খেলা, চাঁদের ভাঙা-গড়া রোদ্দুরের রং-বদল, আর স্বপ্ন, কিছু স্বপ্ন- এই সব নিয়ে পুরানা পল্টনে" দিন কাটছিল তাঁর, নিজেকে তখন তাঁর মনে হয়েছে 'একটা আবেগের পিণ্ড, বাস্তবে কল্পনায় জট পাকানো একটা বাণ্ডিল' যেন সৃষ্টিরই উল্লাসে তাঁর 'শাসনহীন' উদ্দেশ্যহীন অনুভূতিগুলো মুচড়ে দেয় স্নায়ুতন্ত্র, বুদ্ধিকেও বিভ্রান্ত করে।' লেখার পাতায় 'আবেগ উপচে পড়ে' সব কিছুর উর্ধ্বে 'লেখালেখি ব্যাপারটাই কেমন আটকে রাখে' তাঁকে।'[১০] পুরানা পল্টনের এই আনন্দে-ব্যর্থতায় মেশানো দিনগুলিই বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের প্রস্তুতিপর্ব, যেখানে দাঁড়িয়ে

তাঁর মনে হয়েছিল- 'তখনকার জীবনকে আমি যেমন করে ভালোবেসেছিলাম, কৃতী ও সম্মানিত পরবর্তী জীবনকে ঠিক সেরকম করে ভালোবাসতে পারবো কি? কে জানে।'[১১] বুদ্ধদেব আসলেই হয়তো কলকাতার নাগরিক জটিল জীবনকে ভালবাসতে পারেন নি আর। অথচ "তিনিই হতে পারতেন 'বুর্জোয়া-বিরোধী নব্য ইনটালেকচুয়ালদের বিশ শতকের নতুন আদর্শ, উপাদান সব ঠিকঠাকই ছিল তৃণমূল থেকে উঠে আসা অর্থাভাবের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত, অসাধারণ প্রতিভাবান ছিন্নমূল এই কবি ছেলেটির; কিন্তু বাধ সাধল তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, রোমান্টিক মন।... আশৈশবই তার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ত্ব প্রকট ছিল। বাস করতেন নিজের সঙ্গে নিজে এক কল্পনার দুনিয়ার, এক স্বপ্নের মনোজগতে।"[১২] এ জগত তাঁকে নিঃসঙ্গও করেছিল। তবে বুদ্ধদেবের ছাত্রজীবনের শেষ ভাগ খুব সুখে কাটেনি। এম.এ পরীক্ষায় ফল বেরোবার পর থেকেই ঢাকা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করেন তিনি এবং ১৯৩১-এ কলকাতায় চলে যান স্থায়ীভাবে। সামান্য গৃহশিক্ষকতা অবলম্বন করে কেবল নিরুপদ্রব সাহিত্য রচনার স্বপ্ন নিয়ে তিনি সেখানে যান। প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চার এক বৃহৎ পরিমণ্ডল পেয়ে তিনি অনেকটা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছিলেন কলকাতায়। মূলত পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত, বিক্ষোভ আর উত্তেজনার রাজনীতিতে উত্তাল সে সময়ের ঢাকার অস্থির পরিবেশে ম্লান হয়ে আসছিল বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত সাহিত্য প্রয়াস। এছাড়া বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত আধুনিক জটিল বিশ্বে মানুষের গতিশীল জীবন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর জীবন কেটেছে দুটি মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। রুশ বিপ্লব, ভারতে অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক সামাজিক অভিঘাত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আনবিক বোমা, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা- এইসব বহুমুখী ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কেটেছে তাঁর জীবন। স্মৃতিচারণে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, শৈশবে তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিঘাত নিয়ে এসেছিল ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের ডাক। সেই উন্মাদনায় বদল ঘটল তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসে আর সাহিত্যিক ভঙ্গিতেও। 'অজ্ঞান বয়স থেকেই' চায়ের নেশা ছিল তাঁর, আর এইসময় 'কুলির রক্ত' নামে অভিহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক কথায় সেই চা খাওয়া ছেড়ে দিলেন, সারা দুপুর চটের মতো মোটা খদ্দরে ঘামতে লাগলেন। নজরুল ইসলাম নামে এক সৈনিক কবির বীররসাত্মক কবিতা মুগ্ধ করল তাঁকে, নিজেও লিখতে শুরু করলেন দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস ভরা 'নবযুগের বন্দনা'র কবিতা বা পল্লীজীবনের প্রশস্তিসূচক গল্প।[১৩] বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় প্রয়াস বুদ্ধদেবের জীবনে খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, কারণ তাঁর সাহিত্য-প্রবণতার সঙ্গে এই সাময়িক প্রভাবজাত রচনাবলির যোগ ছিল খুবই ক্ষীণ।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর দীর্ঘ কর্ম ও সাহিত্যজীবনে বরাবরই এড়িয়ে গেছেন রাজনীতিকে। যদিও তাঁর নিজস্ব একটা রাজনীতি ভাবনা আছে। যে কালে তিনি সাহিত্য রচনা করছিলেন তখন রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় পরিবেশের দারুণ দুঃসময় গেছে, সমাজের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়েছে। যে দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি কবিতা রচনা করেছেন সে তিরিশ বছর বাংলা তথা ভারতবর্ষের পটভূমি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে ক্রমাগত আলোড়িত হয়েছে। তবুও কবি রাজনীতি প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন, 'এমনকি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা জীবনানন্দ দাশের মতো অনাস্থাও প্রকাশ করেননি। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে এস্কেপিস্ট বা জীবন-পলাতক অপবাদ দিয়েছিলেন। এস্কেপিজমের কথা বিশেষ করে উঠেছিল উত্তরতিরিশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও উত্তরচল্লিশের মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়।[১৪] *সব পেয়েছির দেশে* (১৯৪১) গ্রন্থের 'পলায়ন?' প্রবন্ধে আত্মসমর্থন ও অনেকটা এ অভিযোগের জবাবে বুদ্ধদেব বলেন :

> আমি যদি কবি হই তাহলে কবি হিশেবে আমার কর্তব্য ভালো কবিতা লেখা, তাছাড়া কিছু নয়, জীবনের সঙ্গে সেই আমার যোগসূত্র। আমি যদি বাণিজ্য কি রাজনীতি সম্বন্ধে মূঢ় হই, ফুটবল কি ঘোড়দৌড়ের খবর না রাখি তাহলে ক্ষতি কী? আমি বরং বলবো, ভালো কবিতা লেখবার জন্যে যে-রকম জীবন আমার নিজের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল বলে জানি আমি চাইবো আমার জীবনকে সে-ভাবেই গড়তে। সেটা এস্কেপিজম নয়, সেটা শুভবুদ্ধি।

এ প্রবন্ধে রাজনৈতিক শিল্প বা 'প্রপাগান্ডিস্ট' সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতও প্রকাশিত হয়েছে। 'দুর্যোগের দিনে শিল্পকলার চাইতে প্রপাগান্ডারই বেশি প্রয়োজন' একথা মানলেও সেটাকে যুগোপযোগী যথার্থ সাহিত্য বলে বিবেচনা করতে নারাজ তিনি। সাময়িকতার প্রয়োজনেই প্রচারকে তাৎক্ষণিক মূল্য দিয়েছে তিনি। রাজনীতিকে সাহিত্যরচনার অভ্যন্তরীণ তাগিদ হিসেবেও সমান গুরুত্ব দেন বুদ্ধদেব, এটি তাঁর কাছে শিল্প রচনার অন্যান্য প্রেরণার মতই। তাছাড়া শিল্পের আদর্শে উত্তীর্ণ সাহিত্য 'রাজনৈতিক মতাদর্শ-সম্পন্ন' হলেও ক্ষতি নেই এমনটাই ভাবেন তিনি। কারণ হিসেবে তিনি জানান, শিল্পকলার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে; সুতরাং রচনাটি যথার্থ সাহিত্য হলেই হল।[১৫] রাজনীতি ও সমাজচেতনাও সমার্থক নয় বুদ্ধদেবের কাছে। সমাজচেতনা একটি বৃহৎ এবং বিস্তৃত চেতনা। রাজনীতি তারই অংশ মাত্র। তবে আর্থ-সামাজিক উৎপাদন কাঠামোর স্তরীভূত বাস্তবতায় রাজনীতি যেমন করে ব্যাখ্যাত হয়; অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তৎপ্রসূত শ্রেণিসংগ্রামের সত্যে ও কলোনিয়াল পরিবেশে যে সমস্যাকে প্রধানত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক করে দেখেছিলেন সমকালীন অনেক সাহিত্যিক; বুদ্ধদেবের কাছে সে সমস্যা ছিল একান্তই নৈতিক। তাঁর সত্তার মাঝে যা কিছু ভালো, কিংবা খাঁটি;

সবটাই তিনি সাহিত্য রচনাচর্চাতে একান্তভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, কেবল শিল্প-সাহিত্যের মূল্য ও তা রচনার প্রবল আন্তরিক উৎসাহের মাঝেই তাঁর জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি নিহিত। তাছাড়া রাজনীতি বলতে তিনি বুঝেছেন, 'কপটাচরণ, ক্রূরতা, ধূর্ততা; ক্ষণিকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধ্রুব আদর্শের অবমাননা। তাই শিল্পী-মনের পক্ষে ও বস্তু বিশেষ লোভনীয় হ'তে পারে না।'[১৬] এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার সময়কালের কথা। এ পত্রিকার (১৯৩৫-১৯৬১) সম্পাদক বুদ্ধদেবকে বলা যায় প্রকৃত কবিতার নিবেদিত আবিষ্কারক। সমকালে বামপন্থী মহলে যাঁরা শ্রেণীচেতনার কবি, এককথায় পার্টি-কর্মী, তাঁদের অনেকের লেখাই (যেমন, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ) 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি ছাব্বিশ বছর ধরে বাংলা কবিতার একটি রুচিশীল পরিচ্ছন্ন স্বভূমি তৈরির অভিপ্রায়ে সম্পাদিত হয়েছে। সমকালে ২০২, রাসবিহারি এভিন্যু বা কবিতাভবন পরিণত হয়েছিল একটি শক্তিশালী সংগঠনে। যার মাধ্যমে একটা বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লবও সংগঠিত হতে পারতো। কিন্তু রাজনীতিকে বুদ্ধদেব বসু যে দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, বিশেষত সাহিত্যের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে যা ভেবেছেন, কেবল সে কারণেই তা সম্ভব হতে পারেনি। ১৩৫১'র (কার্তিক-পৌষ) সংখ্যার সম্পাদকীয়'তে বুদ্ধদেব লিখেছেন:

> 'কবিতা'র কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ। কবিতা আর কবিতার আলোচনা নিয়েই আমরা এতকাল বেসাতি ক'রে এসেছি। রাজনীতির হাওয়া এর গায়ে কখনো না লেগেছে তা নয়, কিন্তু লেগেছে দূর থেকেই। রাজনীতির যে প্রেরণা ভাবলোকের তা থেকে যে-কবিতা রস আহরণ করেছে তাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু যে- রচনা শুধু খবর বলা, কিংবা যে-রচনা শুধু সেকেলে গতানুগতিকতার বদলে একেলে গতানুগতিকতার সমষ্টি, তাকে আমরা বর্জন করায় দিকেই লক্ষ রেখেছি। সমালোচনার ভিতর দিয়ে সাহিত্যের যে-আদর্শকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি, জ্ঞাতসারে তার বিকৃতি হ'তে দিইনি। নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে ভালোরই অনুসরণ করেছি, সাময়িকের নয়।[১৭]

রাজনীতি, সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের প্রভেদ প্রসঙ্গে তিনি আরো মত প্রকাশ করেছেন 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' (*সাহিত্যচর্চা*) প্রবন্ধে। 'কবিতা' পত্রিকায় রাজনৈতিক আদর্শ মেনে চলা অনেক লেখককে নানা সময়ের রচনা নিয়ে বুদ্ধদেব অনুযোগ করেছেন যে, রাজনৈতিক দলীয় আবর্তে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা কাব্যপ্রতিভার অপচয় করছেন।

অবশ্য ফ্যাসীবাদী হিটলার-মুসোলিনী চক্রের বিরুদ্ধে ১৯৩৫ সালের পর থেকে পৃথিবীর দেশে-দেশে যখন ফ্যাসীবাদবিরোধী লেখক সংঘ গঠিত হয়, বুদ্ধদেব বসু তখন এই সংঘের ভারতীয় শাখার কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করেন।[১৮] উল্লেখ্য যে, সোভিয়েট লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি ম্যাক্সিম গোর্কিই (১৮৬৮-১৯৩৬) প্রথম প্রচার করেন যে, ফ্যাসীবাদের মতো সর্বগ্রাসী প্রলয়কে রুখতে হলে সারা পৃথিবীর সাহিত্যিক এবং শিল্পীদেরও একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন আছে। তিনি এই আন্দোলনের জীবন্ত প্রতীক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে লখনৌতে প্রগতি লেখক সংঘের যে প্রথম অধিবেশন হয় তাতে বুদ্ধদেব ছিলেন না। ১৯৩৮ সালের ২৪-২৫ ডিসেম্বরের দ্বিতীয় অধিবেশনেই সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন বুদ্ধদেব; এছাড়া ১৯৪২-এ সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের সুপরিকল্পিত আক্রমণে নিহত হলে এবছরের মার্চে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলনেও যোগ দেন তিনি।[১৯] বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৪২), মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০) ও আরো নানা ঘটনায় অজস্র আদর্শবাদী তরুণ তখন রাজবন্দী, সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'কবিতা' ও 'পরিচয়' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহকদের একটা বড় অংশ ছিলেন এই রাজবন্দীরা। এঁরা ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছেন মার্কসবাদের দিকে– যদিও ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৪ সালেই বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছে। ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হল দেশে। রাজনীতির মৌলধারা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বুদ্ধদেব; সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিপুল ক্ষতিকর প্রতিফল সম্পর্কেও ভাবিত ছিলেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ বা মতাবাদপিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠীর কর্মী হতে পছন্দ করেননি।[২০] নিজস্ব মানবিক আদর্শের কারণে প্রগতি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। 'শিল্পীমনের অন্তর্বৃত প্রবণতার কারণে'[২২] তিনি আসলে রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন। আর সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের ওপরে তিনি সাহিত্যকেই স্থান দিয়েছেন। সেজন্য অনেক বিক্ষেপ ও বিশৃঙ্খল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, উদ্যমের অনেক অপব্যয় এবং আবেগের অনেক ব্যর্থতা পেরিয়ে, ধীরে ধীরে বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে যে, "সব গতি ও প্রগতি ও পতন ও বিতর্কের পরে অবশেষে কোনো এক গভীর রাত্রে নিজের মধ্যে নিবিষ্টতা ভালো।"[২৩] এই নিবিষ্টতা প্রকারান্তরে শিল্পীর একান্ত স্বধর্মে; নিজের 'মায়াবী টেবিলে'[২৪] নিজের মুখোমুখি ফিরে যাওয়া। কবিতা তথা সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ক বুদ্ধদেবীয় মতও এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' প্রবন্ধে তিনি এ নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন। শিল্পের সার্বভৌমত্বের পক্ষ-বিপক্ষ দাঁড় করিয়ে এ এক অনন্য সাহিত্য তর্ক। যেখানে জীবনের গভীরে শিল্পকলার স্থান, সকল ধরনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থেকে শিল্পকে অবমুক্ত করার পক্ষে নিরন্তর যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। আবার শিল্পের একদেশদর্শী বিশুদ্ধতা কিংবা

নীতি প্রয়োজন ও সংস্কারের নামে তা পরিত্যক্ত ঘোষণারও বিরোধী তিনি। যুদ্ধকঠিন বাস্তবতা কিংবা বিস্তীর্ন হননযজ্ঞ ও ধ্বংসোন্মদনার মাঝে সৌন্দর্যমুগ্ধ হৃদয়ের মর্মরধ্বনি বা শিল্পীর সম্ভোগের স্থান কোথায় এ প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধদেব তোলেন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাবিষয়ক আদিম প্রশ্ন, যে অনিবার্য অনতিক্রম্য প্রেরণার বলে মানুষ যুগ-যুগান্তরে 'কল্পনারচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে বিরতিহীন, অক্লান্তভাবে'; তার গুরুত্ব বুদ্ধদেবের কাছে বেশি, কেননা 'মানবজাতির আবহমান জীবনে শিল্পকলার মৌলিক প্রয়োজন' [২৫] আছে একথা বিশ্বাস করেন তিনি। একজন কবি হিসেবে তিনিও কখনও কখনও সৃষ্টির নেপথ্য তাগিদ অনুভব করেছেন :

> রচনাকর্মের মধ্যে একটা অনিবার্যতা আছে। সত্যি বলতে কবিতা আমরা লিখি না, কোনো-কোনো কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। তার রূপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র।[২৬]

কিন্তু প্রেরণা মানলেও শিল্পীর অন্তর্গামিতা, মনন-চৈতন্যের সহযোগ তথা অনুশীলন বুদ্ধদেবের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, শিল্পীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে আবিষ্কার করা, এজন্য শিল্পীকে নিজের মধ্যে স্তব্ধ হ'তে হয়, অতিশয় শান্ত হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'য়ে প্রতীক্ষা করতে হয়।[২৭] আর আত্ম-আবিষ্কারের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াটি 'জীবন ভরেই চলা উচিত' বলে তিনি মনে করেন; এটি শিল্পীর কর্মের বাধ্যতাও যা তাঁকে 'মুক্তি এনে দেয়'। শিল্পের উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য নিয়েও কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনোরকম শিল্প সাধনায় বিশ্বাসী নন তিনি। আর্টিস্ট বা শিল্পীর দিক থেকে শিল্পরচনার সত্য হল স্রষ্টার নিজের কাছে নিজের অঙ্গীকার। উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর (১৯০০-১৯৭৩) সঙ্গে পত্রালোচনায় (১৯৩৩) এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

> আপনি যদি জানতে চান Art for Art's sake- এর বদলে অন্য কোনো কথা বসানো যায় কিনা, তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি। ধরুন, লরেন্সের কথাটাকে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক- Art for my sake , Art for *my* sake- আর্টিস্টের দিক থেকে এতো বড় সত্য আর-কিছু নয়। আমার জন্য আর্ট– এই একমাত্র কথা, যার প্রতিবাদ করা যায় না, যাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়, কোনোরকম চাঁছাছোলা করবার দরকার হয়না। আমার জন্য আর্ট– এখানে কোনো তর্কের ক্ষেত্র নেই: প্রত্যেক প্রকৃত আর্টিস্টের এটা গূঢ়তম মনের কথা।[২৮]

তবে শিল্পীর পক্ষ থেকে তাঁর নিজের জন্যই শিল্প কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখার উপায় নেই। অর্থাৎ তা কেবলই স্বেচ্ছাচারী সৃষ্টির আনন্দবাদিতা বোঝায় না। এর মাঝে রয়েছে 'প্রকাশতত্ত্ব', যা অনেকটা রবীন্দ্র-নন্দনচিন্তার অনুগামী। 'আত্মপ্রকাশের অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা', 'আত্মপ্রকাশের দুঃসহ যন্ত্রণা' সর্বোপরি ক্রমাগত 'হয়ে ওঠবার' অনির্বচনীয় আনন্দটাই বুদ্ধদেবের প্রকাশতত্ত্বের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন :

> আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধত হয় কিনা।[২৯]

এই একই বক্তব্য ভিন্ন ভাষায় বলেন বুদ্ধদেবও :

> আমি যতক্ষণ লিখি একমাত্র নিজেরই জন্য লিখি... অনির্বচনীয় অনেন্দের জন্য। তাছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই। পৃথিবীর ভালো-মন্দ অন্যকিছুর জন্য আমার ভাবনা নেই। তখনকার মতো আর-কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই আমার পক্ষে; নিজেকে প্রকাশ করবার সেই অসহ্য তাগিদ ছাড়া।[৩০]

শিল্পের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ সাংসারিক কিংবা সামাজিক হতে পারে কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে, 'শিল্পীকুলে নমস্য তাঁরাই যাঁরা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ করলেও সেটাকে বিপুলভাবে অতিক্রম ক'রে যান।[৩১] তাছাড়া শিল্পী কিংবা পাঠকের "মনের মধ্যে যা এক নতুন জীবন দান করে, সেটা নিশ্চেষ্ট কোনো সম্ভোগ নয়, একটি অভিজ্ঞতা নিছক সুখবোধ নয়, আবিষ্কার... তাহ'লে কেমন ক'রে বলা যায় শিল্পকলা আলস্যজীবীর বিলাসিতা বা উচ্চাঙ্গের কোনো আমোদ-প্রমোদ?" আবার 'কিসের জন্য আর্ট'-এ (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা পত্র, ১৯৩৩) বুদ্ধদেব অস্কার ওয়াইল্ড ও বানার্ড শ'র উক্তি যথাক্রমে, 'Art is entirely useless' এবং 'All art is bound to be didactic' এর উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁর কাছে উভয়ই সমান সত্য। যদিও এ প্রসঙ্গে আত্মবিরোধের প্রশ্নও তাঁর জেগেছে মনে। শিল্পকলার উদ্দেশ্য বিষয়ে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের উপযোগিতাবাদের সমকালে শার্ল বোদলেয়ার (Charles Baudelaire, ১৮২২-১৮৬১) স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, কবিতার কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই। সমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে কবির। সমাজকে হয় উপেক্ষা করতে হবে, নয়তো নিতে হবে 'স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন'।[৩২] বোদলেয়ার, মালার্মে প্রমুখ আধুনিক ফরাসী প্রতীকবাদী শিল্পীগোষ্ঠীর কাছে কবিতা হল নিরঞ্জন, স্বনির্ভর, স্বাধীন। বোদলেয়ার ছিলেন নীতিবাদী সাহিত্যের বিরোধী। তাঁর মতে, কাব্য স্বরাট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারণ তা পরম সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। বুদ্ধদেব বসু

বোদলেয়ারের সাহিত্যচিন্তার দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বোদলেয়ারকে তিনি অনুবাদও করেছেন (*শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, ১৯৬১)। বোদলেয়ারের প্রভাবে সমকালীন বাংলা কবিতার ও কাব্যসমালোচনার গতিপথ অনেকটাই নির্ধারিত হয়েছিল এবং বুদ্ধদেবের 'শিল্পচেতনাও কূল খুঁজে পেয়েছিল।'[৩৩] তবে কবি ও তার সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদে বোদলেয়ারের অনুবর্তী চিন্তা তিনি ধারণ করেন নি। কবিতা থেকে আনন্দ পাওয়ার যোগ্য রুচিসম্পন্ন সামাজিক তৈরি করতে হবে এ ভাবনাই তাঁকে সমাজচিন্তায় নিয়ে গেছে। কবিতাকে তাই যেভাবেই হোক, প্রয়োজনীয় করে তোলার পক্ষপাতী তিনি। কারণ, "কবি কাজের লোক নন কথাটি তাঁর মতে, বিলাতী রোমান্টিকতার প্রতিধ্বনি।"[৩৪] বুদ্ধদেবের এই জাতীয় অভিমত তাঁকে পশ্চিমী কলাকৈবল্যবাদীদের থেকে পৃথক করে দেয়। তিনি এও বলেন :

> 'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটাও অর্থহীন, কেননা মানুষ ছাড়া কে-ই বা আছে তার স্রষ্টা বা ভোক্তা– স্পষ্টত মানুষের জন্যই শিল্পকলা। স্পষ্টত মানুষের পক্ষে তা প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন ধর্ম, সমাজ নীতি ও বিজ্ঞান তেমনি– কিন্তু ভিন্নভাবে, ভিন্ন কারণে। নীতিশিক্ষা নয়, জ্ঞানলাভ নয়, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, মানুষের আত্মার পক্ষে, দেই প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে রচিত তার সামগ্রিক সত্তার পক্ষে– রহস্যময় অবিচ্ছেদী এক প্রয়োজন।[৩৫]

ইংরেজ কবি সুইনবার্নের (১৮৩৭-১৯০৯) *Poems and Ballads* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে যে ধারণা বিদ্বৎসমাজে প্রাধান্য লাভ করে এবং যা সাধারণ পাঠক-সমাজের সঙ্গে স্রষ্টার বিচ্ছেদ ঘটায় এবং যে কলাকৈবল্যবাদের তাত্ত্বিক দিক ওয়াল্টার পেটার, হুইসলার ও অস্কার ওয়াইল্ডের রচনায় বিশদতা[৩৬] প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধদেব তার পোষকতা করেন না। 'Mass বা সমাজের সাথে বিযুক্তি নয়, সংযুক্তিই বুদ্ধদেবের কাম্য। কাম্য কবিতারই স্বার্থে।'[৩৭] কারণ কবির সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদাবৃদ্ধি তাঁকে ভালো কবিতা লেখার প্রেরণা যোগাবে। বুদ্ধদেবের এ প্রচেষ্টা 'কবিতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার লক্ষ্যতাড়িত', কারণ তিনি 'কবিকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক জীব বলেই ভাবেন– নিস্প্রয়োজনীয় না ভেবে সর্বোপরি বলেন, 'কবিতা সামাজিক কমোডিটি'।[৩৮]

ত্রিশের দশকে অর্থাৎ কল্লোলযুগের ('কল্লোল', পত্রিকা ১৯২৩) শেষের দিকে নতুন ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক মতবাদ বা জিজ্ঞাসা বিতর্কের সম্মুখীন হয়। এর মাঝে সাহিত্যে বাস্তবতা (বিশেষত শুচি-আশুচি-সুন্দর-অসুন্দর-দারিদ্র্য-পাপ-যৌনতা বীভৎসতা-পঙ্কিলতার রূপায়ণ) ও সাহিত্য এবং নীতির সম্পর্ক বিষয়ক তর্ক প্রাধান্য পেয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ এ

ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হন।[৩৯] বুদ্ধদেব সমকালীন এসব বিতর্ক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি নানা পর্যায়ে এ প্রসঙ্গে তাঁর মতও প্রকাশ করেছেন। 'কল্লোল', 'সংহতি', 'উত্তরা', 'কালিকলম' আর 'প্রগতি'– এই সবকটি পত্রিকা নিয়ে যে কল্লোলকেন্দ্রিক যুগ, সে সময়ে 'কল্লোল'-এ (১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যা) 'অতি- আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে 'প্রগতি' (১৩৩৪) সম্পাদক বুদ্ধদেব তাঁর যে সাহিত্যচিন্তার পরিচয় দেন, সে বিষয়ে তিনি পূর্বাপর একমত না থাকলেও কালের সাহিত্যিক বাদানুবাদের ইতিহাসে তা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> মানবজীবনের কুশ্রীতম দিকগুলি আধুনিকদের লেখায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে... অভিযোগ না হয়ে এটা প্রশংসাসূচক হতে পারে। অতি-আধুনিক সাহিত্যকে post-war সাহিত্য বললেও ভুল হয় না। আধুনিক লেখকেরা সকলেই post war অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। ... দারিদ্র্যের তাণ্ডব-নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, আনন্দ, প্রাণ, আয়ু, ইহকাল, পরকাল সব। ক্ষুধা যেখানে রাজা সেখানে কীই বা করতে পারে সুরাসুরপায়ী কবি আর কীই বা শুভ্রবেশী পুরোহিত। সেই নির্মম রাজার কর যোগানো হলে তবে তো ভগবানকে স্মরণ করার, তবে তো কবির গান শোনার অবকাশ হবে।

সাহিত্যে বাস্তবতার সমর্থনজনিত এই চিন্তা বুদ্ধদেবের বরাবরই একরকম থাকে নি। 'শিল্পকে তিনি শুদ্ধ, স্বাধীন, নির্লিপ্ত সৃষ্টি বলেই বিশ্বাস করেছেন।'[৪০] কালের আবর্তনে বুদ্ধদেব অনুজ লেখকদের বরাবর সাহিত্যধর্ম নিয়ে তখনই সচেতন করতে চেয়েছেন, যখন নব প্রজন্মের লেখাগুলোকে দেখেছেন যত্নহীন, অপরিমার্জিত এবং প্রাণহীন।[৪১] 'আধুনিক' সাহিত্যে বাস্তবতা, ভাল-মন্দ সুনীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে নানা ভাবনা ও মত বুদ্ধদেব বিভিন্ন প্রবন্ধে, পত্রে প্রকাশ করেছেন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য শ্রী দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র ('আর্টে রিয়ালিজম', ১৯৩৩), কবিতা-সম্পাদকীয় (১৩৫৪), 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য (১৯৫২), 'চাই–আনন্দের সাহিত্য' (১৯৫১), কবিতার শত্রু ও মিত্র (১৯৭১) প্রভৃতি রচনা। 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' প্রবন্ধে ইয়েট্‌স, রাইনার মারিয়া রিলকে ও ভালেরি- আধুনিক এই তিন কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আধুনিকতা ও সাময়িকতা বিষয়ে লিখেছেন। বুদ্ধদেব মনে করেন, কেবল সমকালীন ঘটনার বর্ণনাই আধুনিকতার একমাত্র সংজ্ঞার্থ নয় । ভারত-স্বাধীনতার পরে লিখিত এ প্রবন্ধে তিনি আরো লিখেছেন যে চলতি মহূর্তের ক্ষণিক আবেগ লিপিবদ্ধ করার কর্তব্যপরায়ণতা থেকে এখন মুক্তির সময় এসেছে; "কিন্তু আত্মজীবনের বদলে যাঁরা আজ সমাজ-জীবনের তথ্যানুগামী, ঘটনা-প্রসূত উত্তেজনার বশবর্তী হ'য়ে তাঁরা যা লিখছেন, তা

অনেক সময় হ'য়ে উঠেছে– শুধু সাহিত্য নিয়ে পরিহাস নয়, মানুষের দুঃখকেও অপমান। বিষয় হিশেবে গণজীবনকে অবলম্বন ক'রেও তাঁরা প্রকাশ করছেন সেই ক্ষণিক, ব্যক্তিগত আবেগের বুদ্বুদ... দুঃখটা কখনো কখনো এত চড়া গলায় এত বেশি ক'রে বলা যে আমাদের মনে পড়ে যার রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অ-সাহিত্যের উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত 'দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান', কিংবা এমনও মনে হয় এ যেন বাংলা সাহিত্যের একদা-খ্যাত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র শোকোচ্ছ্বাসের আধুনিক প্রকরণ।"[৪২] বুদ্ধদেবের এ বক্তব্যে খানিকটা রাবীন্দ্রিক সুর আছে। কল্লোলযুগের 'আধুনিক' সাহিত্যের কিছু নিদর্শন নিয়ে রবীন্দ্রনাথও ভাবিত ছিলেন, 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (১৩৩৪) প্রভৃতি প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের তিরস্কারের লক্ষ্য ছিল সমকালের সাহিত্যিক বিকৃতি। তৎকালীন আধুনিকদের সাথে সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার উদ্দোশ্য জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে আহুত সভায় (৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই যার একমাত্র গৌরব, তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।...
>
> সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এর জন্য মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ, ক্লান্তি, রোগ, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ দেখা দেয়– তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ সমস্তই সে আবার কাটিয়ে দেয়, কিন্তু দূর থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী, যেহেতু এটা আধুনিক।[৪৩]

বুদ্ধদেব বসুর ভাবমূর্তি আধুনিকবাদী নন্দন ভাবনার স্থপতি হিসেবেই বেশি উজ্জ্বল। নবদীক্ষিত আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতা তাঁর নিজের যেমন ছিল, তেমনি সমকালে এ আন্দোলনকে সমর্থন ও স্বীকৃতি তিনি জোরালোভাবেই দিয়েছেন। 'আধুনিকবাদী' শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ পূর্বাপর একইরকম থাকেনি তা উল্লেখিত হয়েছে। সাহিত্যে শ্রী, পরিমিতির অভাব অপরিপক্ক আতিশয্য ও আরো নানা দুর্বলতাকে রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবও সমর্থন করতে পারেননি। এ দিক থেকে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'চাই– আনন্দের সাহিত্য' (১৯৫১)। এতে তিনি লিখেছেন :

> কোনো-এক অর্থে এই বিশিষ্টরকম আধুনিক সাহিত্য তার কল্পিত মানুষের মতোই ফাঁপা, তাতে চিত্রিত বন্ধ্যা জমির মতোই নির্বীজ, তাতে বর্ণিত জীবনের মতোই হতাশাচ্ছন্ন। অর্থাৎ এই সাহিত্যের তাৎপর্য নঞর্থক, এর বাণী বলতে প্রকাণ্ড একটা 'না' ভিন্ন কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায়না– শুধু নৈরাশ্য, শুধু বিতৃষ্ণা, মানুষের মূঢ়তার 'Savage indignation' নয়, মানুষের পতন-প্রবণতার এক ফোঁটা করুণাও নয়– শুধু প্রত্যাখ্যান, তিক্ততা, নয়তো বাঁকা ঠোঁটে দুর্বলের ব্যঙ্গ, আর নয়তো কোনো অন্ধ বিশ্বাসের পায়ে নিশ্চিন্ত, অসহায়

> আত্মসমর্পণ। আধুনিক জীবনের ব্যর্থতার ছবি আঁকতে গিয়ে সেই ব্যর্থতারই মৌতাতে মেতে উঠলেন লেখকেরা– সেটাকেই ঘিরে ঘিরে ঘুরছেন, ঘুরতেই ভালো লাগছে, যাঁর বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযান, সেটাই যেন গ্রাস করে রেখেছে তাঁদের। কিছুতেই বেরোতে পারছেন না সেই আবর্ত থেকে, নিজের 'উদগীর্ণ জালে নিজেরাই আটকে আছেন মাকড়সার মতো।'[৪৪]

এ প্রবন্ধেই তিনি আরো জানাচ্ছেন যে জীবনে boredom ও horror নিশ্চয়ই আছে এবং এটা অপূর্ণ কোনো আবিষ্কারও নয় কিন্তু এই 'boredom'এর কবিদের রচনা পড়তে পড়তে "এ সন্দেহ আমরা কিছুতেই ঠেকাতে পারি না যে তাঁরা নিজেরাই সীমাহীনরূপে ক্লান্ত, এবং যে-সব কথাশিল্পী আধুনিক সমাজের আতঙ্ক ভরা কুশ্রীতা দৃশ্যের পর দৃশ্যে এঁকে চলেছেন, তাঁদের মনে হয় সেই আতঙ্কের মধ্যে আবদ্ধ, তার পরপারে কোনো স্বর্গের সন্ধান তাঁদের কাছে মেলে না, কিংবা যদি বা মেলে– সেটাও মানবিকতার দিক থেকে, মানুষের জীবনের দিক থেকে– ভুল স্বর্গ, অলীক, আত্মপ্রতারক কল্পনা। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে ব্যাধির বিশ্লেষণ করতে করতে ব্যাধির প্রেমেই পড়ে গেছেন এঁরা, চিকিৎসার অন্বেষণের বদলে মড়কের গলা ধরে আঁকড়ে আছেন।"[৪৫] এভাবে নৈরাশ্য-হতাশার বিপরীতে ইতিবাচক জীবনার্থ প্রকাশের দায় স্বীকার করে বুদ্ধদেব বলেন বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে সাহিত্যের গতি হবে 'সরলতার, স্বীকৃতির ও সদর্থক অঙ্গীকারের দিকে', পরপরই আবার বলেন, অন্তত 'তা কোনো কাল্পনিক স্বর্গলাভের আশায় রাষ্ট্র কিংবা মন্দিরের যুগে আত্মবলির পরামর্শ দেবে না, মানুষের কানে হয়তো বা সবচেয়ে দুঃসাহসী কথাটি উচ্চারণ করবে, বাঁচো ভালবাসো, হও। ১৯৫১ সালে বুদ্ধদেবের এই বক্তব্য একেবারে আকস্মিক নয়, ১৯৪৭-এর এক কবিতা-সম্পাদকীয়তে (চৈত্র ১৩৫৪) তিনি একই রকম ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন যে, সাহিত্য অব্যতীতরূপে ভালোকে লক্ষ্য করে, সুখ-দুঃখ-ব্যঙ্গ-বিষন্নতা, যে কোনো উপায়েই হোক, সাহিত্য চিত্তশুদ্ধিরই জনক, চিত্তশুদ্ধির গভীরতার অনুপাতেই সাহিত্যের স্তরভেদ। "আর যেখানে চিত্তশুদ্ধি একেবারেই নেই, পক্ষান্তরে যা বিষাক্ততার বীজানু-ভাণ্ডার, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই সাহিত্যের শিল্পলোক অতিক্রম করে চলে এসেছি কোনো দল-পাকানো চক্রান্তে, কোনো সেপাই-বানানো আপিশে, কিংবা একেবারে রণক্ষেত্রে।" সাহিত্যের কাছে বুদ্ধদেবের দাবি এই যে, তা উপলব্ধি করাবে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ঐক্য, বিশ্বসত্তার সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র, খণ্ডীকৃত, আত্ম-সীমান্ত জীবনের ঐক্য, মানবিক বিশ্বের সঙ্গে, আবার প্রাকৃতিক বিশ্বের সঙ্গেও; আর এ-দাবি সাহিত্য মেটাতে পারে না, যদি-না তার নিজের মধ্যেই থাকে বিশ্বব্যাপ্তির অসীমতা, কালাতিক্রমী অমৃত।[৪৬] জীবনের গভীর অথচ সহজ সুন্দর অভিব্যক্তিই সাহিত্যের এ মত প্রকাশ করে বুদ্ধদেব বলেন, "বিষয় যা-ই হোক, উপায় যা-ই হোক, মানুষের কাছে সাহিত্যের শেষ কথা এই; 'ভালো হও, ভালোবাসো।' বুদ্ধদেব এভাবেই প্রতীচ্যের আধুনিকতাবাদী

শিল্প-ভাবনার রুগ্নতা ও তার ক্রমবর্ধমান সংক্রাম এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। তাঁর নিজস্ব আধুনিকতার ধারণার সাথে তাঁর সহযাত্রী-অনুগামীদের অমিলও এভাবেই রচিত হয়েছে।এ যেন তাঁর 'আত্মতা ও অহংনির্ভর এক কলাকৈবল্যবাদ' যা কোনো পরিসর পায় নি বাংলা আধুনিক কবিতায়।[৪৭]

খ.

সাহিত্য বিচারে বুদ্ধদেব বসু স্পষ্টত কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন কী-না তা বোঝা যায় না। তবে সাহিত্য সমালোচনার রীতি বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল। তাঁর সাহিত্যচিন্তার বিশেষ যে দিকগুলো রয়েছে, তা থেকেই আসলে সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মতাদর্শকে চিনে নেয়া যায়। সমালোচনা-সাহিত্যকে পরিণত করতে তিনি দৃঢ়সংকল্প থেকেছেন, কখনও কখনও স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হলেও তাঁর সাহিত্যাদর্শ নির্দ্বিধ দেখা যায়; সেই সাথে তাঁর সমালোচকসত্তাকেও তিনি সুসংহত করতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস প্রবাহ থেকে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করেন নি। জীবনকে সাহিত্যেরই বৃহৎ আধার মনে করেছেন তিনি, আর তাই সাহিত্যসমালোচনাও হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পকর্মের অঙ্গীভূত গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ। সাহিত্য সমালোচনার গুরুত্ব নিয়ে সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই অর্থাৎ 'প্রগতি' পর্ব (১৩৩৪) থেকেই বুদ্ধদেব ভাবিত ছিলেন। 'প্রগতি'র প্রথম বছরের (আষাঢ় ১৩৩৪ জৈষ্ঠ ১৩৩৫) এগারো মাসের সংখ্যাতেই 'মাসিকী' শীর্ষক সমালোচনাবিভাগ উপস্থিত।[৪৮] এ পত্রিকার প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যার 'মাসিকী' থেকেই বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা ভাবনা লক্ষনীয়। সদ্য গড়ে ওঠা বিশিষ্ট তরুণ সাহিত্য সম্পর্কে যুগধর্মে অবিশ্বাসী নিন্দুকদের সাহিত্যসমালোচনার অধিকার নিয়ে আস্থাবান নন তিনি। তরুণ সাহিত্যের যে একটা যথার্থ অস্তিত্ব আছে, তার ভঙ্গি বিভিন্ন, তার সুর নতুন, তার আদর্শ স্বতন্ত্র এবং তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করতে না পারলেও তার মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন বর্তমান একথার সাথে সাথে তিনি গুরুত্বের সাথে একথাও জানিয়ে দেন যে আধুনিক সাহিত্যের বিচারে এর আড়ালে থাকা নবজাগরণের অনুভূতি বা নতুন সাহিত্যিক যুগোন্মেষের আভাস গণনা করা প্রয়োজন। যেকোনো সাহিত্য আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্য যে উপেক্ষনীয় নয়, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন; তিনি যখন লেখেন, 'কোনো কাঁচা লেখাও কোনো বিশেষ মুহূর্তে সবীজ হতে পারে, খুব উঁচু করে নতুনের নিশেন উড়িয়ে দেবারও প্রয়োজন ঘটে কখনো'[৫০]– তখন বোঝা যায় নতুন মানেই তিনি তাকে স্বয়ম্ভু ভাবেননি, কালান্তরে তার প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন কিংবা প্রকৃতিগত ভাবান্তর ঘটতে পারে; আর তা স্বীকার করে নেওয়াই নতুনকে সবীজ করে তোলা ও বিচারক মনের সজীবতার লক্ষণ। 'প্রগতির' ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায় সমকালীন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অপরিপক্কতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন বুদ্ধদেব। সমকালীন সাহিত্যিক পরিবেশে কিংবা কোনো কোনো শিল্পকর্ম নিয়ে সমালোচকের মনের বদ্ধমূল সংস্কারের ভিত্তিতে হওয়া সাহিত্যিক বাদানুবাদ লক্ষ করে তখন বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল যে বিজ্ঞানসম্মত নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনার পরিবেশ বাংলা সাহিত্যে থাকা প্রয়োজন :

> আমরা প্রায়ই মুখের কথায় বলি, 'বইখানা বেশ লাগল'- কিন্তু কেন যে বেশ লাগল, কোথায় যে তার 'বেশ'-ত্ব, এ-কথা জিজ্ঞেস করলে আমরা অনেকেই হয়-তো কোনো উত্তর দিতে পারব না। সেই 'কেন'র উত্তর দিতে পারাই যথার্থ সমালোচকের লক্ষণ। উঁচুদরের সমালোচকের পক্ষে নিছক রস-বোধই যথেষ্ট নয়, তাঁর কাজ অনেকটা বৈজ্ঞানিকের কাজের মত। বিশ্লেষণের অনুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে তাঁকে খুঁটিয়ে-নাটিয়ে সবকিছু বার করতে হবে- কোন্ কোন্ চিন্তার বীজানু তার মধ্যে প্রচুর, কোন্ কোন্ প্রভাবের হাওয়া লেখকের মনে দোলা দিয়েছে– তারপর সব মিলিয়ে একটা বিরাট, সর্বব্যাপী উপলব্ধি এবং ভাষায় তার যথাযোগ্য প্রকাশ– এই হল গিয়ে সমালোচনা।[৫১]

বক্তব্যে কিছুটা স্ববিরোধিতা থাকলেও বাংলা সমালোচনার ইতিহাসে তথা কালের নিরিখে বুদ্ধদেবীয় এই মতাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলা সমালোচনার গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সমালোচনার গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যেরাও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন, তবুও বিশ শতকেও অন্তত মধ্য পর্ব পর্যন্ত নানা ভ্রান্তি, অস্পষ্টতা, গতানুগতিকতা, অপূর্ণতা ছিল। সমালোচনা সাহিত্যের আবশ্যকতা নিয়ে উপরিউক্ত মন্তব্য ছাড়াও বুদ্ধদেবের আরো কিছু বিচারিক মানদণ্ড ছিল, যা একজন নিষ্ঠ সমালোচকের দায়বদ্ধতাকে পরিস্ফূট করে। 'প্রগতি'র এই ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যাতেই তাঁর মূল্যবান আরো বক্তব্য হল :

> আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য সব দিকেই একটি নতুন ভাবের উদ্দীপনা দিয়ে গড়ে উঠছে– এ কথা যার চোখ কান আছে, সে-ই মানতে বাধ্য হবে। তাই একটি সুন্দর, সুষ্ঠু সমালোচনা-সাহিত্য গঠনের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছে। কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের মত সমালোচনাও যে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর্ট এবং তা আয়ত্ত করতে হলেও যে প্রচুর বিদ্যাবত্তার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ম মনীষা ও সংযম দরকার, এ কথা আজকাল যে অল্প ক'জন উপলব্ধি করেছেন, আশা করি তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালী সমালোচনা সাহিত্যের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন।[৫২]

শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য পাঠকের চোখে ধরিয়ে দেয়া বা পাঠককে এর রস-আস্বাদনে সাহায্য করার নামই সমালোচনা[৫৩]– 'প্রগতি' পর্বে সমালোচক স্বভাব বা তার কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত এমন বক্তব্যই দিয়েছেন বুদ্ধদেব। তবে সাথে এও বলেছেন যে, কোনো রচনা 'কত ভালো' তা লিখলেই নিস্তার

নেই; কেন ভালো, তা-ও বলতে হবে ... (কারণ) সমালোচনা তীক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, নিরপেক্ষ বিবেচনা শক্তি এবং সুস্থ ও উদার রুচির ফল। ... রুচির উদারতা ও সর্বত্র গুণ গ্রহণ ক্ষমতা না থাকলে উঁচুদরের সমালোচক হওয়া যায় না।[৫৪] সাহিত্যে রস ব্যাপারটা বিমূর্ত ধরে নিয়ে সমালোচক বিচারকে সাহিত্য করে তুলবেন অর্থাৎ বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করে রসপ্রমাতা হিসেবে অবিরাম আত্মপ্রকাশ করে যাবেন না-কি ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক যুক্তিপন্থাও অবলম্বন করবেন– সেটা সমালোচনাতত্ত্বের ইতিহাসে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিদ্যমান; আর এ প্রক্রিয়া কালান্তরে বিচারিক মানদণ্ডের বৈচিত্র্যময় গোত্রভেদেরও জন্ম দিয়েছে তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু এ প্রক্রিয়ার দুটোই চান তা তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যে প্রাথমিকভাবে ব্যক্ত। স্মর্তব্য যে, 'প্রগতি'র পরেও বুদ্ধদেব বসুর নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা ও সমালোচনা ভাবনা কিংবা সমালোচক সত্তা নানা বিষয়কে আধার করে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। 'প্রগতি' পর্বের পরে কেবল কবিতা অর্থাৎ একটি শিল্পমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট করে তোলার গরজে সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা সমকালে নব্য সাহিত্যিকদের কীভাবে এগিয়ে নিয়েছে তা বলা হয়েছে। এই প্রত্রিকার পৌষ ১৩৪২ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'প্রগতি' ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের মতাদর্শের অনুরণন পাওয়া যায়, সমালোচক হিসেবে তাঁর অনেকান্তিক প্রচেষ্টা ও বৃহৎ পরিধির বিবর্ধন সত্ত্বেও তিনি নিজে বিচার বলতে কী বোঝেন, তা স্পষ্ট করে বলে দেন :

> এখনো আমি সাহিত্য বিচার করি আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে, এবং ঈশ্বর যদি সহায় হন, বাকি জীবন তাই করবো।[৫৫]

১৯৪৫-এ 'কালের পুতুল' প্রবন্ধে (*কালের পুতুল*) সমালোচনা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সমালোচনার নিরপেক্ষতা-পক্ষপাত লেখকের প্রশংসা নিন্দা, সমালোচনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, সমালোচ্য বিষয়ে প্রকাশিত মতের স্থিরত্ব, সমালোচনাকে সাহিত্য করে তোলা প্রভৃতি বিষয়ে এ প্রবন্ধে লিখেছেন তিনি। প্রথমত, সমালোচনার বিজ্ঞান না শিল্প এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষত 'আধুনিক' যুগ-পর্বে পূর্বাপর থেকে গেছে। বুদ্ধদেব বসু দু'য়ের তাত্ত্বিক পার্থক্য বিষয়ে বলেন, 'যাকে exact science বলে সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত, এখানে সবাই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সবই মোটামুটির কথা।' যেমন–'কবিতা কী, এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না- কিন্তু অনেকগুলি উত্তর পাশাপাশি সাজালে হয়তো সবগুলিতেই সত্যের আভাস পাওয়া যাবে। সত্যের আভাস এখানে যথেষ্ট দুটি বিপরীত কথা

একই সঙ্গে সত্য বলে গ্রহণ করতে আমাদের বাধে না। বিজ্ঞানের জগতে যা অসম্ভব। [৫৬] অর্থাৎ যুক্তির স্থিরত্ব, মীমাংসীত নিদ্বান্দিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি হল বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধদেবের মতে, সাহিত্য কিংবা এর পাঠ এক ধরনের চলিষ্ণু প্রক্রিয়া, যেখানে আবেগের কম্পন আছে, বিরোধিতা আপেক্ষিকতা ইত্যাদি আছে। সুতরাং বিচার কিংবা সমালোচনায় ব্যক্ত হওয়া মতের ভঙ্গুরতা, চঞ্চলতা অর্থাৎ বৈচিত্র্য থাকতে পারে, একই সমালোচ্য বস্তুর প্রতি গৃহিত সিদ্ধান্ত কালের বিবর্তনে প্রত্যাখাত হতে পারে। বিজ্ঞানের মতো সুনির্দিষ্ট নীতি রীতির প্রবর্তনা করে সমালোচনাকে একটি সুবিন্যস্ত বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে টেনে আনা ভুল বুদ্ধদেব এটাই মনে করেন। সমালোচনার নৈব্যক্তিকতা বা নিন্দা পক্ষপাত বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। সমালোচক কোন সৃষ্টিকে মন্দ বললে তা সব সময়ই সত্য এবং ইতিবাচক বিচার ভ্রান্ত তা তিনি মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে সমালোচনার এক ধরনের ভ্রান্ত সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন তিনি :

> সমালোচনা বলতে আমি বুঝি উম্মীলন, সাহিত্যের বড়ো একটা পটভুমিকায় আলোচ্যকে আলোকিত ক'রে এবং নিজের উৎসুক চিত্তকে প্রকাশ কওে পাঠকের উদাসীন মনকে জাগ্রত করেন সমালোচক। এ কাজে উত্তাপ চাই, উৎসাহ চাই, নিন্দার ঠাণ্ডা সংকীর্ণতা দিয়ে তা সাধিত হতে পারে না। [৫৭]

এই সূত্রেই বুদ্ধদেব অনুভব করেন মতামতের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলার তাগিদ। বিচারকে রসাত্মক এবং সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ। করতে পারলে 'সুবিধা এই যে, পরবর্তী যুগে মতামতগুলি সর্বাংশে গ্রাহ্য যদি নাও হয়, সাহিত্য রসের প্রলোভনেই পাঠক সেখানে আকর্ষিত হবে'। ...সাহিত্যের ইতিহাসে যেসব সমালোচনা অমর হয়েছে তাতে যে সব সময়েই একেবারে নির্ভুল মতামত ছিল তা নয়, ছিলো সেই পরিমাণে। রচনার সুষ্ঠুতা যাতে তারা সাহিত্যের গৌরব বলে স্বীকৃত হতে পেরেছে। যেহেতু সমালোচনায় ভাষায় লেখা হয়, পরিভাষায় নয়, অতএব সমালোচকের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভাষাশিল্পী হওয়া ।[৫৮] সমালোচকের এই ভাষাশিল্পী হবার প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধদেবের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সমালোচক হিসেবে তিনি নিজে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর আরো ধারণা :

> সমালোচনার আর একটা দিক আছে সেটা সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা সাহিত্যের মূল সূত্র উদঘাটন করা, এবং প্রসঙ্গত ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের উপস্থিত করা। এ কাজ যাঁরাই করেছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে স্বীকৃত।[৫৯]

এছাড়া বুদ্ধদেবের মতে, সমালোচনা ভালো মন্দ বাছাই করতেও শেখায় আর 'সে শিক্ষা যত বেশী লোক যত ভালো করে নিতে পারবে, ততই সাহিত্যে মন্দ কমে গিয়ে ভালোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। সমালোচনার একটি সুদৃঢ় উজ্জ্বল আদর্শ পরিণত সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ।' আর মতভেদ তর্ক কিংবা পরিবর্তনের বিক্ষেপ সত্ত্বেও 'মানুষের মনে মিলনের' যে ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রেই সমালোচনা নিজেকে প্রয়োগ করে, তার পটভূমিকা চিরন্তন, বুদ্ধদেবের মতে, সে কারণেই সে সার্থক ও শ্রদ্ধেয়। বুদ্ধদেবের সাহিত্যচিন্তার যে অংশটি তাঁর সমালোচনা ভাবনার নিয়ন্তা, সে মতাদর্শের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা ভাবনায় মেলে। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন 'সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলার পক্ষপাতী।[৬১] সাহিত্য থেকে পভীরতম আনন্দ শোষণ করে তা স্পষ্ট ও দৃঢ়স্বরে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা সৎ ও আন্তরিক সমালোচকের কাজ একথাই বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন। অনুশীলনলব্ধ বা বিধিসম্মত সমালোচনার প্রক্রিয়ার গুরুত্ব তাঁর কাছে যতটা তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় তিনি ভেবেছেন সমালোচকের রসসাহিত্যিক সত্তাকে। সমালোচনা তাই তাঁর কাছে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মতই স্বতঃস্ফুর্ত।

বস্তুত 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ', 'দেশ', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'অলকা', 'অমৃত', 'বেতার জগৎ', 'Thought', 'Two Cites' প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে এবং বিশেষ করে বুদ্ধদেবের নিজেরই সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অসংখ্য সমালোচনা প্রবন্ধ যার অনেকগুলোই গ্রন্থভুক্ত হয়নি। তবে গ্রন্থভুক্ত সমালোচনা থেকেই বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য সমালোচনার বিষয় বৈচিত্র্য এবং মূল্যায়নের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব। তাঁর গ্রন্থ ও গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হল :

ক. কালের পুতুল (১৯৪৬) :

১. প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য ২. প্রমথ চৌধুরী ৩. কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ. ৪. জীবনানন্দ দাশ: 'ধুসর পাণ্ডুলিপি' ৫. জীবনানন্দ দাশ : 'বনলতা সেন' ৬. জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে ৭. সমর সেন: 'কয়েকটি কবিতা' ৮. সুবীন্দ্রনাথ দত্ত: 'অর্কেস্ট্রা' ৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'ক্রন্দসী' ১০. বিষ্ণু দে : 'চোরাবালি' ১১. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'পদাতিক' ১২. অমিয় চক্রবর্তী : 'খসড়া' ১৩. অমিয় চক্রবর্তী : 'এক মুঠো' ১৪. অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল ১৫. নিশিকান্ত : 'অলকানন্দা' ১৬. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'নূতনা রাধা' ১৭. অন্নদাশঙ্কর রায় : পুনশ্চ ১৮. দু-জন মৃত তরুণ কবি ১৯. নজরুল ইসলাম ২০. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২১.'কালের পুতুল' ২২. 'কবিতা'র কুড়ি বছর।

খ. সাহিত্যচর্চা (১৯৫৪)

১. রামায়ণ ২. মাইকেল ৩. বাংলা শিশু সাহিত্য, ৪. বাংলা ছন্দ ৫. রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক ৬. রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা।

গ. রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য (১৯৫৫)

১. অবতরণিকা ২. কাহিনী ও রচনা ৩. 'গল্পগুচ্ছ' ৪. 'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি, ৫. 'গোরা' ৬. 'চতুরঙ্গ' ও ' ঘরে-বাইরে' ৭. 'শেষের কবিতা' ৮. 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' ৯. 'চার অধ্যায়' ১০ ' চোখের বালি' ১১. 'শেষের কবিতা' ও অমিত রায়।

ঘ. স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭):

১. ইংরেজী সাহিত্য ও আমরা ২. বিশ্বসাহিত্য ৩. সাহিত্যপত্র ৪. চার্লস চ্যাপলিন ৫. টোমাস মান ৬. এক গ্রীষ্মে দুই কবি ৭. কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৮. মানিক বন্দোপাধ্যায়

ঙ. সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩)

১. আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি ২. বরিস পাস্টেরনাক ৩. পাস্টেরনাক প্রসঙ্গে ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি ৬. রাজশেখর বসু ৭. শিশিরকুমার ভাদুরী ৮. রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প ৯. রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য ১০. রবীন্দ্রনাথের ও প্রতীচী ১১. দুই রবীন্দ্রনাথ : আসলে এক ১২. বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী ১৩. রবীন্দ্রনাথের উপমা ১৪. রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজচিন্তা ১৫. রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি।

চ. কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬):

১. কবিতার সাত সিঁড়ি ২. কান্তা ও কবিতা ৩. দেবতা ও বধূ ৪. এপার-ওপার ৫. ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ

অনুদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের 'ভূমিকা' :

ক. *আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৫৪) : ভূমিকা

খ. *কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭)* : সংস্কৃত কবিতা ও 'মেঘদূত'

গ. *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (১৯৬১)* : শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

ঘ. *হ্যেল্ডার্লিন এর কবিতা (১৯৬৭)* : ফ্রীডরিশ হ্যেল্ডার্লিন : তাঁর জীবন ও কবিতা

ঙ. *রাইনার মারিয়া রিলকে-র কবিতা (১৯৭০)* : রাইনার মারিয়া রিলকে : তাঁর কবিতা ও তাঁর জীবন।

এছাড়া বুদ্ধদেব বসুর *An Acre of Green Grass (1948)* এবং *Tagore : Portrait of A Poet (1962)* গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন।

তথ্য-নির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

১ দ্রষ্টব্য, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'সমালোচনা-সাহিত্য', *সাহিত্য-প্রকরণ*, প্র. প্র. ১৪০২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩১৫

২ সমালোচনা সম্পর্কে এ উক্তিটি করেছেন ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রাঁন্স (Anatole France, ১৮৪৪-১৯২৪)। উদ্ধৃত, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-প্রকরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

৩ দ্রষ্টব্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমালোচনার কথা*, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৫, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ১২

৪ সূত্রঃ J.W.H. Atkins, (১৮৭৪-১৯৫১) *English Literary Cri*ticism (in three volumes) এবং Rene Wellek (১৯০৩-১৯৯৫) *A History of Modern Criticism* (in four volumes) উদ্ধৃত, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-প্রকরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

৫ Technique as Discovery (১৯৪৮) প্রবন্ধে মার্ক শোরের (১৯০৮-১৯৭৭) প্রকরণবাদের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে লিখেছেন যে, আধুনিক সমালোচনা আমাদের বুঝিয়েছে, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করলেই সাহিত্য-পাঠ বা শিল্প-আলোচনা করা হয় না। কারণ বিষয়বস্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয় মাত্র। তাকেই প্রকৃত সমালোচনা বলতে পারি শুধুমাত্র যখন æWe speak of the achieved content, the form, the work of art as a work of art, that we speak as critics. The difference between content of expenience, and achieved content or art, is technique' উদ্ধৃত, তপোধীর ভট্টাচার্য, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ. ১৮১

৬ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমালোচনার কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৭ নূতন গ্রন্থের সমালোচনা, *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, প্র.প্র. জুলাই ২০০৬, পৃ. ১১১৪

৮ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র. জৈষ্ঠ ১৩৮১, পৃ. ৮০

৯ সবিতা পাল, 'বঙ্কিমচন্দ্র', *বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস (আদিপর্ব)*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.প্র. ১৯৯৪, পৃ. ১৩৭-১৩৮

১০ Bankim Chandra Chatterjee, Benglai Literature, *English Writings centenary Edition*, Bangiya Sahitya Parishad, 1940

১১ সবিতা পাল, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

১২ ইংল্যান্ডর রাণী ভিক্টোরিয়ার (শাসনকাল ১৮৩৭-১৯০১) নামানুসারে 'ভিক্টোরিয়ান এইজ' বা 'ক্রিটিসিজম' বলা হয়। উক্ত সময় পর্বের অন্তিম পর্ব ১৮৮০-১৯০০ এই দশ বছর ধরা হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য সমালোচক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক হলেন ওয়াল্টার পেটার (১৮৩৯-১৮৯৪), আইরিশ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড

(১৮৫৪-১৯০০) এবং শুরুর দিকে স্কটিশ দার্শনিক প্রাবন্ধিক কার্লাইল (The French Revolution- এর লেখক, ১৭৯৫-১৮৮১), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩), ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮), জন রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০) প্রমুখ। ভিক্টোরীয় যুগে সমালোচনা মূলত দুইভাবে বিভক্ত ছিল– একটি হল যুক্তিপন্থী জন স্টুয়াট মিল সমর্থিত নৈতিক যুক্তিবাদ (Ethical Rationalism) এবং দ্বিতীয়টি ওয়াল্টার পেটার অবলম্বিত কৈবল্য শিল্পবাদ (Art for Art's sake)। দ্রষ্টব্য G.K. Chesterton, *History of English Literature (Victorian age), Combridge History of English Literature.*

১৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৪৬, পৃ. ৪৩৯, উদ্ধৃত, সবিতা পাল, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

১৪ সবিতা পাল, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

১৫ দ্রষ্টব্য, 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ, *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. যথাক্রমে ৫০৮, ৫১৩, ৫১৯

১৬ "যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'উত্তরচরিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬

১৭ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

১৮ 'উত্তরচরিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১১

১৯ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭

২০ 'কৃষ্ণচরিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮৬

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮৭

২২ দ্রষ্টব্য, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭-৫১৮

২৩ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

২৪ 'কৃষ্ণচরিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮৭

২৫ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

২৬ সবিতা পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

২৭ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড) ঐতিহ্য, ঢাকা প্র.প্র.জানুয়ারি ২০০৪ পৃ. ৫০৮

২৯-৩০ সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (চতুর্থ খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৭

৩১ সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (দ্বাদশ খণ্ড) পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৫৪

৩২ সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের পথে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১১

৩৩ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

৩৪ 'গ্রন্থ পরিচয়', সাহিত্যের পথে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১

৩৫ উদ্ধৃত, অমূল্য সরকার, *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব* , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ.১৫

৩৬ 'সাহিত্যেতত্ত্ব', সাহিত্যের পথে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৬

৩৭ প্রবন্ধটিকে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার সময় প্রবন্ধের প্রথমাংশের অনেকখানি বর্জিত হয়। উদ্ধৃত বাক্যটি বর্জিত অংশের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য, *সাহিত্যের পথের* গ্রন্থপরিচয়।

৩৮ দ্রষ্টব্য, গ্রন্থ পরিচয়, *সাহিত্যের পথে* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২

৩৯ দ্রষ্টব্য, সাহিত্যবিচার, সাহিত্যের পথে, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (দ্বাদশ খণ্ড) পূর্বোক্ত,পৃ. ৫০০

৪০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ', *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ এপ্রিল, ২০০২, কলকাতা, পৃ. ১৬৩

৪১ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৪২ 'সাহিত্য, গান, ছবি', উদ্ধৃত, সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৯৭, পৃ. ৬৪

৪৩ সুদীপ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৪৪ দ্রষ্টব্য, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সমালোচনা

৪৫ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *'রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব'*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২৫০।

৪৬ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

৪৭ ডঃ অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা* (২য় খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা-৭, নব সংস্করণ, ১৪০৬, পৃ. ৯৪

৪৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সংগ্রহের ভূমিকা (১৯৪১), প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সমগ্র (প্রথম খণ্ড), ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, তুলি-কলম, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৯৬

৪৯ প্রমথ চৌধুরী, 'সাহিত্যে খেলা', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০০২, পৃ. ৯৭

৫০ 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি', *প্রবন্ধসংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৫২ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বীরবল ও বাংলা সাহিত্য*, ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১১৭

৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৫৪ ডঃ অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা* (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৫৫ মোহিতলাল মজুমদার, কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, উদ্ধৃত, আজহার উদ্দিন খান, *বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩২

৫৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

৫৮ Buddhadeva Bose, 'Modern Bengali Prose', *An Acre of Green Grass*, Papyrus, November, 1982, p. 79

৫৯ "যদি শিল্পকর্মকেই আমি কবিতার পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করতাম তবে আমার মতে বোদলেয়ার হতেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি। রিলকে, রবীন্দ্রনাথ, য়েট্‌সের উপরে তাঁর স্থান হ'তো। কিন্তু আমি কাব্যকলার সঙ্গে

শিল্পকর্মের সমীকরণের পক্ষপাতী নই। শিল্পকর্মের পারদর্শী না-হ'লে কবি কবি হ'তে পারেন না– এই পর্যন্ত।" আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'লেখকের উত্তর' (অরুণকুমার সরকারকৃত *'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'* গ্রন্থের সমালোচনার উত্তর), *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১৭৭-১৭৮

৬০ স্বপন মজুমদার, 'আবু সয়ীদ আইয়ুবের চিন্তাজগৎ', *বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য*, (দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত) করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০০৫, পৃ. ২৬৯

৬১ দ্রষ্টব্য, জর্জ সেন্ট্সবারি, *A History of Criticism*, pp. 410-11, উদ্ধৃত, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৬২ সবিতা পাল, *বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি পর্ব)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১-২ বুদ্ধদেব বসু, 'আমার ছেলেবেলা', *বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র. মে ২০০৫, পৃ. ৮ ও ৫৭

৩ নোয়াখালি ছেড়ে তেরো বছর বয়সে (১৯২২ সালে) ঢাকা এলে বুদ্ধদেব বসু তাঁর দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র প্রভুচরণ গুহ-ঠাকুরতা এবং প্রভুচরণের পিসতুতো ভাই অজিত দত্তের (টুনু) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হন। অজিত দত্তের সাথে তিনি জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরিতে যেতেন বই পড়তে। প্রভুচরণের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তিনি পাঠ করেন হুইটম্যানের কবিতা, পাশ্চাত্য উপন্যাস এবং ট্রটস্কিবাদের মুখপত্র 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকা। তাঁর মাধ্যমেই বুদ্ধদেব সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ার সুযোগ পান। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণ "পুরো পাশ্চাত্য জগৎ, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, সেখানকার শিল্প-সাহিত্য জীবন-যাত্রা, প্রাণবন্ত ভূগোল, আমার চোখে না-দেখা কিন্তু মনের মধ্যে বাস্তব-হ'য়ে ওঠা কত নদী নগর, নর-নারী– এই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন প্রভুচরণ। দ্রষ্টব্য, 'আমার ছেলেবেলা', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (প্রথম খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৪ 'আমার ছেলেবেলা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৫ 'আমার যৌবন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৮ মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১,পৃ. ১৩

৯ 'আমার ছেলেবেলা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-২১

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২

১১ 'পুরানা পল্টন', হঠাৎ আলোর ঝলকানি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

১২ দময়ন্তী বসু সিং, 'বুদ্ধদেব বসু : তাঁর চেতনায় বিশ্ববোধ ও আন্তর্জাতিকতা', *বুদ্ধদেব বসু / কাল থেকে কালান্তরে* (বেলা দাস সম্পাদিত) পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৮

১৩ দ্রষ্টব্য, 'আমার ছেলেবেলা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১৪ দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ১০১

১৫ 'সব পেয়েছির দেশে', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র (*দ্বিতীয় খণ্ড*)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

১৬ বুদ্ধদেব বসু 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম', দ্রষ্টব্য: মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *স্পেনের গৃহযুদ্ধ: পঞ্চাশ বছর পরে*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৪

১৭ *বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য, 'কবিতা' থেকে* (প্রথম খণ্ড/সম্পাদকীয় ও সমালোচনা), (দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত) বিকল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৪৪

১৮-১৯ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর, উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, বিকল্প, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৫২

২০ 'আমি বলতে চাই যে শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য; কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ ক'রে সেই মতের নৈষ্ঠিকতা বাঁচিয়ে চলা– এটা তাঁর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্য সমস্ত চিন্তার ধারা বর্জন ক'রে তিনি যদি একান্তভাবে একটি মাত্র মতবাদেই দীক্ষা তাঁর নেন– সে-মতবাদের নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক না– তাহ'লে তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হবার, ব্যাক্তিত্ব সংকুচিত হবার আশঙ্কা থাকে'। বুদ্ধদেব বসু, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', *সাহিত্যচর্চা*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪৪

২১ সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

২২ বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৯১

২৩ 'আমাদের কবিতাভবন', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

২৪ ''তাহলে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে সংকীর্ণ আলো চক্রে মগ্ন হও ... '', বুদ্ধদেব বসু, 'আমাদের কবিতাভবন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

২৫ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতার শত্রু ও মিত্র', এম.সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রা.লি. কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭৪, পৃ.৩৬

২৬ নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি। উদ্ধৃত, অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৩৮৬, পৃ. ১৯৬

২৭ শিল্পীর স্বাধীনতা, *সাহিত্যচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

২৮ দ্রষ্টব্য, 'কিসের জন্য আর্ট', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

২৯ সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯

৩০ 'কিসের জন্য আট', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

৩১ 'কবিতার শত্রু ও মিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৩২ 'শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা', অনুবাদ, ভূমিকা, টীকা: বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ৯

৩৩ বেগম আকতার কামাল, বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতার শত্রু ও মিত্র: একটি খোলা চিঠি'র উত্তর, 'উত্তরাধিকার', বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ১৯৪

৩৪ বুদ্ধদেব বসু, 'কবি ও তাঁর সমাজ', কবিতা ১৩৪৪-৪৫, উদ্ধৃত, ড. আশা দত্ত, *বঙ্গসাহিত্যে*

সাহিত্যচিন্তার ধারা, গ্রন্থালয় প্রা. লি. কলকাতা ১৯৯৭, পৃ. ২৫৫

৩৫ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতার শত্রু ও মিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৩৬ 'Art for art's sake', *Literary Criticism : A short History* by Wimsatt and Brooks, P 494-495, উদ্ধৃত, ড. আশা দত্ত, *বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

৩৭ ড. আশা দত্ত, *বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

৩৮ উদ্ধৃত, বেগম আকতার কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫

৩৯ কল্লোল পত্রিকার সময়কালীন আধুনিক লেখকেদের অনেকেরই আদর্শ ছিল কন্টিনেন্টাল বাস্তব সাহিত্য। বিদেশী সাহিত্যের নজীরে সমাজবাস্তবতাকে স্বীকার করে তাঁরা বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যদিও ইউরোপীয় সাহিত্যের realism বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা; জীবনদর্শন-জাত সমালোচনার প্রেরণা সর্বোপরি শিল্পনৈপূণ্যের অভাব ছিল। সাহিত্যের বিষয়বস্তুর সীমানা এর ফলে অনেকটা সম্প্রসারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু খুব কম সাহিত্যিকই নব সৃষ্টি নিয়ে সত্যিকারের সফল হয়েছিলেন। সমকালে এ নিয়ে আধুনিকতার সমর্থক, বিরুদ্ধবাদী আন্দোলনের হোতা ইত্যাদি সবরকম মতবাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা সাহিত্যিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সজনীকান্ত দাশ দাবি করেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকেও এ বিতর্কে আসতে ব্যাকুল পত্র-আবেদন করেন এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে (আষাঢ়, ১৩৩৪) আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। 'বিচিত্রা'য় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে সাহিত্যিক মহলে প্রবল আলোড়ন ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দ্রষ্টব্য, ড. আশা দত্ত, *বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪-২৩০

৪০ ড. আশা দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯

৪১ "কিন্তু কেন নবীনদের রচনা আজকাল মাত্র সামান্যতম ভালো হচ্ছে? কিংবা ভালোই হচ্ছে না?... বাংলাদেশে কবিত্বশক্তির যে-একটি ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরে প্রবহমান, তা কি হঠাৎ শেষ হয়ে গেলো? এই বিশ শতকের মধ্য ভাগে নিঃস্ব হ'লো প্রেরণা? রিক্ত হ'লো ভাষা?

... যথার্থ অসাধারণত্ব সব সময় সম্ভবই নয়, কিন্তু সব সময়ই সাহিত্যের স্রোত ব'য়ে চলে– আর সব লেখা যার সার্থকতা শুধু সাহিত্যের সচলতা রক্ষায়– তাও ভালো হয়, দীপ্তিশীল হয়, কখনো কখনো স্থায়ীও হয় যে অন্তর্লীন শক্তির প্রেরণায়, তাকেই বলে ঐতিহ্য, বলে আদর্শ। বর্তমানে সেই আদর্শ দেশত্যাগী ব'লেই বাংলা কবিতার অধঃপাত ঘটেছে– শুধু কবিতার কেন, সমস্ত সাহিত্যের।" বুদ্ধদেব বসু, কবিতা-সম্পাদকীয়, আশ্বিন ১৩৫৩, *বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য 'কবিতা' থেকে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

৪২ বুদ্ধদেব বসু, 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য', *সাহিত্যচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০

৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যরূপ', সাহিত্যের পথে, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা ২০০৪, পৃ. ৫৪০-৪১-৪২

৪৪ উদ্ধৃত, তপোধীর ভট্টাচার্য, 'অন্য বুদ্ধদেব', *বুদ্ধদেব বসু/ কাল থেকে কালান্তরে* (বেলা দাস সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৪৬ দ্রষ্টব্য, *বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য 'কবিতা' থেকে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৪৭ খোন্দকার আশরাফ হোসেন, 'আত্মতার বন্দীই মূলত', *উত্তরাধিকার*, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৪৮ দ্রষ্টব্য, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩–৫৬।

৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য, আমার যৌবন, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮–৭৯–৮০।

৫১ উদ্ধৃত, শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসমালোচক বুদ্ধদেব বসু : প্রাক্-কবিতা পর্ব', *জলার্ক* (মানব চক্রবর্তী সম্পাদিত), ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা ২০০৮, পৃ. ২০৫–২০৬।

৫২ উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯।

৫৩-৫৪ উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০–২৩১।

৫৫ উদ্ধৃত, সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২।

৫৬ বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা, নিউ এজ তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৭, পৃ. ১৪০।

৫৭ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।

৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

৫৯ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা', আষাঢ় ১৩৫০, উদ্ধৃত, অরুণকুমার সরকার, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ', *কলকাতা* (জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত), ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারি ১৯৬৯, দশম ও একাদশ সংকলন (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), পুনঃপ্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা ২০০২, পৃ. ১০৩।

৬০ বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭–১৩৮।

৬১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য বিচার', সাহিত্যের স্বরূপ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক.

রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও রবীন্দ্রানুরাগ– এই বৈপরীত্যের সহাবস্থানেই বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রচর্চার পরিচয়– প্রায় সকল সমালোচকের এই-ই মত। তিনি রবীন্দ্র-বিরোধী কিংবা অতি-রাবীন্দ্রিক উভয় মতকেই পক্ষপাতদুষ্ট মনে করেন কেউ কেউ। বুদ্ধদেব সমকালীন কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-সমালোচনায় সবচেয়ে সরব ছিলেন। রবীন্দ্র-বন্দনাও পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় হয়ে উঠেছে এক যুক্তিপূর্ণ অনুশীলন। আপন পথ নির্মাণের নিয়ত চেষ্টায় অগ্রজ কবি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বে গভীর অবগাহনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপন বুদ্ধদেবের মতো কবির পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।[১] জীবনীতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আঠার বছর (১৯২৬) বয়সে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন বুদ্ধদেব বসু। তবে লেখায় তাঁকে পেয়েছিলেন আরো অনেক আগেই, (১৯২১-এর মধ্যে) অর্থাৎ 'চয়নিকা' হাতে পাবার মধ্য দিয়ে। বুদ্ধদেব লিখছেন :

> সেই বই হাতে পাবার পর আমি হারিয়ে ফেললাম হেম নবীন মধুসূদনকে, এর আগে যত বয়স্কপাঠ্য বাংলা কবিতা আমি পড়েছিলাম, তার অধিকাংশ আমার মন থেকে ঝরে পড়ে গেল।[২]

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বুদ্ধদেবের ভাষায় ''উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তি ভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে পদে; তাছাড়া তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) আলো-কে কালো বলে প্রমাণ করার জন্য দেশের মধ্যে সমকালে অধ্যবসায়ের অভাব ছিলো না, তবু তরুণ কবিরা অদম্য বেগে রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছেন।[৩] 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে সমকালীন পরিবেশের এই রকম মূল্যায়ন আরো আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম বা উত্তরকালে কী হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝাতে চেয়েছেন তিনি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রকম ব্যাপার কালপ্রভাবেই ঘটে থাকে এবং তার ব্যবহারগত সমাধানে বিভিন্ন কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের যে প্রয়োজন হয়; উত্তরসাধকদের রচনায় তা নিশ্চয়ই ছিল, এমনকি বুদ্ধদেবেরও।

রবীন্দ্র-বিরোধিতা কী কালের পরিবেশে কল্লোলীয় অভিঘাতে বিরোধের জন্যই বিরোধিতা নাকি এর পেছনে ছিল ভিন্ন কোনো কারণ তা অনুসন্ধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যে বুদ্ধদেবের আপত্তি ছিল একথা সকলেই জানেন। তবে অগ্রজের সৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ ঐতিহ্যকে স্বীকরণের

আগ্রহে উৎসাহিত, তাঁর সৃষ্ট বহুকৌণিকতাকে অভিবাদন জানানোও তা-ই; সেকথা বুদ্ধদেবের বচনে জেনে নেওয়া যায় :

> ...সত্যি বলতে, পৃথিবীর মহৎ কবিকুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতুলনীয় শুদ্ধ এই কারণে যে তিনি একা, তাঁর জীবনের সাধনায় নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো কবি তা করতে পারেন নি। এত বড়ো কাজ একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাঁকে চোখের সামনে না দেখলে আমরা বিশ্বাস করতে পারতুম না। এ কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো কবি সম্বন্ধে বলা যায় না যে, তিনি একা স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্য স্রষ্টা।[৪]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের দ্বান্দ্বিক মনোভাবের নানা দিকে দৃষ্টিপাত করে সমালোচকের তাই মনে হয়, এ যেন বিপ্রতীপতা থেকে প্রতীতী, অস্বীকার থেকে অবগাহন। আর তাছাড়া একালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেবীয় বিরোধিতাকে ঠিক বিদ্রোহ বলতে পারা যায় না, এটি গঠনমূলক ইতিবাচক এক চিন্তাধারা হিসেবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। সময়সৃষ্ট মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন এবং তা প্রকাশের পথ খুঁজে বের করার তাগিদ ও স্বাধীন সৃষ্টির প্রেরণা এখানে বিদ্যমান ছিল।

'রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের সমস্ত possibilities-এর পরিণতি বা সমাপ্তি হয়নি'– প্রগতি পত্রিকায় 'মাসিকী' বিভাগে বুদ্ধদেব বসুর ঘোষণা।[৫] এ বক্তব্যের সূত্রে সমালোচকের মত– ১৯৩৫ সালে বুদ্ধদেব বসু যদি একথা উপলব্ধি না করতেন যে রবীন্দ্রানুসরণে বাংলা কাব্যের মুক্তি নেই, তা হলে তিনি আজ সৃজনদীপ্তিতে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আপন ভূ-খণ্ড গড়ে তুলতে পারতেন না। অবশ্য তরুণ বয়সের উৎকট তোরণ-দ্বারে পৌছানোর অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন :

> যাঁকে খুব ভালোবাসি, তাঁর একটু দুরে না গেলে তাঁকে ঠিক বোঝা যায় না। আপনার কাছ থেকে ভাষা পেয়েছি।[৬]

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনাও প্রয়োজন হয়েছিল বুদ্ধদেবের। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রেনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাংলা কবিতার একটি সংকলন বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়, সে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন :

> ...আমরা সকলে আমাদের সম্মিলিত কাব্য প্রচেষ্টা অপার শ্রদ্ধার সহিত আপনাকেই নিবেদন করতে চাই। বাঙালি লেখকদের পক্ষে আপনি যে বরণীয় এ শুধু একটা কথার কথা নয়; অন্তরে চিন্তায় ও কর্মে আপনাকে বরণ না করলে যে চলে না এ যে কত সত্য তা শুধু আমরাই জানি যারা বাংলা লেখবার চেষ্টা করি। আধুনিক বাংলা কবিতায় যেসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে কোনগুলি খাঁটি আর কোনগুলি মেকি এ যদি আপনি

> আমাদের না বলে দেন ত কে বলবে? ...আপনি বিক্ষিপ্তভাবে আধুনিক কবিতা কবিদের সমন্ধে যা বলেছেন সেগুলো সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করলে শুধু এ-যুগের নয়, ভবিষ্যতেরও লেখকের ও পাঠকের পথনির্দেশের সুবিধে হয়।[৭]

রাবীন্দ্রিক ভাবাদর্শ তথা আনন্দবাদ ও অসীম চেতনা মানতে না পারা ছিল বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-বিরোধিতার হেতু একথা একতরফাভাবে বলা যায় না। যুগপৎভাবে রবীন্দ্রদ্রোহ ও বন্দনা সম্ভব হয়েছিল নবসৃষ্টির উপলব্ধিতেই। বুদ্ধদেবকৃত রবীন্দ্র সমালোচনায় 'প্রশ্ন ও প্রণিপাতের যুগলবন্দী যে ঐকতান রচনা করেছে, তা প্রমাণ করে, তিনিই অন্যতম রবীন্দ্র-অনুরাগী।'[৮] এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের দোষ যে কোনোদিন ধরতে পারা যায়, আবার তাঁকে না পেলে তখন কারোরই এক মুহূর্ত চলে নি।[৯] তাছাড়া কেবল শিল্পজগতের প্রশ্নে নয়, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আর স্বৈরাচারীর উন্মত্ততায় যখন 'ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে লুব্ধতার লালা' ঝরছে তখন রবীন্দ্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি অস্থিরতা-উদ্বেগ দমন করার শক্তি ও প্রেরণা পান। শিল্প ও সুন্দরের বিনাশ ঔপনিবেশিকতার ফল, সেই দারুণ দুর্দিনে বুদ্ধদেবের কাছে জরুরি হয়ে ওঠে রবীন্দ্র-স্মরণ ও শরণ।

খ.

রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের ব্যাখ্যাতা কিংবা তাঁর আপন ভাষ্যের সীমানার বাইরে তাঁকে দেখতে পাওয়া সহজ নয়, একথা জানলেও বুদ্ধদেবকৃত রবীন্দ্র-সমালোচনা খণ্ডিত হয়ে যায় নি। সমকালে রবীন্দ্র-সমালোচকের নানামাত্রিক বিচার করেছেন তিনি এবং আদর্শের পূর্বপ্রস্তুতির যে স্বকীয়তায় কিংবা শিল্পভাবনার প্রতিফলে সমালোচনা মেরুদণ্ড পায় বলে উল্লেখ করেছেন– এ প্রসঙ্গে তা প্রমাণও করেছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্র-সমালোচকদের সাফল্য বা সীমা নির্ধারণের সমালোচনার দাবি প্রকারান্তরে রবীন্দ্র-চর্চার দৃষ্টি কী হওয়া উচিত এ-বিষয়ক বুদ্ধদেবীয় বক্তব্য থেকে রবীন্দ্র-বিচারক হিসেবে বুদ্ধদেবের একটা পরোক্ষ রূপ দাঁড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিষয়ে কিছু বলাকে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার' সমান হওয়াটা বিস্ময় না হয়ে পরিতাপের বিষয় হয়েছে তাঁর কাছে। বুদ্ধদেবের 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা' (১৯৪৭) প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-সমালোচকদের মূল্যায়ন। সমালোচকের বিশ্ববোধ– এ কথাটি কেবল রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে পরিবৃতির জন্য সমালোচকের প্রতি তাগিদ নয়, বরং একজন যথার্থ সমালোচকের নান্দনিক বীক্ষার পরিসীমা অতিক্রমণের অনুপ্রেরণা।

জীবনের সাথে স্রষ্টার সাহিত্যকর্মকে মিলিয়ে দেখা সমালোচনার এক বিশিষ্ট চর্চা। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর রচনাসম্ভারকে সম্পর্কিত করে সমালোচনা করেছেন প্রমথনাথ বিশী ও অনেকাংশে অজিতকুমার

চক্রবর্তী। সাহিত্যকর্ম বিচারে এ দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগ থাকলেও অসর্তক বিবেচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়; যখন বিচার-বিবেচনায় জীবনীর নানা তথ্য অবান্তরভাবে এসে মেশে। প্রভাতকুমারকৃত রবীন্দ্র-জীবনীকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী বলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 'তবে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কবির সর্বতোমুখী প্রতিভার ছবি এমনভাবেই ভাস্বর যে তাঁর প্রতি জীবনীকারের পক্ষপাত অপ্রতিরোধ্য।'[১০] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে তাঁর জীবন সম্বন্ধে (সমালোচকের) বিশেষ কিছু বলার নেই। সে কথা বিনয়-প্রসূত অতিশয়োক্তি মনে করেন না বুদ্ধদেব বসু। বরং রবীন্দ্র-বিচারে একদিক থেকে একে খাঁটি সত্য বলে ভাবেন। ক্রমবিকাশের অত্বর নিশ্চয়তা রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল, শৈশব কৈশোরই তাঁর সাহিত্যিক চরিত্রে নিয়ন্তা নয়, যখন থেকে তাঁর প্রতিভার চর্চিত প্রকাশ, প্রতিভার আরম্ভ তখন থেকে বুদ্ধদেব এভাবেই দেখেছেন কবিজীবনকে। রবীন্দ্রনাথের যারা ব্যাখ্যাতা, তাদের অনেকেই ভক্তিপ্রাবল্যে ও পূজার বোধে তাঁকে ভিন্নভাবে চিনেছেন, সমালোচনার প্রত্যয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথের সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুকে যেসব সূত্রে চিহ্নিত করা যায়, তা হল :

- সমালোচনা বলতে বুদ্ধদেব বসু বুঝেছেন উন্মীলন, 'সাহিত্যের বড়ো একটা পটভূমিকায় আলোচ্যকে আলোকিত ক'রে এবং নিজের উৎসুক চিত্তকে প্রকাশ করে, পাঠকের উদাসীন মনকে জাগ্রত করেন সমালোচক'[১১]– রবীন্দ্রনাথও সমগোত্রীয় সমালোচনাকে সমর্থন করেন।[১২] রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম বিবেচনায় বুদ্ধদেব বসু প্রথমত আস্বাদনপন্থী সমালোচক হিসেবে চর্চা করেছেন; উপভোগ যেখানে প্রায়ই মুখ্য সত্য হিসেবে থেকেছে। তবে ''সাহিত্য পাঠের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ধারণা-নির্ভর ইমপ্রেশনিস্টিক বা বিম্বধর্মী বিশ্লেষণে বুদ্ধদেবের আগ্রহ সত্ত্বেও প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন দেশ-কালের উত্তম সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি রবীন্দ্র–সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে অঙ্গীকরণের চেষ্টা করেছেন যাতে সাহিত্যের রূপগত-পদ্ধতিও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে।''[১৩]

- 'সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলিকে বুদ্ধদেব একটি অখণ্ড কবিতা হিসেবে পাঠ করেছেন এবং কাব্যবিচারে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে অথবা হওয়া উচিত, সেই পথেই আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্র-রূপকর্মের রহস্য।'[১৪] রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা কিংবা কথাসাহিত্যে দুর্মরভাবে তাঁর কবিসত্তার উপস্থিতির কথা বুদ্ধদেব নিজেই বলেছেন। তাই বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-আলোচনায় বারবারই রবীন্দ্রনাথের কবি অনন্য প্রতিভা অন্বেষণে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। তাঁর মতে, গীতিকার-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক-নাট্যকার-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত একটি অখণ্ড সত্তায় সন্নিবদ্ধ হয়েছে ...এবং

তা তাঁর কবিত্বশক্তির কারণেই সম্ভাবিত হয়েছে।[১৫] প্রকৃতির মতো অমিতবিত্ত প্রাচুর্য যাঁর সৃষ্টির; সমালোচনায় তাঁকে সমগ্রভাবে না দেখলে চেনাই যায় না– তবুও সৃষ্টির 'বিস্ময়কর অজস্রতা থেকে ফসল বেছে' তোলার ক্ষেত্রে নান্দনিক আনন্দের সাথেই মিশে গেছে সমালোচকের নিষ্ঠা।

- বিশ্ববোধ বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রলক্ষণ– এটা অনুভব করে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া সব সাহিত্যের মধ্যে একটি আন্তর সম্বন্ধ বিদ্যমান। তাই সাহিত্যকর্মের তুলনামূলক বিচারের যে গুণটি দেশ-কালের সীমাকে সংকুচিত করে অখণ্ড মানবসত্যকে খুঁজে ফেরে (বিশ্বসাহিত্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, বিশ্বসাহিত্য বিশ্বমানবকেই অন্বেষণ করে) বুদ্ধদেব বসুও সে কারণে বিশ্বসাহিত্যিকের পাশে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করে তাঁর বিরাট সৃষ্টিসম্ভারের বিশেষত্ব চিহ্নিত করেতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র-কবিসত্তা ও কবিতার মূল্যায়ন

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রকাব্যোপলব্ধি তাঁর রবীন্দ্র বিবেচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। *Tagore: Portrait of a Poet* (1962) *কবি রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৬) রবীন্দ্র-কাব্য বিচারের এ দুটি গ্রন্থ ছাড়াও *সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা/রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে বুদ্ধদেবের কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। এগুলো হল : 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী' (১৯৬১), 'রবীন্দ্রনাথের উপমা' (১৯৬০), 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজচিন্তা' (১৯৬০), 'রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙালি' (১৯৬২)। এছাড়া *সাহিত্যচর্চা* ও *কালের পুতুল* গ্রন্থেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে সমালোচকের রবীন্দ্র-কাব্য বিষয়ক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। *কবি রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব জানাচ্ছেন যে এর চারটি পরিচ্ছেদ যথা : 'কবিতার সাত সিঁড়ি' , 'কান্তা ও কবিতা', 'দেবতা ও বধূ', 'এপার-ওপার' তাঁর *Tagore: Portrait of a Poet* (বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দেওয়া বক্তৃতা সংকলন) নামক ইংরেজি বইটির মূল উপাদান 'আংশিকভাবে ব্যবহার' করে রচিত হয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় রচনাকালে তাঁর বক্তব্য 'প্রভূতভাবে প্রবৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে; যোগ হয়েছে নতুন তথ্য, যুক্তি, উদাহরণ ও মন্তব্য। তাঁর *কবি রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থ রচনার কারণ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মৌলিক ও সুচিন্তিত ভাবনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়ও তাঁর এ বিষয়ে যেসব চিন্তা তিনি দীর্ঘদিন ধরে করেছেন তার নির্যাস এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'কবিতার সাতসিঁড়ি'র একাংশে তিনি লিখেছেন :

> "সন্ধ্যাসংগীত" থেকে "শেষলেখা" পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা আমার অভিপ্রায় নয়, এবং কোনো একটি বিশেষ পর্যায়েও আমি আবদ্ধ থাকতে চাচ্ছি না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎকর্ষ ঠিক কোনখানে এবং তাঁর বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগসূত্রটি কোথায় লুকিয়ে আছে , শুধু এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সচেষ্ট হবো। [১৬]

'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' (১৯৫২, *সাহিত্যচর্চা*) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিচার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; এই নির্ভারতা এই স্বচ্ছতার জন্য, পরবর্তীর পক্ষে বিপজ্জনক উদাহরণ তিনি।' কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নানাধর্মী মূল্যায়ন করেছেন তিনি। তবে তার কবিতার আলোচনাগুলো রবীন্দ্রকবিতার ধারাবাহিক বিকাশকে তুলে ধরে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়েছে তাঁর কাব্যোৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে নান্দনিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রয়াণের দুই থেকে তিন দশকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে,

তাঁর শিল্পপ্রতিভার চারিত্র্যেকে প্রকৃত স্বরূপে দাঁড় করানোর অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ রবীন্দ্র-চর্চার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-কবিতার প্রধান অনুষঙ্গসমূহ যথা প্রকৃতি ও মানবজীবন, প্রেম, নারী, সৃষ্টিশীলতা ও কবিতা, স্বদেশ-দুঃখ-মৃত্যু ও ঈশ্বরভাবনা এই বিভিন্ন সূত্রে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায় থেকে নির্বাচিত কবিতার আলোকে বিচার করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে, প্রকৃতিকে অনুক্ষণ অনুধ্যান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'নববর্ষা' *(ক্ষণিকা)* 'বসুন্ধরা' *(সোনার তরী)* বিশ্লেষণ করেছেন। *সোনারতরী* (১৮৯৪) ও *চিত্রা* (১৮৯৬) কাব্যকে সমালোচকের মনে হয় 'এক রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবীর আলেখ্য।' *কল্পনা* (১৯০০) ও *খেয়া* (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থেও রয়েছে প্রকৃতি, কিন্তু 'তাতে অন্ধকারের অনুপ্রবেশ ঘটলো।' বুদ্ধদেব লিখছেন :

> "কল্পনার" প্রথম কবিতা– যা 'স্বর্গপথে' নাম দিয়ে আরম্ভ হয়েছিলো, আর যার জন্য কবি সংগ্রহ করেছিলেন বসন্ত, কিন্নরী ও মিলনকম্পিত দম্পতির মতো আনন্দজনক উপাদান, রচনাক্রিয়া শেষ হতে হতে তার নামকরণ হলো "দুঃসময়" আর কবি দাঁড়ালেন এক বিরুদ্ধ বিশ্বের মুখোমুখি, সেখানে নিতান্ত ইচ্ছাশক্তি ছাড়া মানুষের আর অবলম্বন নেই। এবং ছয় বৎসরের ব্যবধানে প্রকাশিত হলো 'খেয়া'– 'গীতাঞ্জলী'র প্রস্তুতি ও প্রস্তাবনা– রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নৈশ ও তিমিরলিপ্ত কাব্যগ্রন্থ।[১৭]

কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে চিত্রিত প্রতিটি তথ্য যেন অন্ধকারকে নিবিড় করে তুলেছে– সেখানে নদীতীর শূন্য, রাত্রি চন্দ্রহীন, পথ নির্জন, কুয়াশা, শীত ও বিষন্নতার ঋতু বর্তমান, যেখানে 'প্রদীপ ভেসে যায় অকারণে', কার্তিক মাসের দীপান্বিতা উৎসবের চেয়ে বড় কৃষ্ণপক্ষের তারা-ভরা আকাশ। এক জড় প্রকৃতি, প্রাণ ও মনসম্পন্ন মানুষ তার হিসেবে অনাবশ্যক। বুদ্ধদেব এ প্রকৃতি রূপায়নের ব্যাখ্যায় বলেন, "যেহেতু মানুষ একমাত্র চেতন জীব, তাই এ বিশ্বে সে প্রক্ষিপ্ত, বিশ্ববিধানে তার মানবিক জ্ঞান বা মূল্যবোধের কোনো স্থান নেই, অথচ জগৎটাকে তার চেতনার দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টাও সে ছাড়তে পারে না। এই যে দ্বন্দ্ব, যা মানবজীবনে মৌলিক ও অনতিক্রম্য, "অনাবশ্যক"–এর নিগূঢ় সংলাপে তারই বেদনা উদ্‌ঘাটিত হলো'।[১৮] এ প্রসঙ্গে 'আকাশপ্রদীপ' ও 'অমাবস্যা' কবিতাও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রীতি বা প্রকৃতি সম্পর্কিত সমূহ বাসনার বিকাশের মূলে কবিচিত্তের একটি বিশেষ ভাব বা দৃষ্টি প্রণিপ্রধানযোগ্য। প্রকৃতিতে ভয়ংকরতা, অন্ধকার ও মাধুর্য, মহান এবং সুন্দর পাশাপাশি থেকেই কবিকে মুগ্ধ করেছে। কোথাও কোথাও নিষ্ঠুর জড়ত্বকে অতিক্রম করে প্রাণের স্ফূর্তি জয় ঘোষণা করে চলেছে, এই ভাবই কবিকে ক্রমশ প্রকৃতির দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রকৃতির একদেশানুবর্তী প্রীতিসম্পর্ককে অতিক্রম করে সমগ্র সৃষ্টিগত দ্বান্দ্বিক রহস্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মর্তানুরাগ এবং রুদ্র-সুন্দরের লীলারস কবির কল্পনার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ীভূত হয়েছিল। ফলে

রবীন্দ্র-দর্শনে নিসর্গের সাথে মানজীবন একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে পড়ল। বুদ্ধদেবের সমালোচনায় রবীন্দ্র-দর্শনের এই দিকটা আভাসিত হলেও তাঁর রুদ্র বা অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতিকে গভীর সংবেদনায় আস্বাদন করার বিশেষ সৌন্দর্যদৃষ্টিকে তিনি সরাসরি ব্যাখ্যা করেন নি।

রবীন্দ্রকাব্যের আবহমান সূত্র কিংবা তাঁর অবিচল মানবধর্মের অন্যতম অঙ্গ হল মাতা পৃথিবী বা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা– রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি দর্শন বিষয়ে বুদ্ধদেবের ব্যাখ্যা এরকম। এ প্রসঙ্গে তিনি *সোনার তরী*র 'বসুন্ধরা' কবিতার আলোচনায় এ সিদ্ধান্তও নেন যে, কবির "পৃথিবী শুধু ভৌগোলিক নয়, বৈশ্বিক। ... সমগ্র পার্থিব অস্তিত্ব, পঞ্চভূতের বিস্তীর্ণ বিকিরণ– সব তিনি নিজের মধ্যে শোষণ করে নেবেন, জীবে ও জড়ে ভেদ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেলো।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট কল্পনাশক্তি *মানসী*র 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় বিশ্বাত্মবোধের আকুল বাসনা প্রকাশ করেছিল, *সোনার তরী*র 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় যা সম্যক পরিস্ফুট হয়ে মর্ত্য প্রীতিতে পরিণত হল ; *চিত্রা*য় সে বোধ স্থির সৌন্দর্য-অনুধ্যানে রূপান্তরিত হল। আর *খেয়া*য় এক আবেগাকুল সৌন্দর্য-বিহ্বলতার উপর ধ্যানজ জ্যোতির্ময়ী মূর্তির আলোকপাত ঘটেছে। সেই সাথে রয়েছে তাকে পাবার অপার্থিব আকর্ষণ। বুদ্ধদেবের মতে, "সেখানে রয়েছে সন্ধ্যার ধূসরতা, অনেক চন্দ্রহীন ও নিদ্রাহীন নিশীথ, বায়ুক্ষুব্ধ অন্ধকার প্রান্তর, মধ্যপথে কোনো আকস্মিক ও ছায়াচ্ছন্ন সাক্ষাৎ, অথবা কোনো সাক্ষাতের সম্ভাবনা।"[২০] কিন্তু সেইসাথে রয়েছে আদ্যন্ত এক প্রতীক্ষার শিহরণ; সে প্রতীক্ষা যেন নিশ্চিতিরই নামান্তর, যেন অন্ধকারের হৃদয়ের মধ্যেই একটি আগুনের শিখা ধিকিধিকি জ্বলছে। এই অনুধ্যানেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' ও 'বিশ্বদেবতার' তত্ত্ব, একে রহস্যের দুই প্রতিমূর্তি। বুদ্ধদেব তা ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

> 'আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে/ তোমারেই ভালোবেসিছি', 'জানে না তো কেহ কত নাম দিয়ে/ এক নামখানি ঢেকেছি' এই পঙক্তি দুটিকে সন্নিধ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রথমটি আছে 'উৎসর্গে'র তেরো নম্বর কবিতায়, আর দ্বিতীয়টি 'ক্ষণিকা'র উপান্ত্য কবিতা "অন্তরতম"তে। এবং 'গীতাঞ্জলিতেও একবার যাঁকে 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' (৫০ নম্বর) বলে গ্রহণ করেন, তাঁরই উদ্দেশ্যে আবার যখন বলেন, 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো' (৯৪ নম্বর), তখন বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা আক্ষরিকভাবে এক হয়ে যায়।[২১]

গীতাঞ্জলি কাব্যের আলোচনায় সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে বলেন :

> 'গীতাঞ্জলি'তে একটি লক্ষণ পাওয়া যায়, যার অভাব তাঁর অন্য অনেক কাব্যগ্রন্থে পীড়াদায়ক– তা হলো সংগতি বা অখণ্ডতা। ... অনেকগুলি সমান্তর পথ অবশেষে এখানে এসে মিলিত হলো : প্রকৃতি ও মানবজীবন, নারী ও কবিতা। স্বদেশ, দুঃখ, মৃত্যু ও ভগবান– এই সব সূত্র, যা এতকাল বিচ্ছিন্ন অথবা আংশিকভাবে যুক্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে; তার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটলো, একবার এবং শেষবারের মতো, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র কাব্যপর্যায়ে। তিনটি নাম, কিন্তু একটিই কাব্য, বক্তব্য ও শৈলীতে অভিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক ও সমার্থক। [২২]

রবীন্দ্রনাথের বহুত্ববাদী দর্শন বিষয়ে বুদ্ধদেবের ব্যাখ্যা হল, "রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি সূত্র বেরিয়ে আসে : ঔপনিষদিক ও বাউল বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গি, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, উনিশ–শতকী পাশ্চাত্য মানবধর্ম ও রোমান্টিকতা, এমনকি আঠারো শতকী যুক্তিবাদ; বলা বাহুল্য এর কোনো কোনোটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে বিরোধগুলিকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে যা বিশেষভাবে মনোজ্ঞ, তা তাঁর নম্যতা ও গতিধর্ম এক ও অনেকের মধ্যে, রূপ ও অরূপের মধ্যে তাঁর নিরন্তর ভ্রমণ।"[২৩] বুদ্ধদেব তাঁর এ মতামতের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দর্শনভাবনায় দুই মুখ্য দিক প্রকৃতিপ্রীতি ও জীবনদেবতা তত্ত্বের রূপ রূপান্তরের ব্যাখ্যা দেন। তা হল– আধ্যাত্মিকতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। যেমন *চৈতালি* কাব্যেও প্রকৃতির কোনো কোনো রূপ স্বাবলম্বীভাবে উপস্থিত। অথচ "*চিত্রা*য় সেই প্রকৃতি হয়ে উঠলো শাশ্বতের বহুবর্ণ রশ্মি, এক অনামিত ব্যাপ্ত দেবতার বিচ্ছুরণ। ... 'সিন্ধুপারে'তে দেবতাকেই চরম ও সর্বস্ব বলে ঘোষণা করার এক মাস পরে লিখলেন *চৈতালি*র বৈরাগ্য নামক চতুর্দশপদী, যাতে নিতান্ত গার্হস্থ্য জীবনের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেবতাকে এক করে দেয়া হলো। তত্ত্বের দিক থেকে যে দুটি ভাব বিপরীত, তারা যুগপৎ আশ্রয় পেয়েছিলো রবীন্দ্রনাথে; আমরা যাকে তাঁর আধ্যাত্মিকতা বলি তা যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে ভোলে না, তেমনি তাঁর ভগবানও সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিকীর্ণ হন।"[২৪]

রবীন্দ্র-কাব্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগসূত্র অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন সমালোচক। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক দর্শনকে স্বীকার করলেও তাঁর জীবনদেবতা তত্ত্বের স্বরূপ ও বিবর্তনকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। 'মানসসুন্দরী'র গভীর ও ব্যক্তিগত আবেগ যাকে ঘিরে, সেই সত্তার প্রতি কবির নিরন্তর অনুধ্যান ধ্রুব শিল্পরূপ পেয়েছিল 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়। অর্থাৎ সমালোচকের মতে, 'মানসসুন্দরী' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পূর্বলেখ। দ্বিতীয়োক্ত কবিতায় "বিদেশিনী যেন বিশ্বপ্রকৃতি, কবির আরাধ্য কবিতা দেবী, যার কাছে কবির সত্তাসার উৎসর্গিত, তাঁর লুকোনো রহস্যগুলিও কবির নিজের।"[২৫] কখনও কখনও কবির আরাধ্য এই সৌন্দর্য ও মানবী এক হয়ে পুর্নবার বিশ্বের কবিতারূপ

উদিত হন; সমালোচকের মতে এ এক নির্দিষ্ট অপরিবর্তনশীল সত্তা, কবি তাঁকে যে ক্ষমতা আরোপ করেছেন তারই নাম সৃষ্টিশীলতা, তিনিই ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার উৎস, কবির অর্ধচেতন অন্ধকার মনও তিনি, অনিবার্য অন্তরাল ও লুকোচুরি সত্ত্বেও রয়েছে দূরতর ইঙ্গিত। *মানসী* থেকে *গীতাঞ্জলি* পর্যন্ত অনেক কবিতার লক্ষণ এক দ্বিমুখিতা বা বহুমুখিতা– নারী ও প্রকৃতি, কবিতা ও বিশ্ব, প্রেমিক ও ভগবান, কবি ও তাঁর কবি বা সৃষ্টিপ্রতিভা (creative personality), 'এঁরা যেন একই দেহে অবস্থিত হয়ে দেখা দিয়েও দেখা দিচ্ছেন না।'[২৬] রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই 'সেই সত্তার স্তবগান, যা একাধারে ব্যাপ্ত ও তুরীয়, অসংখ্য ও এক, অফুরন্তরূপে চঞ্চল ও নিঃসীমরূপে স্থির, ইন্দ্রিয়ের পক্ষে বিমোহন এবং দেশকালোত্তর অনন্ত শূন্যে অমেয়।'[২৭] কিন্তু এত প্রেম ও পূজা সত্ত্বেও অন্যান্য ভক্তিরসাশ্রিত বা মিস্টিক কবিদের সাথে রবীন্দ্রনাথকে এক পঙক্তিতে বসাতে অস্বীকৃতি জানান সমালোচক। কারণ অনেকগুলি 'ভিন্ন ভিন্ন ভালোবাসার মধ্যে সেই সত্তা বারে বারে যাতায়াত করেন' এবং কবির 'সব কামনা ও কান্তার অন্তরালে একটি বিশ্বসত্তার চেতনাও তাঁর পক্ষে ধ্রুব, তবু কবির ভালবাসার পাত্র বহু ও বিচিত্র।'[২৮] সেই একই কারণে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবিদের থেকে রবীন্দ্র-দর্শন পৃথক– বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবন, মানবী ও কবিতা, এইসব আধুনিক উপাদানের সন্নিপাতে যে দেবতার মূর্তি তিনি গড়েছিলেন, তা বৈষ্ণবদের কৃষ্ণের তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও বহুস্তর এবং সেইজন্য ঈষৎ অস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথকে মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক গীতিকবি হিসেবে চিহ্নিত করেন সমালোচক বুদ্ধদেব। সাহিত্যের আলোচনায় তুলনামূলক ভঙ্গি তাঁর বিচার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম গুণ; রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম বিবেচনায়ও তাঁর মানদণ্ড এ রীতির অনুগামী। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য দাবি করে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকা।' তাঁর *মানসী* থেকে *গীতাঞ্জলি* পর্বের কাব্য দ্বারাই সমালোচক বুদ্ধদেব সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট, আকৃষ্ট তাঁর সহজাত বোধেই। তাই রবীন্দ্রনাথের সাথে তিনি প্রতিতুলনা করেন শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, হুইটম্যান, গ্যেটে, পেত্রার্ক, বোদলেয়ার, ভের্লেন, ইয়েট্স-এলিটয়ের, এমনকি বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশের সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের সঙ্গেও।[২৯] তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে কাব্যকলার একক কোনো রূপ বা ভাবনায় সীমাবদ্ধ নন, তা মুগ্ধ করে বুদ্ধদেবকে। তিনি এও জানেন অভিনব ও আবহমান বিশ্বসাহিত্য ('মানুষের বহুবিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একানুভূতির অনুসরণ', গ্যেটে যাকে অভ্যর্থনা করেন সেই বিশ্ব সাহিত্যবোধ) রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। তাই সমালোচকের মতে শুধু ভারতীয়, এশীয় বা প্রাচ্য কবি ভাবলে তাঁর মর্মস্থলে পৌছানো যাবে না।[৩০] তিনি বিশ্বকবি এই কারণে যে, "তাঁর দেশের মাটিতে 'বিশ্বময়ী' তাঁর আঁচল পেতে রেখেছেন, আর

সেই জন্যই সেই 'মাটি' প্রণম্য, আর তাঁর ভগবান যেখানে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে ভগবানের সঙ্গে মিলন তাঁর আকাঙ্ক্ষা। যে বিশ্ববোধ রবীন্দ্রনাথের চরিত্রলক্ষণ তার আলোকেই সমালোচক তাঁর স্বদেশ ও সমাজ চিন্তার বিচার করেছেন। কবিতায় বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি মানুষের বেদনাধ্বনি *মানসী* থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। সমালোচকের মতে, '*বলাকায়* এবং আরো বেশি *পলাতকায়* সমকালীন জগৎ ও বাংলাদেশকে তিনি কাব্যের অন্তরঙ্গ করে নিলেন– এমনকি তাঁর তৎকালীন ছোটোগল্পের মতো কবিতাতেও সামাজিক সমস্যা অবতীর্ণ হলো।'[৩১] দেশ ও জগতের অবস্থা বিষয়ে তাঁর ক্রমবর্ধমান অস্বস্তি যা এক সময় প্রায় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; তার কারণ হিসেবে বুদ্ধদেব বর্ণনা করেন, তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ অধ্যায়, পৃথিবীতে কম্যুনিজম ও ফাশিজম এর উত্থান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা– যা তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি– স্বজাতির শতাব্দীসঞ্চিত দুঃখভার– এই সবকিছুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেন 'অপরাধীর উদ্দেশে অভিশাপ ও ত্রানকর্তার প্রতি প্রার্থনার মধ্যে দোলায়িত হচ্ছিলো।' যদিও কেবল এ কারণে তাঁর কবিতা যাঁরা শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁদের সাথে একমত নন বুদ্ধদেব।[৩২] এভাবে কবিতার বাণীপ্রপাতে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন 'এক স্থায়ী ও সুন্দর রূপকল্প; পূর্বতন সকল দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যিক ও ধর্মগুরুদের শতকার্ধব্যাপী যা কিছু সাধনা, সব যেন তাঁর মধ্যে এসে সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত হলো; বাঙালির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাগুলো গৃহীত হলো তাঁর বহুমুখী শিল্পকর্মে ও সামাজিক অবয়বে।'[৩৩] তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক তিনি; দেশপ্রেমিক, সমাজচেতন, সংস্কারপন্থী; আন্তর্জাতিকতার পুরোহিত, শান্তির দূত, মানবপ্রেমিক, শোষকের শত্রু– নানা অর্ঘ্য তাঁর। তবুও সমালোকের কাছে সবচেয়ে বড় তিনি কবি। আর 'জগৎটাকে অনুভব করবার ঘটক', 'ইঙ্গিতের মহাশিল্পী, যাঁর কাছে উপলব্ধির উপায় হলো অনুভব।'

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলাকৌশল বা রূপের আলোচনা বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রকাব্যবিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বলা যায়, বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রকরণগত নানা বৈচিত্র্যই সমালোচককে এর বিচারে অধিক মনোযোগী করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও উপমার প্রসঙ্গে কাব্যের পাশাপাশি তাঁর গানে ছন্দোমুক্তির বিষয়ে সমালোচকের মূল্যায়ন রয়েছে। 'বাংলা ছন্দ', 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী' এবং 'রবীন্দ্রনাথের গানে গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধগুলিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ক চিন্তা ও সৃষ্টিকর্মে তা প্রয়োগের সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া ছন্দ বিবর্তনে *মানসী* কাব্যের ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে সমালোচকের। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত সমমাত্রিক, অসমমাত্রিক, অসমমাত্রিক চলন, তিনমাত্রার পর্ব প্রভৃতি তিনি গ্রহণ করেছেন। একটি প্রস্তাবও তাঁর আছে–

মিশ্রকলাবৃত্ত বা তান প্রধান রীতিকে সোজাসুজি 'পয়ার' নামে গ্রহণ করার। অর্থাৎ পয়ারকে তিনি একটি বিশেষ রূপবন্ধ হিসেবে গ্রহণ না করে একটি রীতির সাধারণ নাম হিসেবেই মেনে নিতে চান। এছাড়া সংগীতের বাণীরূপকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ধারণার যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এ বিষয়ে গভীর চিন্তার অবকাশ আছে। সেই চিন্তার দ্বার উন্মোচন করে বুদ্ধদেব একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। *বলাকা* থেকে *শেষ লেখা* পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের উত্তরখণ্ড সম্বন্ধে তিনি কিছুটা উদাসীন। তবে আশ্বিন ১৩৪৩ থেকে আশ্বিন ১৩৪৮-এর মধ্যে তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা আছে। 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'নবজাতক', 'জন্মদিনে', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ('কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৩, চৈত্র ১৩৪৩, আষাঢ় ১৩৪৭, আষাঢ় ১৩৪৮, আশ্বিন ১৩৪৮) সম্পর্কে স্বল্পায়তনের কিন্তু মূল্যবান সমালোচনা রয়েছে।[৩৪] রবীন্দ্রনাথের *মানসী* (১৮৯০) প্রকাশের সত্তর বছর পর ১৯৬০ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর আলোচনায় এই মত ব্যক্ত হয় যে, *মানসী* কাব্যের মাঝেই রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রূপে। সুধীন্দ্রনাথ লেখেন :

> His inventive genius gave no better account of itself than in Manasi[৩৫]

প্রায় একই সঙ্গে বুদ্ধদেবও বললেন, "এই কাব্যগ্রন্থ– যাকে বলতে পারি তাঁর সমগ্র কাব্যের একটি অনুবিশ্ব। প্রাক্ রবীন্দ্র সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও তার সঙ্গে তুলনীয় আমরা কিছুই পাব না।"[৩৬] রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্যে আছে, কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দিলেন এ বইতে, তবে কেবল কলাকৌশল দেখে নয়, বুদ্ধদেব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'ভাববস্তুতেও *মানসী* কে রবীন্দ্রকাব্যের অনুবিশ্ব বলা যায়।' রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অফুরন্তভাবে ফিরে ফিরে এসেছে যে সব মূলসূত্র, তার প্রথম সার্থক উচ্চারণ পেয়ে যান এই *মানসী* কাব্যে।

রবীন্দ্র-কাব্যের উপমা বিচারে সমালোচক তাঁর কাব্যকে উপমাপ্রধান না বলে উক্তিপ্রধান বলেছেন। 'চিত্রকল্পের সাহায্য না-নিয়ে শুধু সরল প্রার্থনা বা বিবৃতিকে ছন্দোবদ্ধ করে যাঁরা স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন' তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন উচ্চতম শ্রেণীতে বলে মনে করেন সমালোচক। তাঁর উপমা বিচারে প্রতিতুলনাও আছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যকর্মের সাথে। বুদ্ধদেবের মতে, "রবীন্দ্রনাথের উপমা কিছুটা শেক্সপিয়রের মতো : কাব্যের দেহ থেকে তাঁর উপমাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তা প্রবিষ্ট হয়ে থাকে পরতে-পরতে, কাজ করে যায় গোপনে ফলিয়ে তোলে তার অনুভূতিগুলোকে, তাঁর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধ ও অতীন্দ্রিয় আনন্দবেদনাকে।"[৩৭] যেমন "মেঘের অন্তর-পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে/

চলে গেল দিন।" সমালোচকের মতে, এগুলো স্পষ্ট উপমা নয়, কিন্তু স্পষ্ট নয় বলেই এরা জাগিয়ে তুলছে স্বপ্ন, স্মৃতি, অনুষঙ্গ।

'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি' (১৯৬২) প্রবন্ধের শুরুতে বুদ্ধদেব লেখেন, "যেন এক দৈব আবির্ভাব-অপর্যাপ্ত, চেষ্টাহীন, ভাস্বর, পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম : আমার কাছে এবং আমার মতো আরও অনেকের কাছে, এ-ই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" রবীন্দ্রকাব্যের বিচারে তাঁর কবিতায় যে নিত্যসত্যতা আছে, তা তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর কবিতায় তীব্রতা নেই, নেই কোনো বিসংবাদী সুর, যখন তিনি সবচেয়ে মর্মস্পর্শী, তখনও তিনি উপরিস্তরে মধুর; তার ভাষা যেন 'পেলব যামিনী'; নিরন্তর কাব্যোচিত শব্দ ব্যবহার করেন তিনি, এমন শব্দ, যা কখনো পরস্পরের প্রতিবাদ করে না, সৌন্দর্যের সঙ্গে আবহমানভাবে সম্পৃক্ত শব্দ দিয়ে রচনা করেন সৌন্দর্য।[৩৮] জীবন ও কবিতা সম্পর্কে তিনি আজীবন একই ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁর রচনা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের চূড়ান্ত মতামত এই যে, 'তা কানায় কানায় প্রাণপূর্ণ, অব্যর্থভাবে সংক্রামক।'[৩৯] উত্তরকালীন রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেব মূল্যায়ন করলেও তিনি ভালোবাসেন সেই রবীন্দ্রনাথকে, 'যেখানে প্রজ্ঞা নয়, এক অভিনব বোধের জাগরণ' ঘটায় তাঁর কবিতা। সমালোচক একথা বলে স্বস্তিবোধ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো কবিকে তিনি জানেন না, 'যিনি পাঠকের মনে এই বিশেষ অনুভূতিটি সঞ্চারিত করেন– এই মর্মরধ্বনি ও চাঞ্চল্য, এই হিল্লোলিত আনন্দ ও বেদনা, বা দিতে পারেন এমন এক শাশ্বতের সন্ধান, মানুষ ও ভগবান যার সমকক্ষভাবে অংশীদার।[৪০] আর সেই কবিকে বুদ্ধদেব পেয়ে যান 'গীতাঞ্জলি' পর্বেই; এভাবে কবি 'রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেবেরই রবীন্দ্রনাথ।'[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র-উপন্যাস বিষয়ক বিবেচনা

সাহিত্যিক জীবনের শেষার্ধে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রচর্চার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' (১৯৫৫), 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ'(১৯৬৩), 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৫) ও 'Tagore : Portrait of a poet' (১৯৬২) প্রভৃতি গ্রন্থে। ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনবাসের আনন্দময় স্মৃতিকাহিনী 'সব পেয়েছির দেশে'। গ্রন্থে অ-সংকলিত রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনার পরিমাণও অনেক। ১৩৪২-এর পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৬৭-এর আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত 'কবিতা' পত্রিকার পাতায় বুদ্ধদেব বসু একদিকে রবীন্দ্র রচনাবলির সমালোচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব রচনাগুলি সম্পর্কে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন। এভাবে সমকালে প্রকাশিত বহু স্বতন্ত্র কবিতা ছাড়াও 'ছেলেবেলা', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'গল্পস্বল্প', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'চিঠিপত্র ১-৬ খণ্ড', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'আত্মপরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'চার অধ্যায়', 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', 'বৈকালী' প্রভৃতি রবীন্দ্ররচনার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে 'কবিতা'র পাতায়। রবীন্দ্র-রচনাবলি অষ্টাদশ খণ্ড পর্যন্ত সমালোচিত হয়েছে। এছাড়াও রবীন্দ্র-রচনার ইংরেজি তর্জমা এবং ভিন্ন ভিন্ন লেখক-সমালোচকদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ প্রবন্ধ সমালোচনাও 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় পর্যালোচিত হয়েছে। এমনকি, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলন গ্রন্থটিও বাদ যায়নি । রবীন্দ্রনাথের ছোটো কবিতা, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা, ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প– প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সাধারণ আলোচনাও করেছিলেন বুদ্ধদেব তাঁর 'কবিতার' পাতায়।

১.১

উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি ও এর বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। *চোখের বালি* (১৯০৩) বাংলা সাহিত্যের সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা করেছে বলে বিবেচিত হয়। রচনাবলির 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে[৪২] বুদ্ধদেবও *চোখের বালি* সম্পর্কে বলেন যে এটি সেই জাতের উপন্যাস, যার নির্ভর, ঘটনাবিন্যাসে নয়, মানুষের মনোলোকের রহস্যে। কিন্তু 'এই মনের কারখানা-ঘরের' উপাখ্যানটির সমাপ্তি বিনোদিনীর জীবনের পরিণতির কারণে সমালোচক

সমর্থন করতে পারেননি। বুদ্ধদেবীয় এই প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীকালে অনেকটা 'অনুতাপ' স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

উপন্যাসটির ত্রুটি বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে নানাদিক থেকে প্রকট, এর "গঠন শিথিল, রচনা সমতল, ব্যবস্থাপনা, যাকে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে 'গৃহিণীপনা' বলেছিলেন, প্রায় কিছুই নেই। ঘটনাগুলোকে অনেক স্থলেই নাটকীয়ভাবে উন্মীলিত করা হয়নি; পদাতিকভাবে বিবৃত করা হয়েছে।"[৪৩] কিংবা কোনো বিস্তার, বঙ্কিমা কিংবা বিস্ময় ছাড়াই গল্পটাকে তৎকালীন প্রচলিত প্রথায় কোনোরকমে বলে দিয়েই তিনি ছুটি পেতে চেয়েছেন, 'তাঁর মন অন্য কোথাও পড়ে আছে।' আর সেটা তাঁর কবিতা। কবি ও কথাশিল্পীর বিরোধ কিংবা সমন্বয়ের এ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব উপন্যাসের বিচারেই বলতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। কখনও সে দৃষ্টিভঙ্গিকে মানদণ্ড করার ফলে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-উপন্যাস বিচার অনেকখানি একপাক্ষিক হয়ে পড়েছে বলে কোনো কোনো সমালোচকের মনে হয়েছে। কিন্তু তা পুরোপুরি সত্য নয়।

১.২

১৩৪৮-এ 'কবিতা'র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় *গোরা* (১৯১০) সম্পর্কে বুদ্ধদেবকৃত মুল্যায়ন। বিশেষ একটি দেশের, বিশেষ একটি যুগের অর্থাৎ ঊনিশ শতকের শেষের বাংলা দেশের প্রায় সম্পূর্ণ মর্মকথা *গোরায়* প্রকাশিত; বুদ্ধদেব একে ঐ সময়পর্বের এক 'এক জীবন্ত আলেখ্য' বলে মনে করেছেন। তাই *গোরা* বিশেষভাবে সমসাময়িক, যেখানে সাময়িক সমস্যা, বিচার বিতর্কের মননশীলতা প্রাধান্য পেয়েছে। এটাই রবীন্দ্রনাথের সেই বিশেষ উপন্যাস যেখানে নগরের দ্বন্দ্বময় আবহাওয়াকে অনুভব করা যায়। কারণ হিসেবে বুদ্ধদেব বলেন :

> চিন্তার নানাবিধ আন্দোলনের কেন্দ্র হলো রাজধানী, সেখানে মানুষ বুদ্ধিজীবী, মতভেদে, সংশয়ে, আত্মবিরোধে পীড়িত; তাই 'গোরা'র মতো উপন্যাসের পক্ষে তার পটভূমিকা অপরিহার্য ছিলো।[৪৪]

তবে এই মতভেদ-সংশয় আত্মবিরোধ কিংবা বিচার-বিতর্কের তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে কোনো প্রচারকার্যে নামেননি রবীন্দ্রনাথ, 'একটি শিল্পকর্ম সম্পাদন করতেই চেয়েছিলেন এবং সেই শিল্পকর্মের মধ্যেই বয়ন করে দিয়েছেন বাংলাদেশের তৎকালীন ইতিহাস।'[৪৫] ইতিহাস হলেও উপন্যাসের গল্প তা দ্বারা আক্রান্ত হয়নি অর্থাৎ এমন নয় যে, বইয়ের গল্পাংশ লেখকের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চিন্তাধারা বহন করবার উপলক্ষমাত্র। তা যদি হতো তাহলে এ কালে বইটি মূল্যহীন হতো, কেননা হিন্দু-ব্রাহ্মের

বিরোধ আজকের দিনে অস্তিত্বহীন, হারানবাবুর সঙ্গে গোরা কিংবা তার সুযোগ্য প্রতিনিধি বিনয়বাবুর বিতর্কের উজ্জ্বলতর অংশগুলিও আজ ম্লান হয়ে গেছে; 'মাঝে মাঝেই মনে হয় যে এতটা দরকার ছিলো না, একারণে গল্প-স্রোতে বাধা পড়েছে।'[৪৬] সুতরাং বুদ্ধদেব বসু *গোরা* উপন্যাসের সমকালীনতা প্রসঙ্গের কারণ ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রবৃত্ত হন এর শিল্পকাজ আবিষ্কারে। তাঁর মতে, গ্রন্থের কোনোখানেই স্বাদেশিকতা কি ধর্মের উন্মাদনা শিল্পীর সত্যদৃষ্টিকে আবিল করেনি। সমালোচকও *গোরা*র যুগচৈতন্যে কল্লোলিত তত্ত্ব-প্রতিভূ চরিত্র ঘটনা থেকে দূরে গিয়ে বিপুল জীবনাগ্রহের উদ্দীপনা ও প্রাত্যহিক জীবনের চলমানতা খোঁজেন, কিংবা তাঁর অন্বিষ্ট অন্তর্জগত বর্ণময় প্রকৃতি তা-ও আবার টুকরো টুকরো প্রতিচ্ছবির আকারে, উপন্যাসের বহুস্তরী সামগ্রিকতা থেকে যা বেছে বেছে তুলে নেয়া। তাঁর প্রথম পাঠের উপলব্ধি অর্জনই সে কারণে শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে :

> কিশোর বয়সে 'গোরা' উপনাসটি প্রথম যখন পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল আমার উপর দিয়ে প্রবল একটা ঝড় বয়ে গেল। ...সেই সময় থেকে 'গোরা'র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিত্র মনের মধ্যে বহন করে আসছি। তারপর প্রায় কুড়ি বছর পরে, মাস তিনেক আগে আবার 'গোরা' পড়লুম সমালোচনা লিখবো বলে। এখন লিখতে বসে দেখছি, এই তিন মাসে বইটির অধিকাংশই ভুলেছি; ঠিক সেটুকুই মনে আছে, যেটুকু আমার প্রথম পাঠের উপার্জন ছিলো। 'গোরা'র দীর্ঘ শুভ্র মূর্তি, তার চলে যাওয়া, নদীবক্ষে অন্ধকার রাত্রে বিনয়গুললিতার প্রেমের উন্মীলন, আনন্দময়ীর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্তি, সুচরিতার ছোটো ভাইটি, দুধ আর জলের তফাৎ নিয়ে হরিমোহিনীর বিখ্যাত মন্তব্য– তারপর, সমস্ত ঝড়-ঝাপটার পরে, শেষ পাতাটির স্বল্পবাক মধুর উজ্জ্বলতা শুধু এই ক-টি রেখায় 'গোরা' বইটি আমার মনে আঁকা হয়ে আছে।[৪৭]

বুদ্ধদেবের এই অনুভূতি থেকে তাঁকে *গোরা*র এক মুগ্ধ ও চিন্তায় নির্লিপ্ত পাঠক বলে মনে হলেও এরই মধ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত সমালোচকের মন সংহত চিত্তে খুঁজে নিয়েছে উপন্যাসের চরিত্রায়ণ, সংগঠন কিংবা এর সার্বিক শিল্প-প্রকৌশল। প্লটের গঠন ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী উপন্যাসের সাথে এর একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। *গোরা*র গঠন-কাঠামো নিয়ে তিনি বলেন :

> রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে 'যোগাযোগ' শেষ হয়নি বলে সবচেয়ে তৃপ্তিকর মনে হয় 'গোরা'। অর্থাৎ উপন্যাস হিসেবে তৃপ্তিকর। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'র বিশৃঙ্খলা এখানে নেই, 'ঘরে-বাইরে'র অতিশয্যও না– গঠনে কখনো একটু শৈথিল্য যদি থাকে, সেই ছোটো ত্রুটি ঢাকা পড়ে যায় তার ব্যাপ্ত পটভূমিকায়, ঘটনা ও চিন্তার বহুল ঘাত-প্রতিঘাতে। বহু চরিত্র ও ঘটনার বৈচিত্র্য নিয়ে জীবনের কোনো

> এরকম সমগ্রতার রূপসৃষ্টি উপন্যাসের যে-বিভাগের চরিত্রলক্ষণ, তার মধ্যে 'গোরা' একটি উজ্জ্বল আসন অধিকার করে আছে।[৪৮]

গোরার কোনো চরিত্রকেই রবীন্দ্রনাথ অস্পষ্ট ভাবমণ্ডলে রাখেননি, তারা কোনো আদর্শের প্রতিভূমাত্র নয়, তারা মানুষ– চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মুল্যায়নের কেন্দ্রদৃষ্টি এখানেই। হারানবাবু, মহিম, বরদাসুন্দরী, হরিমোহিনী, কৈলাস– এই গৌণ চরিত্রগুলোও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত; সমতল নয়, বন্ধুর, তাদের তিনটি আয়তনই দৃষ্টিগোচর। হারানবাবু চরিত্র প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন– তার প্রতি 'ভুলক্রমেও কখনো সহানুভূতি জাগে না।' কারণ হারানবাবু রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অপছন্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পছন্দ-অপছন্দের চেয়েও বড়, হারানবাবু কেবল তত্ত্ব-তর্ক ইচ্ছুক নিস্প্রাণ ক্রিয়াহীন চরিত্র। একটা পরোক্ষ দ্বন্দ্ব সে তৈরি করেছে বটে, তবে চর্চিত বুলি আওড়ানো ছাড়া উপন্যাসে তার বড় কোনো ভূমিকা নেই।

রূপক চরিত্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা থেকে আনন্দময়ীকে রক্ষা করেছে তার চরিত্রের সজীব বৈশিষ্ট্য; তাঁর প্রতি বুদ্ধদেবের আকর্ষণও সে কারণে– "আনন্দময়ীর মতো প্রাণোচ্ছল, জীবন্ত প্রধান চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে দ্বিতীয়বার দেখা দেয়নি। এত ধৈর্য, এত ক্ষমা, এত স্নেহ, তবু তো কখনো মনে হয়না যে তিনি 'বানানো', তাঁর কোনো কথায়, কোনো ভঙ্গিতে তিলমাত্র অবিশ্বাস জাগে না।"[৪৯] বুদ্ধির চেয়েও যার বোধি বড়, সত্যকে যিনি সহজে অনুভব করেন মনের মধ্যে– সেই আনন্দময়ী চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ সমালোচক মনে করেন এ রবীন্দ্র-চিত্তেরই নির্যাস, 'সব তর্কের পরপারে রবীন্দ্রনাথ যেখানে স্থির হয়ে আছেন, তাঁর সেই আস্থার উক্তি' শোনা যায় আনন্দময়ীর মুখে। পরেশবাবু, যিনি আপাতদৃষ্টিতে আনন্দময়ীর কাছাকাছি চরিত্র, তাঁর মধ্যে সাধারণ মানবীয় বৃত্তির অভাব আছে বলে মনে হয়েছে সমালোচকের।

গোরার দার্ঢ্য, আত্মনির্ভর শক্তি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাঙালি পুরুষের চরিত্রলক্ষণ নয়– গোরাকে বুদ্ধদেব এ দৃষ্টিতেই দেখেন।. তবে 'স্বদেশীযুগের ভরপুর মৌশুমের সময় লেখা উপন্যাসটির গোরা চরিত্র পরিকল্পনার মূলে সম্ভবত সে যুগের একজন দেশনায়কের আভাস আছে।'[৫০] এই রকম প্রবল পুরুষ চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নেই, তুলনা করলে সন্দীপের মধ্যে যাত্রার দলের রাজাটি ঠিক বেরিয়ে পড়ে, সম্ভবত বাংলা সাহিত্যেই এর তুলনা বিরল।[৫১] বুদ্ধদেবের যুক্তি হচ্ছে যে, পরাধীন দেশ, অক্ষম দেশ, তার উপর হিন্দুয়ানির অসংখ্য অন্ধতায় আবদ্ধ– এর মধ্যে পৌরুষের কোনো ক্ষেত্র

ছিলো না। এ মন্তব্য অবশ্য পুরোপুরি মেনে নেয়া যায় না, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ ইতিহাস ও আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে এটা বুদ্ধদেবের একরৈখিক ও খণ্ডিত বিচার। 'ভীত, অসহায়, আত্মহিতবিচারে অক্ষম' দেশবাসীর কাছে বিচরণের নানা পর্যায়ে গোরার ভেতরে ক্রমশ জন্ম নেয়া বিরোধ, স্ব-কর্ম ও সাধনা সম্পর্কিত সন্দেহ প্রভৃতি এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদয়াল কর্তৃক জন্ম-যবনিকার উত্তোলন আর সবকিছু থেকে গোরার ধ্বংসাত্মক মুক্তি– বুদ্ধদেবের মনোযোগ প্রায় সবটা এখানেই। 'মানবধর্মের মহৎ পূজারি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজে; আর এ পর্যায়ে একটি বৃহত্তর জাতিক-আন্তর্জাতিক মানবীয় মুক্তির বর্ণনায় গভীর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সমালোচকও। যেন গোরার সারা মন-প্রাণ আকাঙ্ক্ষা করছিলো এই মুক্তিকেই। সেখানে আনন্দময়ীর ভূমিকাও কী প্রবল নয়? লছমিয়ার হাতে জল খাওয়ার আয়োজনটি সে কারণে আনন্দময়ীর পায়ে মাথা রেখেই সম্পন্ন হয়। সংবেদনশীল সমালোচক গোরার সে পরিণতির বর্ণনা করেন তাঁর নিজের ভেতরে লালিত মানবমুক্তির আন্তর্জাতিক দর্শনবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে।

১.৩

চিঠির আঙ্গিকের উপন্যাস *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬)। দু'তিনটি পাত্র-পাত্রীকে বক্তা করা আর চিঠি কিংবা ডায়েরির শরণ নেয়াটা বুদ্ধদেবের চোখে 'অস্বাভাবিক' লেগেছে। তাঁর মতে, উপন্যাস রচনার পক্ষে সবচেয়ে স্বচ্ছল পদ্ধতি হল লেখক যেখানে সর্বগ, সর্বজ্ঞ, স্বয়ং বিশ্ববিধাতার অনুকারক। আর উপন্যাসের এই বৃহত্ত্বের, এই সমগ্রতার স্বাদ দিতে হলে লেখকের পক্ষে কোনো একটি বা বিশেষ কোনো চরিত্রের শরীরে আবদ্ধ না থেকে স্বাধীন অদেহী দ্রষ্টা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের দুটি বই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম– *চতুরঙ্গ* ও *ঘরে-বাইরে*।[৫২] উপন্যাস দুটির সাংগঠনিক প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে ভাষাগুবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন সমালোচক। *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) সাধুভাষায় রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস, *ঘরে-বাইরে* চলিত ভাষায় প্রথম। তবে বুদ্ধদেবের মতে :

- *চতুরঙ্গের* সাধুভাষায় চলতিভাষার অনেক গুণই বর্তমান, অপরদিকে *ঘরে-বাইরের* চলতিভাষা অনেকাংশেই সাধুভাষা।
- ক্রিয়াপদ বদলে দিলে সাধুভাষা চলিত ভাষায় পরিণত হয়– এ ধারণা তৎকালে চলিতভাষায় অনুরাগীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের মতে, এটা দৃষ্টির ভুল। ক্রিয়াপদ বদলানো, বঙ্কিমি ভাষার পরিবেশন বা চলিত ভাষার শৈশবদশার লক্ষণ থেকে *ঘরে-বাইরে* একেবারে মুক্ত নয় বলে মনে করেন তিনি। অথচ *চতুরঙ্গ* সংলাপসুদ্ধু সাধুভাষায় লেখা। কিন্তু তার

বিন্যাস এমন সংযত, আর ভঙ্গি এত সহজ যে পুরো বইটি পড়ে ওঠার পর হঠাৎ যেন সবিস্ময়ে উপলব্ধি করতে হয় যে ওটা সাধুভাষা । 'চলতি ভাষার আত্মিক গুণ রবীন্দ্রনাথ এতে সঞ্চারিত করেছেন, শুধু চেহারাটা রেখেছেন সাধুভাষার।'[৫৩] তাছাড়া *চতুরঙ্গ* প্রথম বাংলা বই; যেটি ক্রিয়াপদের সংখ্যাহ্রাসের দিকে স্পষ্টত উন্মুখ। *চতুরঙ্গের* ভাষার গুণ হচ্ছে সংহতি, বিপরীত গুণ উচ্ছলতার উদাহরণ *ঘরে-বাইরে*। বুদ্ধদেবের মতে, "*ঘরে-বাইরের* ভাষায় কিছু আতিশয্য আছে। ...অলংকারের এমন প্রাচুর্য যে, কথাগুলি প্রায়ই বক্তৃতা ঢঙের হয়ে পড়ে; অপ্রশংসার অর্থে rhetorical।"[৫৪] *ঘরে-বাইরের* বাক্যিক সংগঠন নিয়েও সূক্ষ্ম প্রাকরণিক বিচার করেছেন সমালোচক বুদ্ধদেব। 'উপমার অন্ত নেই, অন্ত নেই কারুকর্মের। বাক্যগুলি প্রায়ই বহু অংশে গাঁথা কিংবা দুটি বিপরীত ভাবের প্রতিঘাতে উদ্বেল।'[৫৫] তবে এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও *ঘরে-বাইরেকে* আধুনিক বাংলা গদ্যের একটি উৎস বলে মনে করেন সমালোচক; মনে করেন বিপ্লবও।

চতুরঙ্গ ও *ঘরে-বাইরে* বিষয়ক বুদ্ধদেবীয় সমালোচনার পুরোটাই উপন্যাস দুটির ভাষাকেন্দ্রিক। এদিক থেকে একে উপন্যাসের রূপবাদী/প্রকরণবাদী বিচার বলে অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্র-উপন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে প্রকরণের এরূপ বিশ্লেষণ এই প্রথম বলে মনে করেন অনেক সমালোচক।[৫৬] *চতুরঙ্গে* প্রকাশিত তৎকালীন সময়ের সমাজ-অভিজ্ঞতা কিংবা রবীন্দ্র-দর্শন এবং *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক তত্ত্ব তথা বিশ শতকের প্রথম পাদের স্বদেশী আন্দোলন উপন্যাসদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে। তবে শিল্পমূল্য বিবেচনায় বুদ্ধদেব দুটো উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তুলনামূলক বিচারে বেছে নিয়েছেন আঙ্গিক। সমালোচক তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার অভ্যাসে উপন্যাসের বিষয়বস্তু তথা সমাজতাত্ত্বিক বিচার হয়ত এড়িয়ে গেছেন। তবে মূলত প্রকরণগত সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য দেখাবার জন্যেই *চতুরঙ্গ* ও *ঘরে-বাইরে* বুদ্ধদেব কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে।

১.৪

আধুনিকতাবাদীদের দ্বারা আখ্যায়িত 'রবীন্দ্রযুগ' কখনও নিজেই গতিশীল এবং পরিবর্তমান হয়েছে; *শেষের কবিতায়* (১৯২৯) রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মূর্তির প্রকাশ থেকে সমকালে বুদ্ধদেবের তা-ই মনে হয়েছে বলে জানাচ্ছেন তিনি। বারবার যিনি নবজাত, প্রায় সত্তর বছর বয়সে *শেষের কবিতার* মধ্য দিয়ে আবার তাঁর এক নতুন জন্ম। কিন্তু উপন্যাসটি সম্পর্কে উদ্বেলিত এই বিশ্বাস বরাবর একইরকম থাকেনি সমালোচকের; সংশয়ে পীড়িত হয়েছেন তিনি। উপন্যাসের সংগঠন,

বিশেষত ভাষা-বিন্যাসই এর কারণ। *শেষের কবিতা*র সমালোচনা প্রায় পুরোটাই এ উপন্যাসের ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, প্রায় কোনো চরিত্রেরই বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় প্রবৃত্ত নন সমালোচক।

মধ্যবিত্তসমাজের অতি রোমান্টিক এক তরুণের প্রেমভাবনা বিষয়ক দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' যুগের যে অনুপ্রেরণাতেই লিখে থাকেন না কেন, বুদ্ধদেবের মতে, সে সময়ে তরুণ লেখকেরা যা চেয়েছিল, 'যা না-হলে বাংলা সাহিত্যের আর চলছিলো না সেই দাবিরই কিছু-কিছু শর্ত *শেষের কবিতা* পূরণ করেছিলো।'[৫৭] এছাড়া সমকালে *শেষের কবিতা* যে কারণে সবার মনে চমক সৃষ্টি করেছিল তা হল এর 'গতিশীল দ্যুতিময় ভাষা।' বুদ্ধদেবের মতে, *শেষের কবিতা* শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাষারই জন্য। আর এর পেছনে অনিবার্যরূপে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব। এমনকি কবিত্বের ঐশ্বর্যের এক অপব্যবহার যেন এ উপন্যাস। 'কবিতা লেখার ইচ্ছাকে বৈধ উপায়ে তৃপ্ত করতে পেরেও'[৫৮] ভাষার মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সাধারণ সাংসারিক প্রয়োগে (বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে) যা অনেকটাই দুঃসহ ভেবেছেন বুদ্ধদেব। ঘরোয়া কথার হুবহু অনুকৃতি অসম্ভব এবং ভালো করে বলতে না-পারা নিজেদের মনের কথা শিল্পী যে আমাদের হয়ে বলে দেন, এটা সত্যি হলেও ভাষার সেইসব কিছু অংশে রবীন্দ্রনাথ নিন্দুকের দাঁড়াবার জায়গা করে দিয়েছেন– এ উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন এরকম। তাছাড়া সাহিত্যকলা জীবনের অনুকরণ করে না, জীবনের একটি প্রতিরূপ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করে চলে, একথা শুধু, ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সত্য। এ পর্যায়ে বুদ্ধদেব নিজের বিরোধিতার জবাব নিজেই তৈরি করেন এই বলে যে, জীবনে ঠিক যে রকমটি হয় না, অথচ হতে পারে– শিল্পকলা সেই সম্ভাবনার বিবরণ বলেই তার আকর্ষণ আমদের কাছে জীবনের চেয়েও প্রবল। অতএব, একথা বলে আপত্তি করলে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রী রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলে, সেটাকে রচনার একটা রীতি হিসেবেই মেনে নিতে হবে।[৫৯] কিন্তু অমিত রায়ের মতো চমকপ্রদ কথাসর্বস্ব নায়কের জন্যেই *শেষের কবিতা* অপরাধী; তার অন্তঃসারশূন্যতা, বাগ্মিতার ফাঁপা আওয়াজ, তার নাবালক চরিত্র নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের ভুল রয়েছে বলে মনে করেন বুদ্ধদেব। কেবল তা-ই নয়, উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রেরাও শেষতক সাজানো পুতুলে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসের সংলাপ দুষ্য হয়েছে এ কারণে যে, 'এতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাষা ব্যবহার করেন নি, প্রায় সকলের মুখেই অমিত রায়ের বুলি বসিয়েছেন।'[৬০]

চরিত্র বিচারে সমালোচকের মনে হয়– এ বইতে লেখক যাদের পক্ষপাতী, তারা চরিত্র হিসেবে নিস্তেজ, যারা বিদ্রূপের বিষয় তাদেরই আমরা ভুলতে পারি না। যেমন– লাবণ্যর চেয়ে কেটি অনেক জীবন্ত; শোভনলালের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল সংলাপহীন নরেন মিত্র। তবে বুদ্ধদেবের কাছে লাবণ্য উজ্জ্বল ও সম্পূর্ণ। তার স্থির, মননশীল গম্ভীর প্রকৃতির পরিচয় আছে গল্পে, কিন্তু তার স্বভাব দ্বিধা-বিখণ্ডিত হয়নি তা বলা যাবে না, বুদ্ধদেবের চোখে লাবণ্য চরিত্রের শুরু ও শেষ ধরা পড়েছে এভাবে :

> ...অধ্যাপনার কাজে শান্তভাবে তার ঔৎসুক্যহীন জীবন সমান ছন্দে বয়ে চলছিল। হৃদয়ের নিভৃতে তার ঢাকা ছিল শোভনলালের সঙ্গে অসমাপ্ত বন্ধুত্বের একটি কাহিনী। ...এমন সময় লাবণ্যের সমস্ত জীবন আলোড়িত করে দেখা দিল অমিত রায়, সাড়া দিল তার সর্বস্ব চেতনা, প্রেমের সূর্য উঠল হৃদয়ে। ...কিন্তু সে হৃদয়মনের চরম আনন্দের সমস্ত আচ্ছন্নতাকে অতিক্রম করেই বুঝতে পারল যে অমিত রায় ঘরে বাঁধা পড়বার ছেলে নয়, আলো জ্বালিয়ে চলে যাওয়াই তার স্বভাব। আগে ছিল তার সিসি, লিসি, লিলি গাঙ্গুলি– সবাইকে নিয়ে সে খানিকটা খেলেছে, মানসমূর্তি গড়েছে, নিজেকে নানাজনের চোখে নানা রঙা করে জেনেছে, জানিয়েছে। অমিত রায়ের পক্ষেও লাবণ্য পরম ও চরম আবির্ভাব, তারই সঙ্গে তার আন্তরিক প্রেমের যোগ, কিন্তু লাবণ্যকে ভালবেসে সে নিজেকেই আরো বেশি করে পেয়েছে; সেইটেই তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা।[৬১]

সুতরাং অমিতের সাথে লাবণ্য সংসারের মাটির ঘরে প্রাত্যহিক সান্নিধ্য গড়তে সাহস পেলনা, বুদ্ধদেব এটাকে দুর্বলতা ভেবে নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'দুরে চলে গিয়ে সে তার প্রেমাভিষিক্ত হৃদয়ের কোমলতাকেই প্রকাশ করল। ...এছাড়া ''তার হৃদয়-জ্বলা আগুন দিয়ে সে বাঁধন-ছেঁড়া আর্টিস্টকে বন্ধনমোচনের আনন্দ দিল, হয়তো সংসারের দায়িত্ব নেবার শক্তিও দিল প্রেমাস্পদকে।'[৬২]

ঘরে-বাইরে উপন্যাসের সাথে *শেষের কবিতার* ভাষাগত একটা প্রতিতুলনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, যেহেতু *ঘরে-বাইরে* চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে বিতর্কের যখন আরম্ভ, সে সময়ে *চতুরঙ্গ* ও *ঘরে-বাইরে* লেখা হয়েছিল। তবে 'সবুজপত্র' বা অন্যান্য কারণে নয়, চলিত ভাষা ব্যবহারের এই বিপ্লবের বীজ রবীন্দ্রনাথ নিজেই বহন করেছিলেন বলে মনে করেন সমালোচক। *চতুরঙ্গ* সংলাপসুদ্ধু সাধুভাষায় লেখা হলেও এর বিন্যাস অনেক সংযত, বলা যায় চলতি ভাষার আত্মিক গুণ রবীন্দ্রনাথ এতে সঞ্চারিত করেছেন, শুধু চেহারাটা রেখেছেন সাধুভাষার। *ঘরে-বাইরের* ভাষা চলতি, কিন্ত ঐ গ্রন্থের বাণীবিলাস গদ্যের পক্ষে উপযোগী হয়নি। আর *শেষের কবিতায়* আতিশয্য ভিন্ন রকমের। এতে রয়েছে কবিত্বের অপপ্রয়োগ। তবে বুদ্ধদেবের ধারণা, 'এই কবিতার জন্য *শেষের কবিতার* সমাপ্তিটুকু অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, এর নায়ক আর সেই সঙ্গে

তার প্রেমের কাহিনী, প্রথমে মুগ্ধতা এনেও ক্রমশ যখন শুকিয়ে যেতে থাকে, তখন আমাদের পুঞ্জিত অতৃপ্তির উপশমের জন্য ঐ সব-শেষের কবিতাটি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাই না। ...রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা কথাসাহিত্যে তাঁর কী-রকম সহায় হয়েছে, এটি তার একটি আক্ষরিক উদাহরণ।'[৬৩] সব মিলিয়ে এটি একটি 'কাব্যোন্মাদ কাহিনী।'

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত মূলত কলকাতা শহর, চরিত্রসমূহ শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্ন্তগত। সমাজ চিন্তাধারার সূক্ষ্মতা, জটিলতাজাত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ট্রাজেডি বা রোমান্টিক দোদুল্যমান জীবনার্থের যন্ত্রণা ও বিরুদ্ধ সময়তাড়িত আত্মবিনাশী মানুষের উচ্চারণ *শেষের কবিতায়* উপস্থাপিত। জীবনসংঘাত, ইচ্ছা ও আদর্শবৈপরীত্যের ফলে বিভ্রান্ত মনের আচরণ সংবলিত একটি সমাজসম্ভব সমালোচনা কিংবা ব্যাখ্যা বুদ্ধদেবের কাছে আশা করা যেত। কিন্তু তা তিনি করেননি। অমিত রায়ের ক্ষেত্রেও এই মূল্যায়ন চলতে পারে যে, 'রোমান্সের পরমগুহ্যংস সে, অতীতের অভ্যাস থেকে বিবর্তিত হয়ে তার মন চলে নতুন আবেগে। নতুন অভিজ্ঞতায় তরঙ্গিত স্পন্দিত নতুন আবেগে সে প্রবর্তনা পায় সৃষ্টির আনন্দের। এ নতুনত্বেরই জীবনাগ্রহে অমিত রায় নির্দ্বিধায় স্পর্শ করতে চায় জীবনের ক্রম-অগ্রসরমান মুহূর্তগুলিকে।'[৬৪] বুদ্ধদেবের মতে, অমিত রায় জিতেছে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের জোরে; কিন্তু সংলাপের বাহ্য জৌলুস এড়িয়ে অমিতের জীবনদর্শনের গভীরতার প্রতি বুদ্ধদেবের দৃষ্টি সেভাবে পড়েনি, আর "সেদিকে দৃষ্টি না দিলে *শেষের কবিতার* অন্তঃস্থ কাব্যালোচনা এবং রবিঠাকুরের প্রতি বিদ্রূপের তাৎপর্য, অমিত চরিত্রের সঙ্গে কোনো ভাবগত ঐক্য আনতে পারে না' এ জাতীয় বুদ্ধদেবীয় ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক।"[৬৫]

১.৫

চতুরঙ্গ ও *ঘরে-বাইরের* মতো *দুই বোন* (১৯৩৩) ও *মালঞ্চ* (১৯৩৪) তুলনামূলক আলোচনা। প্রথমোক্ত উপন্যাস দুটির তুলনার সূত্র আঙ্গিক; পরের দুটি মূলত বিষয়বস্তু ও কিছু অংশে আঙ্গিক মিলিয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। দুটো উপন্যাসের রচনাকাল বিশ শতকের চতুর্থ দশক। উপন্যাস দুটির তুলনামূলক বিচারে প্রথমেই বুদ্ধদেব বসু এদের বিষয়বস্তুগত যেসব সাদৃশ্য খুঁজে পান তা হল; "(উপন্যাস দুটির) রচনাকালের ব্যবধান অত্যল্প। আর কাহিনীর বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই 'অবৈধ' প্রেম, বিবাহিত পুরুষের প্রাণে নূতন প্রণয়ের আবির্ভাব এবং উভয় ক্ষেত্রেই খণ্ডিতা নায়িকা সন্তানহীনা ও কঠিন রোগশয্যাশায়িনী। প্রণয়পাত্রীও উভয় স্থলে আত্মীয়া ...দুই গল্পেই কাছে পাওয়াটা ঘটেছে স্ত্রীর পীড়াকে উপলক্ষ করেই। ...একটু তফাৎ এই যে *দুই বোনের* রচনা কিঞ্চিত বিস্তারিত–

ঊর্মির পাণিপ্রার্থী নীরদ মাঝখানে এসে পড়ে একটু বৈচিত্র্য ঘটায়, আর *মালঞ্চ* অতিশয় সংক্ষিপ্ত, তাতে ত্রিভুজ-প্রণয়ের তিনটিই কুশীলব ছাড়া আর কারো প্রায় অস্তিত্বই নেই। উপসংহার কোনোটিই সুখের নয়– এ ধরনের গল্পে তা হতেও পারে না।"[৬৬] এ ধরনের দাম্পত্য জটিলতা বিষয়ক গল্প রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'ও আছে, আছে *ঘরে-বাইরে*, *চোখের বালিতে*। তবে জীবনের শেষ পর্বে একই সময়ে একই বিষয়কে পর পর দুটো গল্পে রূপ দেওয়াতে কিছুটা বিস্মিত সমালোচক; কারণ হিসেবে বলেন, "মনে হয়, সাহিত্যের উপাদান হিসেবে সে-সময়ে এই বিষয়টি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলো। বিষয়টি পুরোনো এবং চিরনূতন: এর মধ্যে মানুষের মনটাকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখাবার প্রচুর অবকাশ আছে বলে, যুগে-যুগে কথকের কাছে এর আকর্ষণ অক্ষয়।"[৬৭]

উপন্যাসের সাংগঠনিক দিকের আলোচনায় বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন যৌক্তিক বলেই মনে হয়। *মালঞ্চে* সাংগঠনিক সংগতি নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন সমালোচক। কারণ, উপন্যাসের নাটকীয়তা। তা দোষের নয় বটে; তবে এ পর্যায়ে এই ধরনের নাটকীয়তা চরিত্রের মানসক্রিয়া উদ্‌ঘাটনের প্রতিবন্ধক হয়েছে। তাই বিষয়ের সম্ভাব্যতার যৌক্তিক বিচারও হয় বাধাগ্রস্ত। সমালোচকের মতে, মানসিক যে দ্বন্দ্ব কিংবা অন্তর্সংঘাত চরিত্রের ক্রিয়াকে পরিস্ফূট করে তোলে, চরিত্র যে কারণে হয় বাস্তবসম্মত ও সজীব; *মালঞ্চে* রবীন্দ্রনাথের ভাষার কারিগরি সত্ত্বেও সে গুণের অভাবে কাহিনী ও চরিত্র বিষয়ে পাঠকের সংশয় থেকে যায়, পদে পদে উদ্রেক হয় জিজ্ঞাসার। নীরজা চরিত্রের পরিণতি একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি সমালোচক। সরলার প্রতি আদিত্যের কারণহীন (অর্থাৎ উপন্যাসে অপ্রকাশিত কারণ) ও নির্দ্বন্দ্ব প্রেম অযৌক্তিক। হৃদয়বৃত্তির খাতিরে একজন নিরপরাধ মানুষকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক, বুদ্ধদেবের চোখে নীরজা চরিত্র সেই 'উৎকট অবিচারের দৃষ্টান্তস্থল।' এ যেন শিল্পীর নির্মমতা। এছাড়া নীরজার মৃত্যু দৃশ্যে ট্রাজেডির তীব্রতা নেই, করুণ রসের স্নিগ্ধতা নেই, পাঠকের মন কোনোদিক থেকেই বিক্ষোভ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়না।[৬৮] পরিণতির এই জায়গাটিতে সমালোচকের আপত্তি নৈতিক বা সামাজিক নয় বলে জানান তিনি, আপত্তি মূলত নীরজা– আদিত্যের দশ বছরের সুখী নিস্তরঙ্গ জীবন ও আদিত্য-সরলার ভালোবাসার দুর্বল ভিত্তি; সেই সাথে প্রচণ্ডতা কিংবা ক্রমবিকাশের শক্তির অভাব। অর্থাৎ, যেন জোর করে কিছু একটা ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে এখানে। কলম এখানে যেন তা-ই লিখে গেছে, 'ঔপন্যাসিকের মনের যাতে সম্মতি নেই।'[৬৯] *দুই বোন* উপন্যাসেও শশাঙ্ক-ঊর্মির প্রণয়-গতি নির্দ্বান্দ্বিক ও মসৃণ। বাইরের জগতের সঙ্গে নয়, নিজেরই অন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত উক্ত চরিত্রদুটির পক্ষে অনিবার্য ছিল, বুদ্ধদেবের মতে, সেটাই দ্রষ্টা লেখকের প্রধান

উপাদান এবং *দুই বোনে* এবং *মালঞ্চে*– এই দ্বন্দ্ব যথাযথরূপে চিত্রিত হলে কাহিনীর আন্তরিক রস গাঢ় হতো।[৭০]

তবে *দুই বোন*, *মালঞ্চের* চেয়েও প্রাণবন্ত, কেননা আদিত্য-সরলার প্রণয়োদ্গম একেবারে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু শশাঙ্ক-ঊর্মিমালার ভালোবাসার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রস্তুত করেছেন। প্রেমের জন্যে ঊর্মিমালার মনের ব্যাকুলতা ছিল, আর শশাঙ্কও শ্যালিকার প্রতি অনুরাগী, স্ত্রীর কাছে সেবা-যত্ন কল্যাণ সে পেয়েছে কিন্তু ঊর্মির কাছে পেল হ্লাদিনী শক্তি। তবে শশাঙ্ক দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, তাকে রবীন্দ্রনাথ দুর্বল করেই দেখেছেন ও এঁকেছেন, তার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে বলে ভাবা যায় না; বরং 'তাকে অনেকখানি ঠাট্টাই করেছেন তিনি– অবশ্য খুব সূক্ষ্ম ঠাট্টা।'[৭১] আর শশাঙ্কের প্রতি এই ঠাট্টার আভাসেই *দুই বোন* প্রাণবন্ত হতে পেয়েছে বলে বুদ্ধদেব মনে করেন। *দুই বোনের* পরিসমাপ্তি যেভাবে ঘটানো হয়েছে তাতে এ উপন্যাসের দুর্বলতা নিহিত এটি বুদ্ধদেবের মতো পরবর্তীকালের সমালোচকেরও মত। অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার প্রবর্তনায় মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতাসমূহের যে সন্ধানে *দুই বোন* রচিত; সমাপ্তির কারণে সেই অনুসন্ধান ব্যাহত হয়েছে, বুদ্ধদেবের সমালোচনায় একথা স্পষ্ট। *মালঞ্চের* নীরজা চরিত্র নির্মাণে শিল্পীর নির্মমতা বিষয়ে অনেক সমালোচকের ঐকমত্য আছে। শেষাংশে নীরজার মৃত্যু ও সংলাপ অতিনাটকীয়তার পর্যায়ে পড়ে। 'বিবর্ণ, ধূসর বিক্ষোভেই *মালঞ্চের* পরিসমাপ্তি ঘটেছে' বলে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেছেন। তবে 'জীবনযন্ত্রণার অগ্ন্যুৎপাতে দ্বন্দ্বের তীব্রতায় সর্বোপরি জীবনতৃষ্ণার বাস্তবিক উদ্‌ভ্রান্ত একটি চরিত্রচিত্রণে *মালঞ্চ* রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।'[৭২]

দুই বোন ও *মালঞ্চ* বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর বিচার মূলত বিবাহিত পুরুষের প্রাণে নতুন প্রণয়ের সূত্র ধরে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনদর্শন কিংবা উপন্যসে প্রতিফলিত বিষয়বস্তু ও ঔপন্যাসিকের মূল্যবোধ নিয়ে সমালোচকের আপত্তি নেই। বক্তব্যের প্রকাশরীতি, চরিত্রের গঠন এককথায় উপন্যাসের সংগঠন এর শিল্পসুমিতি অক্ষুন্ন রেখেছে কি না– রূপশিল্পের সন্ধানী সমালোচক দৃষ্টি দেন সেদিকেই। বিষয়বস্তুর রূপায়ণ চরিত্রায়ণ কৌশল, ভাষা ও সংলাপের দীর্ঘ ও প্রায় অপরিবর্তনীয় সফলতা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আয়াসসাধ্য। উক্ত উপন্যাসকর্মের শিল্পরীতির ত্রুটি নির্দেশ; তার কার্যকারণ সূত্র বিশ্লেষণ কিংবা সার্থকতার দিকটি পরিস্ফূট করে বুদ্ধদেব সাহিত্য সমালোচকেরই দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন।

১.৬

ঘরে-বাইরে কিংবা *চতুরঙ্গ* থেকেই রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে যে 'অ-সাধারণতার আরম্ভ', *শেষের কবিতায়* যার পূর্ণ বিকাশ; রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস *চার অধ্যায়*ও (১৯৩৪) 'সেই অবিশ্রান্ত, অনর্গল কথায় পূর্ণ।' ঘটনার সংঘাত, চরিত্রের ব্যঞ্জনা এবং ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের দ্বন্দ্ব সবই প্রকাশ পেয়েছে; তবে তা মুখের কথায়। বুদ্ধদেবের মতে, পাত্রপাত্রীরা যেভাবে 'জাদুকরী' ভাষায় কথা বলে, তা মুগ্ধ করে দেয় সত্য, কিন্তু সে মুগ্ধতা বক্তার সঙ্গে উক্তির ব্যবধান ভোলাতে পারে না। অর্থাৎ উপন্যাসের সকল শ্রেণীর চরিত্র প্রায় একইভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলে, এমনকী 'বটু' বা 'অখিল' পর্যন্ত। শব্দবিন্যাসের কিংবা সংলাপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গৌরব স্বতঃসিদ্ধ; তবু এটাকে বাস্তবের ব্যতিক্রম বলেই মনে হয় বুদ্ধদেবের। আর এই ব্যতিক্রম কেবল সংলাপের ক্ষেত্রে নয়, কিছু অংশে ঘটনার পটেও। অর্থাৎ 'বাস্তবোচিত নয় এমন কিছু অংশ *চার অধ্যায়ে* আছে, তা জনশ্রুতি ও কল্পনা মেশানো।'[৭৩] *চার অধ্যায়ের* নানা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের চেতন মন অতীন্দ্রের পরিবেশকে একেবাওে মাটির স্তরে নামিয়ে আনতে চাইলেও 'রূপতা, মলিনতা রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, তাঁর মনের বিকিরণ বর্ণিত দারিদ্র্যকেও কমনীয় করে তুলেছে।'

চার অধ্যায়ের সাংগঠনিক প্রকৃতি বিবেচনায় বুদ্ধদেবের মত– "এর আকৃতি নাটকের মতো, 'রাষ্ট্রবৈপ্লবিক রোমান্সে' নাটকীয় উপাদানও এতে প্রচুর এমনকি কোথাও-কোথাও মেলোড্রামার চড়া গলাও শোনা যায়। তবু এর আত্মা নাটকের নয়, উপন্যাসের নয়, গীতিকবিতার।"[৭৪] এ যেন গদ্যকাহিনীর ছলে লিরিকের তীব্রতায় পূর্ণ। এলা-অন্তুর ভালোবাসার তীব্রতাই সেই লিরিক বা গ্রন্থের প্রাণকেন্দ্র। তাই কাব্য হিসেবে দেখলেই এর প্রতি সঠিক বিচার হতে পারে বলে সমালোচকের মনে হয়েছে।[৭৫] বাংলার সন্ত্রাসবাদের রক্তবর্ণ পটভূমিকায় দু'টি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উন্মীলন ও আত্মঘাতী পরিণতি, *চার অধ্যায়ের* বিষয়বস্তু এই-ই। বুদ্ধদেবের মতে, সন্ত্রাসবাদ রবীন্দ্রনাথের বিষয় নয়, পটভূমি মাত্র। 'এর নৈতিক বা রাজনৈতিক দিকে তাঁর ততটুকুই কৌতূহল, যতটুকু অতীনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক; তবে বিভীষিকার রক্তরেখা যেখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে, তাও শুধু অতীনের ধ্বংসের পথটিকেই লাল তীরের মতো এঁকে এঁকে দিচ্ছে আমাদের চোখের সামনে।'[৭৬]

রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি প্রকৃতির দিক থেকে নানাভাবে আখ্যায়িত হয়েছে। কেউ বলেছেন এটি তত্ত্বপ্রচারমূলক, আবার কেউ বলেছেন, এতে বিপ্লববাদের বীভৎস, কলঙ্ক-চিত্র দেওয়া হয়েছে, প্রেমের সাথে যার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কল্পনা করা অসম্ভব।[৭৭] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নিয়েই বিতর্ক, তা

বিপ্লববাদের স্বরূপ অঙ্কন করেছে, না এলা-অন্তুর পরস্পরের প্রেমের জটিলতা ও তার আত্মবিনাশী পরিণামকে নির্দেশ করেছে; তর্কের সূত্রপাত এখানে। তবে অনেকের মতো বুদ্ধদেবও এ ব্যাপারে একমত যে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন *চার অধ্যায়ের* বক্তব্যবিষয় নয়, পটভূমি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য থেকেও তা জানা যেতে পারে :

> 'চার অধ্যায়ে'র রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে তর্ক সাহিত্য বিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোন আধুনিক বাঙালি নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস ...এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়।[৭৮]

চার অধ্যায়ের ঘটনা বা কাহিনীর সংগঠনের বিষয়ে বুদ্ধদেব যা বলেছেন, তা অধিকাংশ রবীন্দ্র-সমালোচকের বক্তব্যকে সমর্থন করে। প্রথমত, এলা-অন্তুর সংলাপের মধ্য দিয়েই সমস্ত গল্পটাকে বলবার প্রয়াসে *চার অধ্যায়ের* গঠনে কিছুটা বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করেছে বলে বুদ্ধদেব মনে করেন। অর্থাৎ দুজনের সংলাপের ভেতরই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের সমুদয় পরিবেশ, ইতিবৃত্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, *চার অধ্যায়ের* প্রায় সমস্ত দোষের কারণই এই যে, তার দেহটা উপন্যাসের হলেও আত্মা কবিতার। এর কবিত্বগুণের কারণেই উপন্যাসটি পাঠযোগ্য এবং পৌনঃপুনিক পাঠযোগ্য হতে পেরেছে বলে ভাবলেও বিপরীতক্রমে বুদ্ধদেব এও মনে করেন যে উপন্যাসের পক্ষে যেসব উপকরণ অপরিহার্য, সেগুলো এর মধ্যে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়নি। সে চেষ্টা করতে গিয়ে কাব্যরস ক্ষুন্ন হয়েছে। অথচ কবিসত্তা নিয়ন্ত্রণে রেখে গদ্যশিল্পীর বা ঔপন্যাসিকের পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন সেও সমান সত্য। উত্তর-রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে (*চতুরঙ্গ-চার অধ্যায়*) পর্যন্ত যে-সব চরিত্র বা 'বাণীসিদ্ধ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আত্মসচেতন, অসামান্য মানুষের ভিড়, তারা সুখ-দুঃখ দ্বারা শুধু আন্দোলিত হয় না, সেই অনুভূতিগুলোকে বিশ্লেষণও করে এবং ভাষাতেও র্মূত করে তোলে।'[৭৯] এটা তাঁর কবিসত্তারই কাছে তাঁর অন্যান্য ক্ষমতার পরাভব বলে মনে করে বুদ্ধদেব। অতীন্দ্র প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের সমালোচনা এগিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা কিংবা উত্তর রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের নব অভিযাত্রা সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে। "অতীন্দ্র নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী, নিজেই নিজের শত্রু ও ঘাতক। স্বভাবতই সাহিত্যিক সে, স্বভাবত অভিজাত, রাজনৈতিক গুপ্ত চক্রান্তের আবর্তে পড়ে স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হলো, বরণ করে নিলো 'জীবিকাবর্জনের দুঃখ'; 'নিজের স্বভাবকেই হত্যা' করে 'সব হত্যার চেয়ে পাপ' করলো। ট্রাজেডির উপাদান আছে এতে, কেননা এই সচেতন আত্মবিনাশের মূলে দেশপ্রেম

নয়, আছে যৌনপ্রেম, বিদেশী শাসন ধ্বংস করার পণ নয়, প্রেমাস্পদার কাছে ভালোবাসার প্রমাণ দেবার প্রতিজ্ঞা।"[৮০] ভালবাসার বর্বর দিক, এর উন্মত্ততা, সর্বনাশ ইত্যাদিও যেন *চার অধ্যায়ে* মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মানব-দর্শন, মানব-ভাবনার কিছু অংশ *চার অধ্যায়ে* প্রকাশিত। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, যা বাংলার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, রবীন্দ্রনাথ যেটাকে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে পর্যন্ত নির্বাচন করেছেন, সময়ের তাগিদে সেই বিপ্লবের প্রশ্নেও দেখা যাচ্ছে– মানুষকে তার আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব বলে গণ্য করা ও শ্রদ্ধা করা-ই ব্রত বলে মনে হয়েছে ঔপন্যাসিকের। বিপ্লবী মন্ত্রের ফল যদি আত্মশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীন পুতুল নাচে গড়ায়, তা হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সে কারণেই অতীন্দ্র এলাকে বলে :

> আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিলে?[৮১]

আবার ইন্দ্রনাথের কাছে গোলামী-চাপা খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মত মরতে পারাও সম্মানের । তাই বিদেশী রাজত্ব ভেতর থেকে যে আত্মলোপ করছে– এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করেই নিজের মানবস্বভাবকে স্বীকার করে ইন্দ্রনাথ। নিজেকে 'ইম্পার্সোন্যাল' বলে দাবি করে বলে, "দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক ঊর্ধ্বে– আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"[৮২]

অতীন্দ্র এলাকে আরো বলেছিল:

> আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে– তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকা। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। ...দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যা কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে; তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধারের চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা।[৮৩]

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম বা মনুষ্যত্ব বিষয়ক চিন্তা সাময়িকতার প্রয়োজনে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োগ ও বিপ্লবের প্রশ্নে এভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। মহত্তম মানবীয় শুদ্ধির এই চিন্তা সত্যিকার রাজনৈতিক বিপ্লবের ভিত্তি হতে পারে। বুদ্ধদেব অতীন্দ্রের স্বভাব বিশ্লেষণে তাকে অসামান্য (কিছুটা অর্থে ইম্পারসোনাল) হিসেবে

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার প্রতি অবশ্য ইঙ্গিত করেছেন, তবে চরিত্রের সজীবতা, জীবন্ত রূপ কিংবা সক্রিয় বিকাশশীল চরিত্র হিসেবে অন্তর রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতা-ই দেখিয়েছেন তিনি। দেশ বা বিপ্লব ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তিনি গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেননি।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিচারে বুদ্ধদেব তাঁর নিজস্ব উপন্যাস বিষয়ক মত ও রূপাদর্শও তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, আলোচিত হয় রবীন্দ্র-গদ্যের বিবর্তনধারা, বাংলা উপন্যাসের বিশেষত বঙ্কিমের রূপাদর্শের প্রভাব ও তা উত্তরণের গতিপথ। পর্যালোচিত হয়েছে প্লট ও থীম বিষয়ক তত্ত্বও। *চোখের বালি* ও *নৌকাডুবি* তাঁর অপছন্দ তা বঙ্কিমী-রীতির অনুসারী বলে। *গোরার* শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে 'সবুজ পত্র'-পরবর্তী রবীন্দ্র উপন্যাসগুলোকে তিনি বিবেচনা করেন প্লট ও ভাষার ভিত্তিতে। একথা স্বীকৃত যে রবীন্দ্রনাথই বাংলা উপন্যাসে চরিত্র নয়, ব্যক্তিত্ব ও মনস্তত্ত্বকে নির্মাণ করেন। এতে তাঁর কবিত্ব যেমন স্ফূর্তি লাভ করেছে তেমনি প্রথাগত প্লটের দাসত্বও অতিক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গত অর্থেই বুদ্ধদেব 'কাহিনী ও রচনা' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন দুইয়ের পার্থক্য- 'প্লট নির্বীজ, একান্তরূপে নিজের মধ্যেই আবদ্ধ, আর তা একবারই জন্মায়, যা একেবারেই লেখক-অঙ্গীভূত।' কিন্তু থীম 'রক্তবীজ-রক্তবান'- যা বহু উৎসারণ ঘটায়। বুদ্ধদেবের মতে, রবীন্দ্রনাথ প্লটে মনস্বিতা যুক্ত করেন (যেমন *গোরা*), ক্রমে চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অনুগামী হন। আর প্লট গৌণ করে রূপগঠন নিয়ে নিরীক্ষা শুরু হয় *চতুরঙ্গ* থেকে। 'আমাদের জীবন যেহেতু ঘটনা ও বৈচিত্র্যহীন তাই মনস্তত্ত্বই উপন্যাসকে বহুত্ববাদী করে তুলতে পারে। একইসঙ্গে প্লটের দীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে প্রকরণের ও ভাষা কারুময়তা নিয়ে নানা নিরীক্ষা।' উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর অভিমতগুলিও ব্যক্ত হয়েছে *গোরা* উপন্যাসের আলোচনায়। 'প্লটের মৃত্যু'-জাতীয় অধুনা যে ধারণা তা রবীন্দ্র কথাশিল্পের মূল অভিপ্রায় কি-না তা নতুন করে ভাবতে হবে।[৮৪] রবীন্দ্রনাথ প্লট গঠনে মনোযোগী, বুদ্ধদেবের মতে হয়তো *শেষের কবিতা* শিথিল রচনা, কিন্তু উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের ভিন্নতর সৃষ্টির নমুনাও বটে, *দুই বোন*, *মালঞ্চ*, এর সঙ্গে *চার অধ্যায়*কেও তিনি বলেন রূপকল্পের বিচারে অসংলগ্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'গল্পগুচ্ছ' : ভাবাদর্শ ও শিল্পরূপ অন্বেষা

ক.

কথাসাহিত্যে চলতিকালের জীবনের ছবিটা তার প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবহার্যতাকে অতিক্রম করে যায়। তবু বিষয়বস্তুর সাময়িকতার কারণেই গল্প উপন্যাসের চেয়ে কবিতার 'সর্বকালীন স্বাদুতা' বেশি। "গদ্য তার অর্থবহ বিরাট বপুটাকে টেনে-টেনে পায়ে হেঁটে চলে এবং কিছুদূর গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। কবিতা তার ছন্দের পাখায় ভর করে ইঙ্গিতময় ভাবমণ্ডলে ভ্রমণ করে চিরকালটাকে জয় করে নেয়।"[৮৫] বুদ্ধদেবের ভাবনায়, সাহিত্যের যেটা ভাবের দিক সেটা বিশেষভাবে কোনো যুগের নয়, তা সর্বযুগের। এই দিকটাতে কবিতার রাজত্ব আর অন্য দিকটায় আছে বিশেষভাবে বিশেষ কোনো যুগের সুস্পষ্ট বিশ্বাসযোগ্য আলেখ্য অঙ্কন; এটা গল্প উপন্যাসের এলাকা।[৮৬] তবে কবিতায় নিতান্ত সাময়িকতা প্রকাশ পেতে পারে না একথা মেনে নেয়া যায় না। বুদ্ধদেব অবশ্য সাহিত্যে চিরন্তনতার প্রসঙ্গে কবির চেয়ে কথাসাহিত্যিকের সিদ্ধি দুরূহ বলে মনে করেছেন, তবে চরিত্রসৃষ্টির কারণেই কথাসাহিত্যিক অনেকটা ভাবীকালের মানুষের মনে কায়েমী হতে পারে। 'গল্পগুচ্ছে'র আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যে চিরন্তনতার প্রসঙ্গে টেনেছেন রবীন্দ্রগল্পের শ্রেণীগত পরিচয় নির্ধারণের জন্যই। সমকালীনতা, দেশ-কাল-সমাজ-চিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য ইত্যাদি অতিক্রম করে জীবিত পাঠক শ্রেণীর প্রাণের মধ্যে যা প্রাণবন্ত, প্রতিদিনের জীবনের অচেতন অভিজ্ঞতার ভগ্নাংশরাশিকে বেছে গুছিয়ে সম্পূর্ণ করে মনের সচেতন স্তরে যা তুলে ধরে চিরন্তনের স্পর্শযুক্ত এই ধরনের রচনাই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটো গল্প।[৮৭] বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে 'গল্পগুচ্ছে'র বৈশিষ্ট্য বা শিল্পীমনের যে বীক্ষণ বা বিশেষ জীবনদৃষ্টি বিশেষ শিল্পস্বভাবে পরিণত হয়েছে বলে তিনি বিচার করেছেন তা কয়েকটি সূত্রে বিভাজিত হতে পারে। যেমন :

- 'গল্পগুচ্ছে' মানবজীবন বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত।
- প্রেমে লোভে ঈর্ষায় আশায় আনন্দে ত্যাগে জড়িত বিজড়িত মানবজীবনের যে একটা আদিম ছাঁচ আছে,

সেই ছাঁচ থেকেই রূপ নিচ্ছে প্রতি ব্যক্তির জীবন, প্রতি যুগের প্রবাহ, ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়। জীবনের এই আদিম ছাঁচটিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পগুচ্ছে' ধরেছেন। প্রকৃতি, যা প্রতিমুহূর্তে চোখের সামনে ছড়ানো অথচ যা কখনোই পুরোনো হয়না; এর মূলে যে অজেয় জৈব শক্তি (Vital Impulse) রয়েছে; 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলিতে যেন সেই শক্তিরই হাতের কাজ।

- রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানবজীবনের সাথে বিশ্বপ্রকৃতি জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। প্রকৃতিকে বাদ দিলে যেন এতে চিত্রিত জীবনের স্বরূপটাকেই খণ্ডিত করা হয়, বাস্তবের চিত্র সম্পূর্ণ পরিস্ফূট হতে পারে না। এককথায়, বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় মানবজীবনের আলেখ্য তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির পটভূমি 'ঘাটের কথা', 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে এভাবেই স্পষ্ট হয়েছে। বুদ্ধদেব এ দুটোকে ঠিক গল্প বলতে ইচ্ছুক নন। মানব হৃদয়ের বিরাট, কঠিন, সত্য দুঃখ সত্ত্বেও অতি বড়ো বেদনার মুহূর্তে বৈশ্বিক পটভূমিকায় তা যেন হালকা হয়ে যায়। বিরাট বহির্বিশ্বে তার কোনো চিহ্নই পড়েনা; দুঃখেরও এক বিশ্বরূপ উন্মোচিত হয় রবীন্দ্রনাথের এইসব গল্পে। গল্প হিসেবে 'মেঘ ও রৌদ্র'-এর গঠন শিথিল বলে মনে হয় বুদ্ধদেবের; তাতে কবিত্বের অংশটাই বড়ো। তাই প্রকৃতির পটভূমিকাও সফল সেখানে। 'মেঘ ও রৌদ্রে'র গিরিবালা ও শশিভূষণের মতো মানবহৃদয়ের এমনি সহজ বেদনা প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায় 'পোস্ট মাস্টার' গল্পের গ্রাম্য বালিকার। কিংবা 'এক রাত্রি', 'অতিথি', 'আপদ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'সমস্যাপূরণ' বিশেষত 'শাস্তি' গল্পের আকস্মিক অপ্রত্যাশিত হত্যাকাণ্ডের পরেই রবীন্দ্রনাথের যে বর্ণনা বুদ্ধদেবকে আকর্ষণ করেছে তা হল :

  > বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা, পাঁচ-সাত জনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে পৌছিয়াছে। হত্যার দায়ে অভিযুক্ত নিরপরাধ চন্দরাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন। ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।[৮৮]

সমগ্র 'গল্পগুচ্ছের' ভিতরে এই বিশ্বজীবনের আভাস ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো প্রকাশিত, কখনো তার ঈষৎ ছোঁওয়া লাগে, কখনো তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে হয়।[৮৯]

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প কাব্যধর্মী কিনা এ বিষয়ে সমালোচকের মতদ্বৈধ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু কাব্য ও কাহিনীর পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে, গল্প স্বভাবতই কাব্যধর্মী হতে পারে। আবার ছন্দ-মিলের সৌকর্যের জন্যই কোনো কোনো কাহিনী-আখ্যান পাঠযোগ্য হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে 'পুরাতন ভৃত্যে'র কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বুদ্ধদেবের মতে, এমনও একটা স্তর আবিষ্কার করা সম্ভব, যেখানে গল্প তার বস্তুঘনতা বিসর্জন দিতে দিতে প্রায় একটা গান

হয়ে ওঠে। যেমন– 'লিপিকা'। এমন বিষয়, এমন ঘটনা সমাবেশ, রূপ ও রসের এমন বিশেষ মাত্রাবৈচিত্র্য হতে পারে যেখানে কাব্যধর্মী না হলে গল্প গল্পই হবে না বলে মত প্রকাশ করেন সমালোচক। আর এই রকম ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব তাঁর গল্পরচনার সহায় ও সম্পদ হয়েছে তাছাড়া গদ্য গল্পের সব লক্ষণে সমৃদ্ধ হয়েও এই গ্রন্থ কাব্যের মতোই পৌনঃপুনিক পাঠসাপেক্ষ এই একটিমাত্র অর্থে একে কাব্যধর্মী বললে ভুল হয় না। তবে সমস্ত গল্পেই কল্পনার বেগ সামলাতে না পেরে বাস্তব ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা স্বপ্নলোকে বিলীন হয়ে গেছে এ ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল জানেন বুদ্ধদেব। 'গল্পগুচ্ছে'র বিষয়বস্তুর সাফল্য কিংবা উচ্চতা বিষয়ে তাঁর মন্তব্য :

> সমগ্র 'গল্পগুচ্ছ' পড়ে উঠলে আমাদের মনকে প্রবলভাবে এই কথাটাই আঘাত করে যে এর বেশির ভাগ গল্প আক্ষরিক অর্থে বাস্তব। সারা বাংলাদেশটাকে পাওয়া যায় এখানে। যে বাংলাদেশ শুধু বাস্তবও নয়... জীবন্ত হয়ে উঠছে বার বার।[৯০]

- রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র চরিত্রগুলো যে বয়সেরই বা পরিবেশেরই হোক না কেন বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে

সেগুলোকে আমরা সত্য বলে অনুভব করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর কৃতিত্ব এইখানে যে 'তাঁর পাত্র-পাত্রীরা তাদের অব্যবহিত পরিবেশ থেকে কোনোখানেই বিচ্যুত নয়, অথচ তারা এক দেশকালাতীত ভাবলোকেরও অধিবাসী। ঠিক এই সংযোগটি সবসময় ঘটেনা। কেবল তাই নয়, তাদের মধ্যে আমরা নিজেদেরও প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।'[৯১]

'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী, যে উশৃঙ্খল গ্রাম্য বালিকা মাত্র, তার প্রাণে প্রেমের উন্মেষ ও পরিণতি এমন করেই আঁকা হয়েছে যেটা চিরকালের পক্ষেই সত্য। এরকমভাবে অনেক গল্পে বর্ণিত জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের আচার ব্যবহারের বৈষম্য থাকলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা সমস্তটাকেই স্বাভাবিক বলে, অনিবার্য বলে সহজেই গ্রহণ করতে পারি বলে মত প্রকাশ করেন সমালোচক।

খ.

'গল্পগুচ্ছের' রচনারীতি সরল ও সুমিত। গল্পের বিশেষ কোনো অংশে বিশেষভাবে জোর দেবার প্রলোভন থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত, পাত্র-পাত্রীর মধ্যে হঠাৎ নিজে আবির্ভূত হয়ে মন্তব্য করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বর্ণনার ক্ষেত্রে এই রকম মিতভাষণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন বুদ্ধদেব বসু। নির্লিপ্তভাবে বলা অথচ গভীরভাবে কার্যকরী সেইসব কথাগুলোর একটা পরিমিত পরিপাট্য আছে বলে মনে করেন

বুদ্ধদেব; গুণটির নাম তিনি দিয়েছেন সাত্ত্বিকতা। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সমগ্রভাবে 'নষ্টনীড়' গল্প। মৃত্যু, হত্যা প্রভৃতি বড়ো বড়ো ঘটনাগুলোকে যতটা সহজভাবে বিবৃত করেন রবীন্দ্রনাথ তাকে শিল্পীর অপ্রয়াসের নৈপুণ্য ভেবে বিস্মিত হন সমালোচক। উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ও 'শাস্তি' গল্পের দুটো মৃত্যুর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষত 'শাস্তি' গল্পে বড়ো বৌয়ের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় ''ভাষায় কোনো খানে এতটুকু বেশী জোর দেয়া হয়নি; যেন অত্যন্ত সাধারণ দৈনন্দিন কোনো ঘটনার বর্ণনা করা হচ্ছে, এমনই আটপৌরে ভাষা, ঘটনা যেখানে খুব জমকালো ধরনের, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে নিচু গলায় কথা বলেন এবং বলেন সবচেয়ে কম।''[৯২]

শিল্পীর সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্রে বর্ণনায় বাহুল্য কিংবা অতিভাষণের প্রবল সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে; রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প এই প্রলোভন থেকে সর্বত্র মুক্ত এবং 'সে কারণে 'গুল্পগুচ্ছ' সুমিতির একটা উদাহরণস্বরূপ। এমনকি ভাষা এখানে বিষয়কে অতিক্রম করেনি, ফলে 'গল্পগুচ্ছ' সমসাময়িক রবীন্দ্রকাব্য ও পরবর্তী রবীন্দ্রগদ্য থেকে স্বতন্ত্র; এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না যে এতে অলংকারের আতিশয্য আছে।'[৯৩]

'গল্পগুচ্ছে'র উপমা আর বিশেষণ নিয়ে আলোচনা করে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের পূর্বযুগের গদ্য কিংবা পদ্যের বৈশিষ্ট্য বোঝার চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে উপমার যাথার্থ্য এবং বর্ণনার বাস্তবঘনতায় একটি সুন্দর সৌষম্য অনুভব করেন সমালোচক। কাহিনীও সেখানে সমতলভাবে প্রবাহিত, ভাষা স্বতন্ত্রভাবে যেন পাঠকের দৃষ্টিগোচরও হয় না; শুধু কাহিনীকে এগিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ 'শাস্তি' ও 'গুপ্তধন' গল্পের নিম্নের বর্ণনাসমূহ সমালোচক উদ্ধৃত করেছেন :

> বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই প্রহরের সময় খুব একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলো অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত এবং সিক্ত উদ্ভিদের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশুল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাৎবর্তী ডোবার মধ্যে হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

এভাবে 'গল্পগুচ্ছে'র বিভিন্ন গল্পের প্রকরণ বা ফর্মবাদী বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। গদ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে উপমা, চিত্রকল্প বেছে বেছে তুলে ধরেছেন। বর্ণনা যেখানে ভাবপ্রধান কিংবা রূপপ্রধান কোনোটিও দৃষ্টি এড়ায়নি সমালোচকের। তাঁর মতে বর্ণনা যেখানে রূপপ্রধান, যেখানে লেখক কথা নিয়ে চিত্রকরের মতোই ছবি আঁকেন, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ কার্পণ্য করেননি। যেমন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের একটা বর্ণনা :

> তাহারই জাফরান রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে রক্তশীর্ণ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপাল বেষ্টন করিয়াছে।

'গল্পগুচ্ছে'র বিশেষণ ব্যবহার মুগ্ধ করেছে সমালোচককে। কেবল কোনো চরিত্র বিশ্লেষণ, চরিত্রের সম্পূর্ণ একটা ছবি, কখনও ঘটনাকে আলোকিত করা এমনকি ভিন্ন চরিত্রের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যেও রবীন্দ্রনাথ 'গল্পগুচ্ছে' অসংখ্য আলংকারিক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে কখনও কখনও এই সব বিশেষণ একটা চরিত্রের বর্ণনার ক্ষেত্রে একাধিক হলেও তা একটিও অনর্থক নয়। যেমন 'ছুটি' গল্পের ফটিকের বিবরণ। সে ''যখন কলকাতায় এলো তখন তার 'অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা'র কথা তার বার বার মনে পড়তে লাগলো'– কেবল একটা আন্তরিক ''মা মা'' ক্রন্দন– সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত' হতে লাগলো। তারপর তার 'রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক' কিছুতেই ভাবতে পারলে না যে পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কারো কাছে সে সেবা পেতে পারে। ফটিকের উদ্দেশ্যে এখানে একটি-দুটি নয়, আটটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু একটিও বেশি হয়নি... প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয়, সবগুলি একত্র হলে তবেই বক্তব্য সুসম্পন্ন হয়।[৯৪] বিশেষণ প্রয়োগ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেব বসু হেনরি জেমস ও জেমস জয়েসের বিশেষণের স্তূপীকৃত ব্যবহারের সাথে তুলনা করেছেন, একে তিনি নাম দিয়েছেন 'বাণীসংগীত'। বিশেষণের প্রয়োগ নিয়ে বুদ্ধদেবের নিজস্ব শিল্পধারণার কারণে এটা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। 'গল্পগুচ্ছে' উপমাও অজস্র, কিন্তু দীর্ঘ উপমা বেশি নেই। গল্পের মেজাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী উপমাগুলিও বিভিন্ন সুরে বাধা বলে আবিষ্কার করেন সমালোচক, যা যথার্থ। যেমন– 'মণিহারা'র অলৌকিক গা-ছমছম-করা আবহাওয়া একটি উপমার গভীর রসে নিবিড় হয়ে উঠলো :

> আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল।

উপমার ভিতর থেকে দীপ্তিময় ইঙ্গিত বেরিয়ে এলে, তার পুরো মূল্য প্রকাশ পায়। বুদ্ধদেব 'জীবিত ও 'মৃতের' কাদম্বিনীর বা 'সমাপ্তি'র অপূর্বের বর্ণনায় সে উপমা খুঁজে পান। এছাড়া 'অধ্যাপক', দুরাশা, 'মাস্টার মশায়', 'রাসমণির ছেলে', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ইত্যাদি অনেক গল্প থেকে বুদ্ধদেব উপমা নির্বাচন ও বিশ্লেষণ করে এর অন্যন্য সুষমা ও সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, 'গল্পগুচ্ছে'র অধিকাংশ উপমায় শুধু বাহ্যবস্তুর প্রতিকৃতি নয়, মানসিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে, অর্থাৎ ঘটনার

তাৎপর্য বিষয়ে লেখক আমাদের এই উপায়েই সচেতন করে তোলেন। এই রকম ক্ষেত্রে উপমা হয়ে উঠে নিছক ভাষা-অলংকার নয়– লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগের সেতু।''[৯৫]

বুদ্ধদেব বসুর 'গল্পগুচ্ছ' বিষয়ক সমালোচনায় স্পষ্ট হওয়া রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের বিষয়-প্রকৃতি তথা কয়েকটি শিল্পসূত্র পরবর্তীতেও অন্যান্য সমালোচকের দ্বারা পুনরাবৃত্ত, বিশ্লিষ্ট হয়েছে। যেমন– (প্রথম দুটি খণ্ডে) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ আর মানবমনের বিচিত্র অভিব্যক্তি গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে, একথা বুদ্ধদেবের মতো স্বীকার করেছেন অন্যেরাও।[৯৬] 'গল্পগুচ্ছে'র গল্প গীতিধর্মী কিনা এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের বিচার রবীন্দ্রনাথের নিজ বক্তব্য থেকে দুরে নয়। লিরিকের সংজ্ঞার্থকে বরং ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচক। এছাড়া 'গল্পগুচ্ছ' সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য :

> ...আমি বলবো, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। ...আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।[৯৭]

এ বক্তব্যের সাথেও বুদ্ধদেব একমত। তবে তাঁর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু, চরিত্রায়ণ বিশ্লেষণের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্র-শিল্প-স্বভাবের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য, ভাষার আলংকারিক সৌন্দর্য ইত্যাদি। এসব দিক থেকে তাঁর ছোটোগল্প বিষয়ক বিচারকে একান্তই প্রকরণবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কবিমনের বিশেষ যে আকাঙ্ক্ষা গল্পগুলোতে সহজ স্পর্শে লেগে আছে, বস্তুজগতের অপার বিস্তারের মধ্যে থেকেও তা অনায়াসে যেভাবে বস্তুত্তর জীবন-ভূমিতে সচেতন পরিক্রমা করে ফিরেছে, কবির সেই সহজ মনের আবহপ্রধান গুণটিই বুদ্ধদেবের সমালোচনায় ধরা পড়েছে। গল্পগুলোর পরিণত কলাকৌশল সম্পর্কেও সচেতন সমালোচক।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১ সুতপা ভট্টাচার্য, 'কবির চোখে কবি', উদ্ধৃত, *বুদ্ধদের বসু: কাল থেকে কালান্তরে* (বেলা দাস সম্পাদিত), পুন, কলকাতা, প্র.প্র. জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ২০৪

২ বুদ্ধদেব বসু, 'আমার ছেলেবেলা', উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, প্রথম সংস্করণ, বিকল্প, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৯

৩ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', *সাহিত্যচর্চা*, ৭ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০০৯, পৃ. ১০৩

৪ উদ্ধৃত, *বুদ্ধদেব বসু: কাল থেকে কালান্তরে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৫ উদ্ধৃত, শিবতপন বসু, 'বুদ্ধদেব বসু ও রবীন্দ্রনাথ', *বুদ্ধদেব বসু: কাল থেকে কালান্তরে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬

৬ উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

৭ উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮

৮ তরুণ মুখোপাধ্যায়, *বুদ্ধদেব বসু: কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রতে*, প্র. প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৮, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃ. ৫৯

৯ বুদ্ধদেব বসুর স্বীকারোক্তি, 'আমাদের কবিতাভবন', শারদীয় দেশ ১৩৮১

১০ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা' *সাহিত্যচর্চা*, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০০৯, পৃ.১১৭

১১ বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, ৩য় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা, মে ১৯৯৭, পৃ. ১৪১

১২ 'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের স্বরূপ প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রকাশিত সাহিত্য ও সমালোচনা বিষয়ক চিন্তা থেকে একথা প্রমাণিত। সমালোচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য– এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত করা, রবীন্দ্রনাথ একথা বিশ্বাস করতেন।

১৩ তারেক রেজা, 'বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-বিবেচনা', *বুদ্ধদেব বসু/ জন্মশতবার্ষিক স্মরণ* (বিশ্বজিৎ ঘোষ, সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত), প্র.প্র. জানুয়ারী ২০১১, বর্ণায়ন, ঢাকা, পৃ. ২০০

১৪ অরুণকুমার সরকার, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ', *কলকাতা পত্রিকা / বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা*, (জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত), প্রতিভাস, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ও প্র.প্র. ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১০১

১৫ দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদের বসু, 'রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙালি', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র. জানুয়ারী ২০১০।

১৬ বুদ্ধদেব বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র (*তৃতীয় খণ্ড)) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮

২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০

২৯ শেলির কবিতার সাথে সমালোচক সরাসরি তুলনা করেছেন এভাবে : "মানসসুন্দরী পড়ে শেলির 'হিম টু ইন্টেলেকচুয়েল বিউটি' ও 'এপিসাইকিডিয়ন' মনে পড়া স্বাভাবিক, বিশেষত 'এপিসাইকিডিয়ন'-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য। কবিতা দুটির নামকরণ থেকেই সাধর্ম্য শুরু হয়েছে। 'Epipsychidion'-ঐ কবিতার মধ্যে শেলি যার অনুবাদ করেছেন 'soul out of my soul' বাংলায় আমরা তাকে বলতে পারি 'অন্তরতমা'; 'মানসসুন্দরী' ও 'জীবনদেবতা'র সঙ্গে তার ধারণাগত ব্যবধান বেশি নয়।" দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ (বুদ্ধদেব বসু লিখিত ৫নং টীকা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৫

৩০ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি', সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা/ রবীন্দ্রনাথ, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬

৩১ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজচিন্তা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯

৩৩ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮

৩৪ দ্রষ্টব্য, সুদীপ বসু, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র. প্র. এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ, ২১৫-২১৬

৩৫ উদ্ধৃত, শঙ্খ ঘোষ, 'বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ', বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ (আনন্দ রায় সম্পাদিত), বর্ণালী, কলিকাতা, প্র. প্র. মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৬৪

৩৬ বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : 'মানসী', সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা/ রবীন্দ্রনাথ, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

৩৭ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথের উপমা', সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা/ রবীন্দ্রনাথ পূবোক্ত, পৃ. ২৮৩

৩৮ বুদ্ধদেব বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭

৩৯-৪০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

৪১ শঙ্খ ঘোষ, 'বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৪২ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে *রবীন্দ্র-রচনাবলির* তৃতীয় খণ্ড প্রকাশকালে *চোখের বালির* সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন: "...গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম

সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষার আর প্রকাশ পায়নি। ...সাহিত্যের নব-পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল *চোখের বালিতে*।" দ্র. সূচনা, *চোখের বালি*।

৪৩ 'চোখের বালি', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৪৪-৪৫-৪৬ বুদ্ধদেব বসু, 'গোরা', 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৪৭-৪৮ *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ; ৬৩

৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৫০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৫২ 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পূর্বোক্ত পৃ. ৭৮

৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১-৮২

৫৪-৫৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৫৬ রফিকউল্লাহ্ খান, 'রবীন্দ্র-উপন্যাসবিচারের ধারাক্রম', *রবীন্দ্র-বিষয়ক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৬

৫৭ 'শেষের কবিতা', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৫৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৬০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৬১ 'শেষের কবিতা' ও লাবণ্য, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

৬২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

৬৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৬৪-৬৫ সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, একুশে, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৭০

৬৬ 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৬৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

৬৯-৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

৭১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৭২ সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬

৭৩ "রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি না-জেনেও এ-কথা নির্ভয়ে বলতে পারি যে তিনি কখনোই কলেজ স্ট্রিটের কোনো চায়ের দোকানে ঢোকেননি এবং জনশ্রুতি আর কল্পনা মিশিয়ে যে-চায়ের দোকানটি তিনি

বানিয়েছেন তার অস্তিত্ব আর যেখানেই থাক, কলকাতার শহরে নেই।" বুদ্ধদেব বসু, 'চার অধ্যায়', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

৭৪ 'চার অধ্যায়', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

৭৫ এ প্রসঙ্গে ২৯ চৈত্র, ১৩৪১ তারিখে শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা পত্র, যা কার্তিক ১৩৫০, 'কবিতা' সংখ্যায় বেরিয়েছিল, তারও একটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বুদ্ধদেব। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন- " 'চার অধ্যায়ে'র যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে-জিনিষটা পায় সেটা ঠিক গদ্যের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা– নবেলের নির্জলা আবহাওয়ার শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরি হবে।" দ্রষ্টব্য, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

৭৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

৭৭ প্রমথনাথ বিশী, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখকৃত রবীন্দ্র-উপন্যাস বিষয়ক সমালোচনা দ্রষ্টব্য

৭৮ 'চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত', ৮ চৈত্র, ১৩৪১, 'গ্রন্থপরিচয়', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা, প্র.প্র. জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৭৯৪

৭৯ 'চার অধ্যায়', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০-১২১

৮০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৮১ 'চার অধ্যায়', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯

৮২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০

৮৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

৮৪ বেগম আকতার কামাল, 'ভূমিকা', *বুদ্ধদেব বসুর নির্বাচিত প্রবন্ধসমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ২০১৩

৮৫ 'গল্পগুচ্ছ', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, (তৃতীয় খণ্ড), পণ্ডিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র. জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৬

৮৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৮৭ দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৮৮ শান্তি, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (৭ম খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা, প্র. প্র. জানুয়ারি ২০০৪

৮৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৯০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৯১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৯২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৯৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৯৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

৯৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৯৬ দ্রষ্টব্য, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা / বাংলা ছোটগল্পের একশ' বছর* (১৮৯১-১৯৯০), দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯৯ পৃ. ৪০

৯৭ উদ্ধৃত, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (৭ম খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা, প্র.প্র. জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৭৯৮

তৃতীয় অধ্যায়
পূর্বসূরি ও সমকালীন সাহিত্যিক প্রসঙ্গে

বুদ্ধদেব বসু 'সমকালের সাহিত্যিকদের সবচেয়ে বড় জয়ঘোষক'[১] একথা সকল সমালোচকই স্বীকার করেন। কাব্য বা শিল্পভাবনায় নিজের সাথে অন্যের পার্থক্য; আদর্শের প্রশ্নে লেখকের বিশেষ কোনো গোত্র বা দলভুক্তির বিষয়গুলো আদৌ তিনি বিচার করেননি। এসবের পরিবর্তে এক নিরপেক্ষতা নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন সাহিত্যিকের প্রতিভার মূল্যায়নে। "আধুনিক বাঙলা কবিতার তিনিই ছিলেন প্রধান পুরুষ, কেবলমাত্র কবিতাসৃষ্টিতে নয়, কবিতার ভাষ্যরচনাতেও। আধুনিক বাঙলা কবিতা মাত্র কয়েকটি দশকে এতোখানি প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি লাভ করতে পারতো না, যদি না থাকতেন বুদ্ধদেব বসু, যদি তিনি সম্পাদনা না করতেন 'কবিতা' নামক পত্রিকাটিকে একুশ বছর ধরে, যদি তিনি রচনা না করতেন আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ক উজ্জ্বল প্রবন্ধাবলি।"[২] আসলে সাহিত্যকে তার স্বরূপে ও সমগ্রতায় বুঝতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সমকালে কোনো সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করে যেভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা, সাহিত্যের ইতিহাসের সেইসব উজ্জ্বল কিছু উদাহরণ সর্ম্পকে সচেতন ছিলেন তিনি। কোনো আন্দোলনে বা আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠায় 'সম্পূর্ণ নিজেদের একটা কাগজ থাকা' যে অবশ্যই প্রয়োজন একথাও তিনি জানতেন। সম্পাদক বুদ্ধদেবের সম্পাদনার প্রথম পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'প্রগতি'র দু-বছর চার মাসের (১৩৩৪-১৩৩৬ আশ্বিন) সংখ্যাগুলিতে। এর পূর্বে 'প্রগতি' হাতে লেখা অবস্থায় ঠিক কবে শুরু হয়েছিল জানা যায়না, তবে বুদ্ধদেবের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পর্যন্ত[৩] সে পত্রিকা নিয়ে তাঁদের বন্ধুমহলে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রগতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কৈশোর-সঙ্গী অজিতকুমার দত্ত, সে দলে আরো ছিলেন পুরানা পল্টনের নতুন প্রতিবেশী পরিমল রায়, কিংবা আর্মানিটোলার অমলেন্দু বসু, ছিলেন বিদেশ-প্রত্যাগত প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা। 'প্রগতি'র দলের আড্ডা প্রাণবন্ত হয়ে উঠত তর্কালোচনামুখর সাহিত্যালাপে। 'প্রগতি'তে আহুত হয়েছিলেন প্রবীণ ও ভিন্ন সাহিত্যপন্থার লেখকেরাও। প্রিয়ম্বদা দেবী, সুশীলকুমার দে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, জসীমউদ্‌দীন, কাজী নজরুল ইসলাম বা জগদীশ গুপ্তের মতো পূর্বজেরা ছিলেন। বুদ্ধদেব নিজে তখন 'কল্লোলে'র লেখকগোষ্ঠীতে অন্তর্ভূত, যেমন ছিলেন 'প্রগতি'র আরও কয়েকজন সতীর্থ। এ পর্যায়ে সাহিত্যেরই প্রয়োজনে, সাহিত্যরুচি রক্ষার উৎকণ্ঠা থেকেই সমকালীনতার উত্তাপ পেয়েছিল 'প্রগতি'। আত্মস্মৃতিমন্থন করতে গিয়ে বুদ্ধদেব নিজেই লিখেছেন :

> এই (সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ) বিভাগের জন্য অন্যদের লেখা দুস্প্রাপ্য। আমিই লিখি মাসে-মাসে প্রায় পুরোটা– অনিচ্ছায় নয় বরং সাগ্রহে ও উত্তেজিতভাবে। সাহিত্য বিষয়ে আমার অনুভূতি আছে, সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক, এদিকে সেই সময়টাও ছিলো বিশেষভাবে তর্কমুখর। অলিতে-গলিতে রব তুলেছে আমাদের নিন্দুকেরা, দু-একটা সুশ্রাব্য কথাও আমাদের কানে আসছে মাঝে-মাঝে। ...আমি দুই হাতে ছড়িয়ে যাচ্ছি পাল্টা জবাব– শুধু শত্রুপক্ষের প্রতিবাদ হিশেবেই নয়, আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে ব'লেও। আমার প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় আমি নিস্কুণ্ঠ; এক পা এগিয়ে দু-পা পেছিয়ে ইতি-উতি তাকিয়ে পথ চলাও আমার স্বভাবে নেই।[৪]

জীবনানন্দ দাশের কবিতা প্রকাশের চাইতেও সে কবিতার প্রতিষ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথের সাথে মুখোমুখি বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে 'তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য'[৫] করার চেষ্টায়, কিংবা 'নিজেদের পথ আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে 'প্রগতি'র ভূমিকা আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে দেখলে ক্রান্তিকরী মনে হয়।'[৬] নতুন সাহিত্যসমাজকে নেতৃত্ব দেওয়া সেই সাহসিকতার কারণেই 'প্রগতি'র পরিচয় আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। কেবল আর্থিক কারণে এর সম্পাদনা বাহ্যত ব্যাহত হয়েছিল; তবে তরুণ বুদ্ধদেবের মনে সুচিরস্থায়ী একটা প্রণোদনা থেকে গিয়েছিল। 'প্রগতি'র তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার পর অন্য কোনো লেখক-সম্পাদক নিজেকে সম্ভবত সংবৃত করে নিতেন, সেখানে বুদ্ধদেব লেখক-সমবায়ের এক নিজস্ব প্রকাশকসংস্থা গঠনে উদ্যোগী হলেন; আর 'পরিচয়'-'পূর্বাশা' কোনোটির সঙ্গেই ঠিক একাত্ম হতে না পেরে প্রয়াসী হলেন শুধু কবিতার জন্য একটি পত্রিকা, ইংরেজি 'পোয়েট্রি'র মতো, 'কবিতা' (আশ্বিন ১৩৪২, অক্টোবর ১৯৩৫) পত্রিকা প্রকাশে।[৭] বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, " 'প্রগতি'র সময়েই টের পেয়েছিলাম আমার মধ্যে একটি অংশ আছে প্রচারকের। সাহিত্যে আমাকে যা আনন্দ দেয় তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোক এই ইচ্ছার বেগ সামলাতে পারি না। তার তাড়নায় এমন অনেক কাজ করে থাকি যাকে চলতি বাংলায় বলে 'বনের মোষ তাড়ানো।" তাঁর 'এই বৃত্তিটি নির্বাধ ছাড়া পেলো *কবিতা* বেরোবার পর'।[৮] 'কবিতা' ও তার অনুষঙ্গে কবিতা-ভবন নামে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই, ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ হয়ে উঠেছিল কবিতা-ভবন প্রকাশনারও স্থায়ী ঠিকানা। শুধুমাত্র কবিতা নয়, গদ্যমূলক প্রবন্ধ, ভ্রমণ ও ছোটোগল্পও স্থান পেয়েছিল তার প্রকাশন-তালিকায়। গদ্যে জ্যোতির্ময় রায় ও কবিতায় প্রতিভা বসু ও বুদ্ধদেব বসু ছাড়া লেখকদের মধ্যে ছিলেন অজিতকুমার দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, মনীশ ঘটক, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কবিতার ক্ষেত্রে কবিতা-

অতিরিক্ত অন্য কোনো বিবেচনার প্রয়োগ না করা বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেবের অবিস্মরণীয় দান। এ সূত্রে তাঁর সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তাও প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত হয়। দল ও মতের বিরোধ তখনও ছিল বাংলা সাহিত্যে। অথচ পঁচিশ বছর জুড়ে অব্যাহত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাই পরিচয় করিয়ে দেয় তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার একনিষ্ঠ অঙ্গীকার কিংবা মতাদর্শকেও। 'কবিতা'র পঁচিশ বছরের লেখকদের জন্মকাল ১৮৬১-১৯৪০, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে তন্ময় দত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর জাতীয় আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, সাম্যবাদী চিন্তার প্রসার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নানা দল উপদল ও গোষ্ঠী-বিভক্ত বাঙালি সমাজে থেকেও কবিতার গণতন্ত্রে স্বাধীন থাকার নজির বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। মধ্য ত্রিশ থেকে ষাটের দশকের সূচনা পর্যন্ত বাংলা কবিতার 'আধুনিক' ধারাটির উত্থান-পতন, গতিবেগ ও গতিমান্দ্য, আবেগ-উচ্ছ্বাস আর মনন-সংহতি, তার ক্ষয় ও জয়ের সব চিহ্নই অবিকল ধরা আছে এই পত্রিকায়। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে বুদ্ধদেবকে নিজের আস্থার কথা জানিয়ে লিখেছিলেন :

> তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাস্তুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্বজনের পরিচয়ের তীরে।[৯]

প্রথম সংখ্যা পাঠ করে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৪২) একটি দীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে লিখেছিলেন :

> এতে এমন কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে, যার মূল্য আমার মতে আজকালকার যে কোনো তরুণ ইংরেজ কবির অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। কাব্যরসিকের পক্ষে এই যথেষ্ট।

'টাইম্‌স লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট'-এর সম্পাদক এডোয়ার্ড টমসন, সে সময়কার একমাত্র শ্বেতাঙ্গ– যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন; বুদ্ধদেব তাঁকে 'কবিতা'র কোনো এক সংখ্যা পাঠিয়েছিলেন। ১৯৩৬-এর ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে টাইম্‌স পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এডোয়ার্ড টমসনকৃত আলোচনা, তার প্রাসঙ্গিক অংশ[১০]:

> ...সম্প্রতি 'পরিচয়ে'র একটি জুড়ি পত্রিকা হয়েছে, 'কবিতা', শুধু কবিতার জন্য।... বাংলাদেশ কবিতার দেশ।... বাংলা ভাষাও কাব্যপ্রাণ, তার শব্দসম্পদ এখনো চ্যুত হয়নি আদিম জীবন থেকে, যে জীবন তার সৃষ্টির

> উৎস– তার শব্দরাশি প্রায়ই প্রাকৃত ধ্বনির অনুকরণ এবং সর্বদাই গীতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময়। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর আর একজন কবি, বাংলার নব্য লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা কৃতী তাদের অন্যতম, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু এই শব্দের দ্যোতনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন।
>
> ...বস্তুত, বর্তমান যুগ ও সর্বদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে এই কবিরা এতই সচেতন যে তাঁদের রচনায় প্রতিনিয়তই সন্ধানী, পান্থ ও পথিকৃৎ মনের চিহ্ন পাওয়া যায়।... এই কবিরা এমন একটি আন্দোলনের প্রতিভূ, বাংলা চিন্তাকে যা নতুন রূপ দেবে, আর বাংলার ভিতর দিয়ে সর্বভারতীয় চিন্তাকে।

এভাবে অচিরকালের মধ্যে 'কবিতা'ই হয়ে উঠল নতুন এক কাব্য আন্দোলনের মুখপত্র। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করে লেখেন :

> কবিতার প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলার আধুনিক কাব্য-ইতিহাসে এমন একটি স্বাক্ষর রেখে গেছে যা কোনো দিন মুছবে না। আধুনিক কবিতা যে নিছক একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী বস্তু নয়, সে-কথা এই চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালি পাঠকবর্গ অনুভব করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা আবিষ্কার করেন এমন সব কবিকে, ভবিষ্যতে যাঁরা কবিতার নানা দিক বিজয় করেছেন। যেমন– জীবননান্দ দাশ, অজিত দত্ত, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ইত্যাদি। এঁদের কবিতা আগে নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো; কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পান নি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো করে আলোচনাও হয়নি। কবিতা পত্রিকাই তাঁদের কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা নিয়ে নিষ্ঠাভরে আলোচনা করে।[১১]

প্রথম দশ বছরে 'কবিতা'য় যাঁরা অপর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন– জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বাগচী, বুদ্ধদেব বসু। বাংলা কবিতার কোনো অবমাননা বা উপেক্ষায় সম্পাদক হিসেবে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হন নি বুদ্ধদেব; সে কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *বাংলা কাব্য পরিচয়* (১৯৩৮) সংকলনে জীবনানন্দ উপেক্ষিত, কিংবা বিষ্ণু দে, সমর সেনও অসংকলিত দেখে 'কবিতা'তেই তীব্রকণ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। নিজের লেখা মৌলিক কবিতার পাশে অনুবাদ কবিতা চর্চায় তিনি যে মনোযোগ দিয়েছিলেন– তাতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বকাব্য ধারার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয়ের ব্যাপারটা স্বচ্ছন্দ করে দেয়া। প্রবন্ধ-সমালোচনা-সম্পাদকীয় রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সমসাময়িককালের প্রতিভাবানদের খুঁজে নিতে ও তাঁদের গুণকীর্তনে পিছপা হন নি। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তরুণ কবিদের প্রাথমিক স্ফূরণের কালে কবিতার ঐতিহাসিক আনুকূল্য স্মরণ করার মতো ঘটনা। এমনকি পঞ্চাশের দশকের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি

চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শান্তিকুমার ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত, রাজলক্ষী দেবী কবিতায় বিশেষভাবে প্রকাশিত-আলোচিত-প্রচারিত হয়েছেন। এদের মধ্যে নতুন যাঁরা, তাঁদের কবিতা শুধু প্রকাশ নয়, পরিমার্জনা কিংবা পরামর্শের মধ্য দিয়ে কিরূপে একটি রচনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যায় সে বিষয়ে সব সময় সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব সচেষ্ট থেকেছেন।

প্রথমাবধি 'কবিতা'র মাধ্যমে নানা আলোচনা ও উদাহরণ দ্বারা বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন যে, 'পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনা মাত্রকেই কবিতা বলে না।' 'কবিতা'র প্রথম পর্বে যে কাজটি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল গদ্যকবিতার বিবর্তন ও রূপান্তর। ১৯৩৫-এ বুদ্ধদেবকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার এই প্রকরণ নিয়ে সমর্থনযুক্ত বক্তব্যও দিয়েছেন এই বলে যে, 'কবিতা'য় প্রকাশিত গদ্যকবিতাগুলো পড়ে মনে হয়, বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটা আয়ত্ত করতে পেরেছে।[১২] নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে ধারা যাতে পুষ্ট হয়, সেজন্য সম্পাদক উদ্যোগী থেকেছেন, যদিও 'কবিতা' কেবল বিশেষভাবে গদ্যছন্দকেই আশ্রয় দিয়েছে, একথা বুদ্ধদেব মানেননি। এমনকি গদ্যকবিতা-বিতর্কে কবিতায় একসময় তুমুল ছড়া-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কেবল গদ্যছন্দ নয়, তিরিশের দশকের কবিতার বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ চতুর্দিকে বেড়ে উঠেছিল সেটি হল দুর্বোধ্যতা। প্রথম সংখ্যা কবিতায় 'কবিতার দুর্বোধ্যতা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় রচনায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন :

> যা বোঝবার জিনিশ, বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গে তা ফুরিয়ে যায়, কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি-অতীত বুদ্ধি পলাতক, যে-বিরাট উদ্বৃত্ত, যে জ্বলন্ত ভাবমণ্ডল– যেখানে অপরূপ ধ্বনির আর আলৌকিক ইঙ্গিতের সীমাহীনতা– কবিতা তো তা-ই, তা ছাড়া আর কী?

বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন, কবিতার দুর্বোধ্যতার অপবাদ ঘোচাতে হলে, পাঠকের সামনে নিত্যনতুন উদাহরণ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে, ক্রমাগত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কবি ও পাঠকের পারস্পরিকতায় একটা অসংকোচ সংযোগের সেতু নির্মাণ করতে হবে। কবিতার স্বল্প পরিসর সম্পাদকীয় রচনার মধ্যে তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪৩) 'কবিতা'র সম্পাদকীয় উপসংহারে তিনি কবিতা সর্ম্পকে তাঁর একান্ত বিশ্বাস জানিয়ে দেন এভাবে :

> কবি তৈরি করা যায় না, কিন্তু অনুকূল অনুষঙ্গে কবিতার পাঠক তৈরী হতে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প, কিন্তু পড়ানো যেতে পারে এবং ভালো পাঠক যত বেশি হয়, কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো।

'কবিতা' পত্রিকায় প্রধানত কবিতা বিষয়ক নানা তর্ক-বিতর্ক আলোচনার মধ্য দিয়ে মূলত বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তাই ত্বরান্বিত ও বিস্তৃত হয়েছে। এই পর্বের কবিতা সমালোচনায় রবীন্দ্র-সমালোচক বুদ্ধদেবেরও অপ্রমেয় অধ্যবসায়ের পরিচয়টি সমৃদ্ধ হয়ে আছে। এছাড়া, বুদ্ধদেব তাঁর সময়সীমায় শুধু নিজের নয়, সমকালীন সমালোচকদের একটি যোগ্য বৃত্ত গড়ে তুলবার কাজে মনোযোগী হয়েছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে প্রকাশিত 'কবিতা'র একশো চারটি সংখ্যার মধ্যে মাত্র চারটি যুগ্ম। এছাড়া বিশেষ যে তেরোটি সংখ্যা, সেগুলো লক্ষ করলেও এ পত্রিকাকে ঘিরে সাহিত্য-সমালোচনার ধারাটি স্পষ্ট হয়। এগুলো হল : কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, বিশেষ বর্ষা, বিশেষ গ্রন্থ সমালোচনা, রবীন্দ্র-সংখ্যা, সমালোচনা সংখ্যা, নজরুল সংখ্যা, মার্কিন সংখ্যা, ইংলিশ সাপ্লিমেন্ট, জীবনানন্দ স্মৃতি, আন্তর্জাতিক সংখ্যা, সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা। আন্তর্জাতিক সংখ্যা প্রকাশ করে বিশ্বসভায় বাঙালি কবিদের একটা মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এভাবে 'প্রগতি'র সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে অনন্য সাধারণ অধ্যবসায়ের ভাবমূর্তি তরুণ কবিদের সামনে দাঁড় করেছিলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে কারণে তাঁকে 'প্রহরজাগা শাস্ত্রী' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "যখন 'প্রগতি' বেরিয়েছে, বলতে গেলে তখন থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সারথ্য তাঁর হাতে।... সমকালীন লেখকদের মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানানো, অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা, বুক দিয়ে আগলানো– সাহিত্যে এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর কে করেছেন?"[১৩]

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, 'কবিতাভবন' প্রকাশনার ছায়াতলে নবীন-প্রবীণ, বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী নানা কবিরা সমবেত হয়েছিলেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার কবিতা; কথাকারদের কথাশিল্পের কথাও সমানভাবে বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকায় আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ পর্যায়ে সম্পাদকের মূল ব্রত ছিল– সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতা তথা বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিকে সকলের সামনে তুলে ধরা। *কালের পুতুল* গ্রন্থের বেশির ভাগ লেখা এই উদ্দেশ্যেই রচিত। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে লেখার ক্রম লক্ষ করলে বোঝা যায়, সমালোচক বুদ্ধদেব সমকালীনদের সৃষ্টির স্বাদ একের পর এক গ্রহণ ও সমালোচনা করেছেন। যেমন– ১৯৩৫-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের, 'অর্কেস্ট্রা', ১৯৩৭-এ তাঁর 'ক্রন্দসী' ও সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা', ১৯৩৮-এ বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' ও অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া', ১৯৪০-এ তাঁর 'এক

মুঠো', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' ও নিশিকান্তের 'অলকানন্দা', ১৯৪২-এ অন্নদাশংকর রায়ের 'নূতনা রাধা', ১৯৪৪-এ কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক 'নজরুল ইসলাম', ১৯৪৫-এ 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা', ১৯৫০-এ অমিয় চক্রবর্তীর 'পালা-বদল'। ১৯৪০-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লেখেন :

> দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি। কিন্তু 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরোবার পর থেকে সে-সম্মান হ'লো বিষ্ণু দে-র ভাগ্য, যতদিন না সমর সেন দেখা দিলেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' নিয়ে। সম্প্রতি এই ঈর্ষিতব্য আসন সমর সেনেরও বেদখল হয়েছে, বাংলার তরুণতম কবি এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।[১৪]

এত ভিন্নস্বাদের কবিতা তিনি যে উপভোগ করতে পারতেন তার কারণ হিসেবে সমালোচকের উদার ও গ্রহিষ্ণু স্বভাব, সেই সঙ্গে আধুনিকতার প্রতি তাঁর অনমনীয় আনুগত্যকে দাঁড় করানো যায়। "আধুনিকতার মাত্রাও যে বিবিধ ও বৈচিত্র্যিক হতে পারে, এ বোধ যাঁর সবচেয়ে বেশি তিনি বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দের সঙ্গে তিনি বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী, এমনকি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে– যাঁর বিষয়ে শুরুতে তিনি কিঞ্চিৎ নিরুত্তাপ ছিলেন যদিও পরে সহৃদয়; তিনি মেলাচ্ছেন সেইসঙ্গে সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও– এর রহস্য সমালোচকের তীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধে"[১৫] শিল্পের স্বরূপের প্রতি একনিষ্ঠ ও আপোসহীন নান্দনিক অনুভবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বজ সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'মধুসূদন যে কালে জন্মেছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সে কালের গৌরব অনেক। সে কালের প্রতিভূ হিসেবে মধুসূদনকে দেখার রেওয়াজ দীর্ঘদিন চলে আসছে।'[১৬]– সমালোচকের এ বক্তব্য অনেকটাই সত্য। বুদ্ধদেব বসু মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) সমালোচনায় প্রথাগত সিদ্ধান্ত থেকে দূরে গিয়ে এক ব্যতিক্রমী মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করেছেন; যেখানে সমালোচক হিসেবে তাঁর দৃষ্টি থেকেছে অনেকটাই নির্মোহ, সংস্কারমুক্ত। অবশ্য বুদ্ধদেবীয় এই সমালোচনা কতটুকু যৌক্তিক, তা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবি, বাংলা সাহিত্যের ত্রাতা এবং বাংলা কাব্যের মুক্তিদাতা– একথা বুদ্ধদেবের কালেই প্রায় একশ' বছর ধরে প্রচলিত হয়ে আসছিল। বিশ শতকে যেমন তেমনি একুশ শতকেও মধুসূদনকে আধুনিক বাংলা কবিতা বা সাহিত্যের প্রথম মুক্তিদাতা ও প্রথম দ্রোহী, প্রথম আধুনিক সংস্কারহীন কবি বলে চিহ্নিত করা যায়। সমালোচক বুদ্ধদেব অবশ্য 'মাইকেল' প্রবন্ধের ভূমিকাতেই জানিয়ে দেন:

> আধুনিক বাঙালি পাঠক মাইকেলের রচনাবলি পড়ে এ মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাটকাবলি অপাঠ্য এবং যেকোনো শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অযোগ্য, *মেঘনাদবধ কাব্য* নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ-পদাবলি বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা *বীরাঙ্গনা কাব্যে*ও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। ভাবতে আবাক লাগে যে মাইকেলের ইংরেজি পত্রাবলিতে প্রাণশক্তির যে-প্রাচুর্য দেখি, তার সংক্রমণ প্রহসন দুটিতে ছাড়া আর-কোনো রচনাতে নেই– এবং প্রহসন দুটিও সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক নয়, নবিশের কাঁচা হাতের কৃশাঙ্গ নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। কিন্তু এ-সব কথা মুখ ফুটে কেউ কি কখনো বলেছে? ... তাঁর কর্মসূচিতে দেখতে পাই পরীক্ষার পর পরীক্ষা– পদ্যে ও গদ্যে, নাট্যে ও কাব্যে শুধু পরীক্ষা; অনেকটাই তার নিছক চর্চা, নিতান্তই লিখতে শেখা, প্রাক-'মানসী' রবীন্দ্ররচনার সগোত্র, অনেকটাই অবিমিশ্র অপব্যয়, যে-অপব্যয় যে-কোনো সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য।... তাঁকে মনে হয় এমন কোনো কবি, নিজের শক্তির ব্যবহার যিনি জানেন না, নিজের উদ্দেশ্যকে নিজেই পরাস্ত করেন, যাঁকে আমরা চড়া গলায় প্রশংসা করি, আর তাতেই আমাদের দায়িত্ব ফুরোয় ব'লে যাঁর জন্য আমাদের দুঃখ হয়।[১৭]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ম্পকে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য তাঁর প্রবন্ধের পুরোটা জুড়েই এমন কঠোর। জীবনাচরণ এবং প্রথম জীবনে ইংরেজ প্রীতি ও অস্থিরতায় মাইকেল সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে বা প্রতিভার যথাযথ পরিচয় দিতে পারেন নি বলে সমালোচকের মনে হয়েছে। ঐতিহ্যকে স্বীকরণের প্রচেষ্টায়, বিশ্ববীক্ষা কিংবা ভারতীয় ক্লাসিক্সের ঐতিহ্য অনুসরণে মধুসূদনের সাধনা তার শিল্পপ্রচেষ্টার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে একথা স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে মধুসূদন কোনো ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে পারেন নি, না স্বজাতীয়, না বিজাতীয়। ঐতিহ্যকে বাড়াতে অথবা বদলাতে হলে যতটা আছে তাকে প্রথমে অধিকার করার গভীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, মাইকেল 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোনো ঐতিহ্যকেই পাননি বলে তাঁকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে প্রথার কাছে'– সমালোচক এভাবেই বিচার করেন। *মেঘনাদবধকাব্য* (১৮৬১) সেজন্যই হয়ে ওঠা পদার্থ না হয়ে হয়েছে 'বানিয়ে তোলা জিনিশ'। যে কাব্যের জন্য মাইকেলের খ্যাতি সেই কাব্য সর্ম্পকে বুদ্ধদেবের আরো অভিযোগ হল– কাব্যটি নিস্প্রাণ; এতে পরিবেশিত বিভিন্ন রস অসফল, বিশেষত বীর রসে উদ্দীপনা নেই; প্রকরণের অভিনবত্ব বাদ দিলে তাতে 'অপূর্ব পরিবর্তন' বা বিদ্রোহ' কিছুমাত্র নেই, বরং সে গ্রন্থ দৃষ্টিহীন গতানুগতির একটি অনবদ্য উদাহরণ; পুরাণের আধুনিকত্ব বা পুনর্জন্ম নেই এতে। মহাকাব্য মাইকেল লিখতে পারেননি; এমনকি অমিত্রাক্ষর ছন্দে নবজন্ম সত্ত্বেও তাঁর রচনা ধ্বনিগাম্ভীর্যের তাগিদে অফুরন্ত অনুলাপের শরণ নিয়েছে এবং একই শব্দের পুনরুক্তিদোষে তা ভারাক্রান্ত। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মূল্যায়নে এটি স্পষ্ট যে মধুসূদনের *মেঘনাদবধকাব্য* রচনার প্রেরণা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, তাই-ই কাব্যসাফল্যের চরম মাপকাঠি নয়। তাছাড়া সমালোচকের আধুনিক চৈতন্যে ও নান্দনিক বিশ্বাসে মিথের যে ধারণা, সে ধারণা থেকে *মেঘনাদবধকাব্য* বিচার করেছেন তিনি। তাই সমালোচকের চোখে ধরা পড়ে– '*মেঘনাদবধ কাব্যের* উল্লেখযোগ্য চরিত্র পরিকল্পনায় কবির বিদ্রোহী মনের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে পারেনি, সেখানে শিল্পীহৃদয়ের সৃজনের সার্থকতা নেই।' এ কাব্যে মধুসূদনের আত্মার সংকট বুদ্ধদেব ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রথাভীরু' হিসেবে তাঁকে আখ্যা দিয়ে, তিনি লক্ষ করেন– *মেঘনাদবধকাব্যের* পদে-পদে দেখা যায় যে রাম-সীতার লোকশ্রুত মহিমায় কবি অভিভূত এবং রাবণের দুশ্চরিত্রতার ধারণাও তাঁর মনে বদ্ধমূল। আর রাবণের চরিত্রে মহত্ত্বের যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, মাইকেল অন্ধভাবে তা উপেক্ষা করে গেছেন। এছাড়া মধুসূদনের কাব্যে পুরাণের নবজন্ম ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২) কাব্য পড়ে চরিত্রগুলোকে যতটা বর্তমানের অন্তর্গত কিংবা আধুনিক বিশ্ববাসীর স্বজাতি বলে মনে হয় বুদ্ধদেবের, মধুসূদন পড়লে তা হয় না। পুরাণ ও মাইকেলের শিল্পসত্তার ব্যাখ্যায় পুরাণের পুনর্গঠণের সফলতা অর্থে চরিত্রসমূহের স্বকালের

মুখপাত্র হবার শিল্পগুণের দিকে বুদ্ধদেবের আকর্ষণ দেখা গেলেও মাইকেলের কবিচিত্তে বিদ্রোহ ও শিল্পে তা রূপায়ণের ব্যর্থতার অন্তর্গূঢ় ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। যে ব্যাখ্যা মাইকেলের সমকাল সংশ্লিষ্ট হবার দাবি রাখে। মধুসূদনের শিল্পীসত্তা অনেকখানি বিদেশীয়ানায় ভেসে বেড়ালেও দেশকালের মূল থেকে উৎপাটিত হয়নি একথা বলা যায়। বুদ্ধদেবের মতে, মাইকেল বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি নন, রবীন্দ্রনাথই প্রথম। এর কারণ হিসেবে তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন :

> আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব যে বলতে গেলে শূন্য, এমনকি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উদ্যম সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হয়েই রইল, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সাধনায় তাঁর ব্যর্থতার এটাই প্রমাণ। বললে হয়তো কালাপাহাড়ী শোনায়, কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য যে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবে মাইকেল আনতে পারেননি, এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১৮]

মধুসূদন দত্ত সর্ম্পকে বুদ্ধদেবের আর একটি অভিযোগ হল– তিনি প্রায়ই শব্দের তাৎপর্য অনুভব করেননি। শব্দের ধ্বনিগত দিকটাতেই তার বেশি নজর ছিল। আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের সাড়ম্বর প্রয়োগে *মেঘনাধবধ* সমৃদ্ধ বলে অভিধানের পাতা উলটালেই যেন এ কাব্যের সকল রহস্য শেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন সর্ম্পকে একুশ বছর বয়সে যা (১২৮৯-এ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মেঘনাধবধকাব্য' প্রবন্ধ) বলেছিলেন, পঁচিশ বছর পরে 'সাহিত্য সৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে তাঁর মতের পরিবর্তন করেছিলেন– ছন্দ-রচনাপ্রণালী-ভাব ও রসে *মেঘনাদবধকাব্য* বিশিষ্ট একথা বলে। বুদ্ধদেবের মতে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের মাইকেল-সমালোচনায় বা মন্তব্যে যাথার্থ্য নেই, শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি আছে। মধুসূদনের *মেঘনাদবধকাব্যের* প্রকৃতি মহাকাব্যের মতো একথা কেউ কেউ স্বীকার করেন। একটি মহাকাব্যিক রচনাকে সমালোচক রোমান্টিক গীতিকাব্যের আদর্শে বিচার করেছিলেন-বুদ্ধদেব সম্পর্কিত এ মন্তব্যকেও যথার্থ মনে হয়।[১৯] তবে প্রবন্ধ জুড়ে কেবল মাইকেলকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও একজন সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর সাহিত্যকৃতির বিভিন্ন দিকও তুলে ধরেছেন বুদ্ধদেব। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল ধ্বনির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যে আধুনিকতার স্বর্ণদুয়ার খুলেছিলেন তার প্রশংসা করেন তিনি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'প্রবহমানতার' প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন– 'বাংলা ছন্দে প্রবহমানতার জনক বলেই মাইকেল উত্তর পুরুষের প্রাতস্মরণীয়।' এছাড়া তাঁর মতে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের একঘেয়েমি দূর করেছিল। বুদ্ধদেব

আরো স্বীকার করেছেন, মাইকেল শুধু বাংলা ছন্দের যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের আবিষ্কর্তা নন, বাংলা স্বরব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগ সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। আর তাঁর প্রহসন দুটির ভাষাতেও অর্থাৎ প্রাণপূর্ণ গদ্য সংলাপগুলোয় মাইকেল সফল। বুদ্ধদেব মনে করেন, 'গদ্যকাহিনীতে হাত দিলে মাইকেল বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা হতে পারতেন।' এছাড়া মাইকেলের অন্যান্য লেখায় তিনি সৌকুমার্যের স্বরূপ উদ্ধার করে বলেছেন, 'যেদিকে তার সহজাত ক্ষমতা সেদিকে তার যথোচিত মনোযোগ নেই।' সাহিত্যশক্তির যে বিভিন্ন উপাদানগুলোকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে পরখ করে দেখেছিলেন, সেগুলো সময়ের অভাবেই যথাযথমাত্রায় সমন্বয় করে যেতে পারেন নি কবি, মাইকেল সম্পর্কে তাই বুদ্ধদেবের খেদোক্তি– "যদিও রবীন্দ্রনাথের কোনো কীর্তির পক্ষেই মাইকেলের অগ্রগামিতা অপরিহার্য নয়, তবু একথাও সত্য যে অনুজ যা কিছু করেছেন তার কোনো কোনো অংশ অগ্রজকে দিয়েও সাধিত হতে পারতো যদি তিনি সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী হতেন।"[২০]

প্রমথ চৌধুরী

কালের পুতুল গ্রন্থের পাতায় পাতায় গেঁথে দেয়া হয়েছে গ্রন্থকারের কবিতাপ্রিয়তা, এর মাঝে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত আলোচনা স্থান না পেলেও গ্রন্থের কোনো ক্ষতি হতো না–[২১] একথা কেউ কেউ মনে করলেও মূলত বুদ্ধদেবের সমালোচক সত্তা যেকোনো নবত্বের খোঁজে সতত অন্বেষী ছিল। বিশেষত দীর্ঘসময় ধরে অব্যাহত রবীন্দ্র-আধিপত্যের কালে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা স্বকীয় দৃঢ়তায় নতুন আসন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, বুদ্ধদেব তাঁদের সকলকেই অসামান্য আন্তরিকতার সাথে বিচার করেছেন। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) নিঃসন্দেহে তাঁদের মাঝে অন্যতম, যিনি সৃষ্টি-সাধনার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিলেন 'সবুজপত্র'; জন্ম দিয়েছেন পরিমিত ব্যঙ্গনিপুণ তীক্ষ্ম, শাণিত গদ্য ও ভাবালুতা, অস্পষ্টতা-বর্জিত ব্যতিক্রমী ছোটোগল্পের, সেইসাথে যুক্তিনিষ্ঠ রসসমৃদ্ধ-সাহিত্যভাবনা ও সমালোচনার। বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই সবক'টি গুণ দ্বারাই আকৃষ্ট। বিশেষত, প্রমথের ভাষা-চিন্তা, তাঁর গদ্যভঙ্গি এবং সুবজপত্রীয় অনবদ্য বিপ্লবের ঋণ বাংলা সাহিত্যে কতটুকু, সমালোচক তাঁর প্রবন্ধগুলোতে তা বুঝিয়ে দেন। *কালের পুতুলে* প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত প্রবন্ধ দুটি– 'প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য' এবং 'প্রমথ চৌধুরী'। আর *An Acre of Green Grass* (১৯৪৮)-এ রয়েছে 'Pramatha Chaudhuri' নামক প্রবন্ধটি। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্রে'র প্রকাশনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন পর্বের আরম্ভ হয়েছিল। বিদগ্ধ রুচিবান নাগরিক মানস সৃষ্টিতেই 'সবুজপত্রে'র ভাষা ও প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল। এছাড়া এ পত্রিকার

পরিচয় কেবল তার সংগ্রামী চরিত্রে নয়, তার সুরের ঐক্যে, সবুজপত্রীদের সমধর্মিতায়। এর ফলে 'সবুজপত্র' স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। পত্র-সম্পাদনায় তপস্যা ও সৃষ্টির যাথার্থ্য লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেন[২২] :

> আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নতুন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে অন্তর্নিহিত সত্যকে বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিচার করেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের বয়োকনিষ্ঠ এমন কোনো লেখক নেই যাঁর উপর তাঁর প্রভাব পড়েনি, কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। যদিও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চলিত ভাষা নতুন ছিল না, এ ভাষা লেখার তাগিদ তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল, "কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে *সবুজপত্রের* পতাকা উড়িয়ে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব তাঁকে নির্ভয় করলে, অকুণ্ঠিত সাহসে তিনি যে চলতিভাষায় নিজেকে প্রকাশ করলেন এর পিছনে প্রমথ চৌধুরীর অবদান অনেকখানি।... এই ভাষা, যা আমাদের প্রাণের ভাষা, যাতে নব-নব আভার বিচ্ছুরণ আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, যার সম্ভাবনা এখন অফুরন্ত মনে হয়, তাকে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন, এ তাঁর এক মহৎ কীর্তি।"[২৩]

'সবুজপত্র' সম্পাদনার সূচনা থেকেই প্রমথ চৌধুরী সুসংস্কৃত বাঙালির চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সাহিত্যে নানারকম পালাবদল ঘটলেও সে প্রতিষ্ঠায় ভাঙন না ধরে বরং দিনে দিনে সুদৃঢ় হয়েছিল– সমকালীন সে ইতিহাস স্মরণ করে বুদ্ধদেব তারুণ্যের প্রাণ ও মনের সাধনা, জয়ঘোষণা, দেশোত্তর প্রেরণার আহ্বান, সংহত পরিপাটি রচনা, প্রযত্ন ও যুক্তিভিক্তিক নির্মোহ দৃষ্টির প্রসারে এ পত্রিকার ভূমিকার বন্দনা করেছেন। সাহিত্যজগতে যে অনুপাতে প্রমথের প্রতিপত্তি ঠিক সেই অনুপাতেই পাঠক সমাজে তাঁর বিষয়ে উদাসীনতাও দেখা গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মনের মতো লেখক তিনি হলেন না– এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার সাথে প্রমথ চৌধুরীর একটা তুলনা করেছেন সমালোচক। তিনি মনে

করেন যে, সাধারণ পাঠক যাঁদের রচনায় নিজের মহিমান্বিত মূর্তি দেখে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভোলে, জনগণের প্রাণপুত্তলি তাঁরাই। "তা-ই যদি না হবে তাহলে চার ইয়ারি বা নীললোহিতের রূপরশ্মির প্রতি দৃকপাত না ক'রে আমরা শিশুসেব্য 'দেবদাস' বা 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে মত্ত হব কেন; কেন তাহলে হালখাতার হীরক-দ্যুতি আমাদের মনোগহনে বিকীর্ণ হ'তে পারলো না। প্রমথ চৌধুরী কখনো বিপ্লবের বন্দনা করেননি, কোনো এক কল্পিত স্বর্গরাজ্যের ছবি এঁকে ক্ষুদ্রের অহমিকার খোরাক জোগাননি, ঈর্ষার বা প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার সুযোগ দেননি কখনো।... তাঁর জগতে মানবস্বভাবের কৃত্রিম খণ্ডীকরণের স্থান নেই... যদি কোনো পক্ষপাত প্রকাশ পায় সে একমাত্র মৌল মনুষ্যত্বের প্রতি, আর সেটা সত্যকার পক্ষপাতই নয়। এই নিরপেক্ষতাই বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য এবং সেটাই তাঁর লোকপ্রিয়তার অন্তরায়।"[২৪]

প্রমথ চৌধুরীর ছোটোগল্পের প্রকরণ, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তাঁর ব্যঙ্গনিপুণ ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, নাটকীয়তা ইত্যাদির প্রশংসা করেন বুদ্ধদেব বসু। জীবননাট্যের তিনি অবিচলিত, নিরুত্তাপ ও কৌতুকপ্রিয় দর্শক বলে মনে করেন সমালোচক। প্রমথের ভাষার প্রসাদগুণ, স্টাইল দেখে তাকে গদ্যের অনিন্দ্য শিল্পী হিসেবে অভিহিত করেন তিনি। "ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, অকারণ বিশেষণ প্রয়োগ অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি প্রভৃতি যে-সব দুর্লক্ষণ বাংলা গদ্যের অভিশাপ, তিনি তাঁর রচনায় সেগুলিকে উচ্ছেদ করেছেন।"[২৫] এছাড়া গদ্যরচনায় তাঁর বিদগ্ধ অনুশীলিত মনের প্রশংসা করতে গিয়ে সমালোচক বুদ্ধদেব তাঁর নিজস্ব নন্দন-ভাবনারও পরিচয় দিয়েছেন।[২৬] বাংলা ভাষা চর্চার পরিমিত, সুসভ্য ও সহাস্য চেহারা প্রমথের দান, সে প্রভাব আধুনিক লেখকদের ওপর বেশি করে পড়ুক বুদ্ধদেব সর্বাগ্রে তা-ই কামনা করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা অল্প, তবে অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' (*সাহিত্যচর্চা*) এবং সুকুমার রায় সম্পর্কিত লেখায় একটা তুলনামূলক আলোচনা আছে, প্রথমোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাথে ও দ্বিতীয়টিতে সুকুমার রায়ের সাথে সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। অবশ্য বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে নয়, তুলনা করা হয়েছে যুগপরিবেশ, কবিত্বের চর্চা ও কাব্যের শিল্পগুণ বোঝাতে। বাঙালি কবির পক্ষে বিশ শতকের প্রথম দুই দশককে

সংকটের কাল হিসেবে বিবেচনা করেছেন সমালোচক; এই সময়পর্বে যতীন্দ্রমোহন বাগচীসহ অন্য অনেকেই থাকলেও আলাদা করে চেনা যায় কেবল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের মতে, বাংলা সাহিত্যে এই কবি কেবল 'ছন্দোরাজ'ই হয়ে থাকলেন। এর ঐতিহাসিক কারণ হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনিবার্য ও অসমর্থ অনুকরণ প্রবণতাকে দায়ী করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি; কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের দিতে হচ্ছে। সে মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন ক'রে দিয়েছেন।... তাঁর পরে কবিতা লিখতে হ'লে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে-কাজ তিনি করেননি... আর এইখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়।[২৭]

অথচ সমসাময়িক বা কাছাকাছি বয়সের কবিদের মধ্যে রচনাশক্তিতে তিনি শ্রেষ্ঠ, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ। তাঁর কবিতা বাংলার মাসিক সাহিত্যে পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল; যে দুটি কারণে বিশেষত তিনি এই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তা হল– 'সাময়িক সাহিত্য (topical) বিষয়ক কবিতা লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, দ্বিতীয়ত তাঁর ছন্দ-নির্মাণ কৌশল। তাঁর কবিতার প্রতি আধুনিককালে যে কিছু অনুরাগ সঞ্চিত আছে, তা তাঁর ছন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য। এক হিসেবে ছন্দই তাঁর প্রকাশভঙ্গির একটি প্রধান অঙ্গ।'[২৮] বুদ্ধদেব এসব স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসা কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের খাঁটিত্ব নিয়ে, যেটা সত্যেন্দ্রনাথে তিনি প্রায় খুঁজে পাননি, "তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজ-সরঞ্জাম– সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম, কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, এইরকম প্রত্যেকটি শব্দের বা বস্তুর পেছনে রবীন্দ্রনাথে যে-আবেগের চাপ পাই... সেই প্রাণবন্ত প্রবলতার স্পর্শমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে পাই না, তাঁর কবিতা প'ড়ে অনেক সময়ই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাঁর 'অনুভূতিটাই' কৃত্রিম, কবিতা লেখারই জন্য ফেনিয়ে তোলা।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মাধুর্য, মদিরতা, অন্তর্লীন শিক্ষা-সংযম-রুচিও রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে পাওয়া যায়না, বদলে 'মিহি সুর, ঠুনকো আওয়াজ আর এমন একরকম চঞ্চল কিংবা চটপটে তাল, যা কবিতা অ-পেশাদার পাঠকের কানেও তক্ষুনি গিয়ে পৌঁছয়'। এজন্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন, তাই 'তাঁর হাতে কবিতা হ'য়ে উঠলো লেখা-লেখা খেলা বা ছন্দঘটিত ব্যায়াম।'[৩০] কেবল ছন্দগৌরব উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির নিদর্শন নয়, কাব্যে ভাব ও ভাবোদ্ধৃত রস– বাক্য ও অর্থের বন্ধন স্বীকার

করেই তার ওপরে অবস্থান করে, বুদ্ধদেবের সমালোচনায় এই অভিমত স্পষ্ট হয়েছে। তবে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিন্দার্থে তিনি এসব বলেননি, দাবি করেছেন যে তিনি কেবল ঐতিহাসিক অবস্থাটা সকলের সামনে তুলে ধরতে চান। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রামী উত্থানের কালে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতে দু-তিন দশক লেগেছিল, এর মাঝের সময়টাই সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠীর সময়, ফলে 'সুশ্রাব্য ও অন্তঃসারশূন্য' কবিতা রচনার বিপদ তাঁরা এড়াতে পারেননি বাংলা কবিতার বিশেষ এই অবস্থাটি সমালোচকের ঐতিহাসিক বীক্ষণে ধরা পড়েছে।

সুকুমার রায়

বাংলা শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) অনুপম অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর বেড়ে ওঠা বাংলা শিশুসাহিত্যের সোনালি যুগে; আর তা শিশুসাহিত্যের আরম্ভ ও গুণের বিচারে । সে সময়ে শিশু-চিত্তের প্রতিপালক হয়ে যাঁরা লিখছিলেন, তাঁদের মাঝে ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র আর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবার। সুকুমার রায় উপন্দ্রেকিশোরের পুত্র। 'বাংলা শিশুসাহিত্য' (*সাহিত্যচর্চা*) ও 'কবি সুকুমার রায়' (কল্লোল চৈত্র ১৩৩২) নামে দুটো প্রবন্ধে বুদ্ধদেব সমকালীন শিশুসাহিত্যে এবং কবি হিসেবে সুকুমার রায়ের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। ছেলেবেলার পড়া সেইসব রচনা ১৯৫২-য় চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বুদ্ধদেব সমান আনন্দ নিয়ে পাঠ করেছেন ও গর্বিতভাবে তা সমালোচনাও করেছেন। কারণ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হলেও সুকুমার রায়ের রচনায় অন্তর্নিহিত 'humour এত subtle যে, তা বুঝতে পারার মতো রসবোধ'[৩১] পরিণত বয়সের লোকেরই থাকে। বুদ্ধদেবের মতে, সব বয়সে এসব কবিতা সুপাঠ্য হবার পেছনে আর এক যৌক্তিকতা হলো– আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের শুষ্ক ক্লেশদগ্ধ মরুপ্রান্তরের উপর এইসব সহজ ও নিতান্ত সরল কথা ুদ্ধি দক্ষিণা হাওয়ার মতোই ঝিরঝিরিয়ে ব'য়ে যায়– তার স্পর্শের উন্মাদনা সত্যই অনির্বচনীয়। মানুষের মনের একটি দিক আছে যা গতানুগতিক নিয়ে তৃপ্ত নয়... যেখানে এক চিরশিশু দুর্দম কৌতূহলের বশে নিরন্তর চিররহস্য অন্ধকারে উঁকি মারতে চায়– এই ইন্দ্রিয়গোচর জগতের বাইরের খবর জানবার জন্য যার ঔৎসুক্যের সীমা নেই।[৩২] সুতরাং কেবল হাস্যরসিক ও শিশুসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বলে নয়, বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য লেখক হিসেবেই বুদ্ধদেব সুকুমার রায়কে শ্রদ্ধা করেন একথা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের *খাপছাড়া*, *সে*, *গল্পস্বল্প* আলোচনাকালে সুকুমার-মুগ্ধ সমালোচক খামখেয়ালি সাহিত্যে (nonsense rhyme or literature) সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপরে *আবোল তাবোল* রচয়িতাকে স্থান

দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ইংরেজি ভাষায় 'ননসেন্স রাইম' বলে যে ধরনের ছড়া পরিচিত, সে তুলনায় সুকুমারের *আবোল তাবোল*-এর অপূর্ব কবিতাগুলো কেবল বিশেষত্ববর্জিত নয়, বরং 'অনেক উঁচুদরের nonsense।' কবির হাস্যরসের বিশেষত্ব হচ্ছে তা 'অত্যন্ত সহজ সরল– তার পেছনে কোনো নীরস প্রচেষ্টা নেই;– conscious effort-এর অভাবই হচ্ছে তাঁর হাস্যরসের প্রধান গুণ।' এছাড়া তাতে রয়েছে কণ্ঠস্বরের লাবণ্য, অর্থাৎ তা কৃত্রিমতাবর্জিত; রয়েছে অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস, যে জগত মানুষ তার কল্পনার সুধা দিয়ে প্রতিনিয়ত গড়ছে। সুকুমার রায়ের সমালোচনায় বুদ্ধদেব দেশীয় সমকালীন শিল্পীর সাথে বিদেশী 'ননসেন্স লিটেরেচার' রচয়িতাদেরও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি লুইস ক্যারল (Lewis Carroll, ১৮৩২-১৮৯৮), লিয়র (Edward Lear ১৮১২-১৮৮৮) এমনকি চেস্টর্টনের (G.K. Chesterton, ১৮১৪-১৯৬৩) সাথে তুলনা করা হয়েছে। 'ক্যারলের মতো শিল্পী ও বিজ্ঞানী, লিয়রের মতো একাধারে চিত্রী ও লেখক, চেস্টর্টনের মতো ঠাট্টা আর আজগুবিত্বে স্বভাবসিদ্ধ কবি সুকুমার রায়।' তবে বুদ্ধদেব এঁদের সাথে তুলনা করেও তাঁকে মহত্তর ভেবেছেন তাঁর কবিত্বগুণে। *আবোল তাবোল* গ্রন্থ বিচারে একে বিশুদ্ধ কাব্যরসের অধিকারী বলা যায়, যেখানে কৌতুকের সাথে কল্পনা মিশে যাওয়ায় যে আস্বাদটুকু পাওয়া যায়, তাকে কবিতারই অভিজ্ঞতা বলে চেনা যায়। সুকুমার রায়ের কবিতাগুলোকে সমালোচক তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে মানব-অভিজ্ঞতার অতিকথন জাতীয় কবিতা (human experience exaggerated)। যেমন- 'কাঠবুড়ো', 'কাতুকুতু বুড়ো', 'গানের গুঁতো', 'চোর ধরা', 'সাবধান' ইত্যাদি। দ্বিতীয় কবিতাগুলো অদ্ভুত ও আজগুবি; যথা- 'খিচুড়ি', 'ছায়াবাজী', 'কুমড়োপটাশ' ইত্যাদি। এছাড়া একান্তই স্যাটায়ারধর্মী ও 'সিরিয়াস' কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। সুকুমারের কবিতা-ছন্দ বিষয়ে তাঁর মত :

> বাংলা ছন্দের উপর এমন একচ্ছত্র আধিপত্য ছন্দোরাজ সত্যেন দত্তর পরে এ-পর্যন্ত আর কেউ করেছেন ব'লে মনে হয়না। সুকুমার রায়ের শব্দবিন্যাস অতি সুনিপুণ।[৩৩]

এছাড়া কবির শ্লেষপ্রয়োগ, যমকের ব্যবহার, অনুপ্রাস ও চিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা তথা শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন সমালোচক। সব মিলিয়ে বুদ্ধদেবের কাছে সুকুমার রায় একাধারে কবি ও চিত্রকর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) মৃত্যুর পর 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৬১ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৪) সংখ্যায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেন বুদ্ধদেব বসু। এছাড়া *কালের পুতুলে* 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' নামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। যাঁরা যুগবিচারে বড়ো কবি ছিলেন না, তাঁদের প্রতিও সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর অভিনিবেশ কত তীক্ষ্ণ এবং তাঁর মূল্যায়ন কত অভ্রান্ত ছিল এসব লেখা পড়লে তা বোঝা যায়। তাছাড়া বুদ্ধদেব সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্য-সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ, কাব্যভঙ্গি প্রভৃতি থেকে নবতর যেকোনো নিদর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে কোনো অসাহিত্যিক কারণে নয়। নতুন কবিদের আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বিতা বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশ বিচিত্র ও বিস্তৃত হয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পাক– এ কামনা থেকেও নতুন কবিদের ক্রমাগত আন্তরিক অনুপ্রেরণাসমৃদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বুদ্ধদেব। যতীন্দ্রনাথের *মরুশিখা* (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ সমালোচনাকালে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেন যে যতীন্দ্রনাথ-বাহিত দুঃখবাদ বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। সেইসাথে তিনি স্বীকার করেন যতীন্দ্রনাথের খাঁটি কবিত্বশক্তি, ছন্দকুশলতা, সুনিপুণ শব্দবিন্যাস-উপমা ইত্যাদির অভিনবত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সেদিন যতীন্দ্রনাথের কবিতায় কল্লোলের কবিরা কী পেয়েছিলেন এর জবাবে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, সেদিন তাঁরা আশ্বাস পেয়েছিলেন যে আবেগ নয়, 'সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে।'[৩৪] জেনেছিলেন পরিশীলিত ছন্দ ও ভাষা ছাড়াও কবিতার জাত থাকে। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তার পাশে 'যতীন্দ্রনাথের সরল, বৈঠকী দুঃখবাদে' তাঁরা স্বস্তিবোধ করেছিলেন। উপনিষদের আনন্দবাদে অভ্যস্ত মন ও কানে যতীন্দ্রনাথ এসে শোনালেন ভিন্ন সুর– ব্যঙ্গোক্তি, সংশয়, নেতিবাদ। বললেন :

বন্ধু, বন্ধু গো,
ভালো চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশি নাহি তায় সন্দেহ।

তাঁর 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় আগাগোড়া ঈশ্বর, সৃষ্টি নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ পরিহাস তৎকালীন পাঠকদের সচকিত করে তুলেছিল। প্রেমের রোমান্টিকতা বা দেহবাদিতা অগ্রাহ্য করে যতীন্দ্রনাথ শোনালেন রূঢ় সত্য–

মরণে কে হবে সাথি,

প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।

যা বুদ্ধদেবের ভাষায় 'হঠাৎ এক-একটি আলোজ্বালা, রেশ-তোলা পঙ্‌ক্তি'। আদতে সমালোচনা হয়েও *কালের পুতুলের* লেখাগুলি প্রবন্ধ-নিবন্ধের মর্যাদা পেয়েছে। 'সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর ভাষা ও বাক্যগঠনের চমৎকারিত্ব ও কবিত্ব নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। তা প্রসন্ন, সুন্দর, উজ্জ্বল, গতিময়। খ্যাতকীর্তি কবি ও প্রাবন্ধিক এবং সম্পাদক হয়েও বুদ্ধদেব যেভাবে অগ্রজ ও সমকালীন কবিদের মূল্যায়ন করেছেন তা অসূয়াশূন্য, বোধপ্রদীপ্ত, সৌন্দর্যজাগর রসভাষ্য।'[৩৫]

কাজী নজরুল ইসলাম

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজ'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ঢাকায় এসেছিলেন। জগন্নাথ হলের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব তাঁর সম্মানে জগন্নাথ হলে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন, সবান্ধবে তাঁকে নিয়েও গিয়েছিলেন নিজের পুরানা পল্টনের বাড়িতে। এ ঘটনার বিবরণ তাঁর স্মৃতিকথা *আমার যৌবনে* (১৯৭৬) রয়েছে যেখানে বুদ্ধদেব 'নজরুলকে প্রথম দেখার সুষম স্মৃতি' নিয়ে লিখেছেন। যার সাথে রয়েছে 'হৃদয়ের সংযোগ' সেই নজরুলকে দেখামাত্রই প্রেমে পড়ে যাবার বর্ণনাও রয়েছে। *কালের পুতুলে* (১৯৪৬)-এ 'নজরুল ইসলাম' ও *An Acre of Green Grass* (১৯৪৮)-এ 'Nazrul Islam' নামে প্রবন্ধ রয়েছে বুদ্ধদেবের। দুই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় প্রায় এক। এছাড়া *সাহিত্যচর্চা* (১৯৫৪) গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম সর্ম্পকিত বিবেচনা রয়েছে।কাজী নজরুল ইসলামকে বুদ্ধদেব চিহ্নিত করেন 'স্বভাবকবিরূপে' আর রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় তিনিই মৌলিক কবি এই অভিধা দেন। ব্যক্তিজীবনে নজরুলের বেড়ে ওঠা, জীবনযাপনের ভিন্ন পরিবেশ তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে সহজ করেছিল, তাই কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েও শুধু 'আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।'[৩৬] নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন নজরুল, তবে 'তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ থাকলেও সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।' সাহিত্যিক বিদ্রোহ বলতে বুদ্ধদেব সম্ভবত নির্দিষ্ট কোনো শিল্পভাবনাসমৃদ্ধ রচনা ও বিশেষ কাব্যাঙ্গিকের প্রচেষ্টা বুঝিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, কবিতার যে আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুল-ও তাই। ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথের নিদর্শন নজরুলে সুপ্রচুর। কারণ, নজরুল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে

এলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁর কবিতায় 'সত্যেন্দ্রীয় আমেজ' থাকাটা স্বাভাবিক বলে মনে করেছেন সমালোচক। কিন্তু প্রথম থেকেই যে তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তাঁর স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন বুদ্ধদেব তা বরাবরই বলেছেন। এ কারণেই তিনি বলেন, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। যুদ্ধ-প্রত্যাগত নজরুলের কবিতা বুদ্ধদেবের কাছে এক উন্মাদনার সুর নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালের সেই স্মৃতিচারণ করে সমালোচক বলেন :

> 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে– মনে হ'লো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো এ যেন তা-ই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।... [কবিতাগুলোর] প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাঁর নিখাদ-নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগল।[৩৭]

পাশাপাশি বুদ্ধদেব এই সত্যও জানান, 'নজরুল চড়াগলার কবি ও লোকপ্রিয়, 'অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর রচনার প্রধান গুণ এবং প্রধান দোষ'। তাছাড়া "বায়রণ প্রসঙ্গে গ্যেটের উক্তি নজরুল সম্বন্ধেও বলা যায়– 'The moment he thinks, he is a child'।" তাঁর লেখায় সমালোচক ধীশক্তি দেখেননি, যৌবনের তারল্য সেখানে ঘন হয়নি, 'জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত' করেনি; 'প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেতনতার অভাবে।' তাছাড়া তাঁর রচনায় আছে চিন্তাহীন অনর্গলতা আর 'কাঁচা, কড়া, উদ্দাম শক্তি' অথচ তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর সাহিত্যকর্মে হয়নি, এজন্য দায়ী নজরুলের 'আত্ম-অচেতন মনের অনেক হেলাফেলা, অনেক অপচয়।'[৩৮] নজরুলকে সমগ্রভাবে বিচার করে বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে তাঁর রচনাবলির মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁর গানের। কারণ "গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন।... বীর্যব্যঞ্জক গানে– চলতি ভাষায় যাকে 'স্বদেশী গান' বলে– রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁর স্থান এবং সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালের উপরে।... নজরুল সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই করে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়; সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ।[৩৯]

*আমার যৌবনে*ও নজরুলের গানের প্রতিভা সর্ম্পকে বুদ্ধদেব লেখেন- "তাঁর স্বকণ্ঠে তাঁর গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁর রচনা-প্রক্রিয়ার দর্শক ছিলেন যাঁরা, শুধু তাঁরাই জানেন নজরুলের পক্ষে গান জিনিশটা কত

সত্য ছিলো ছিলো কত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।"[৪০] নজরুলের গান তাই তাঁর কবিতার চেয়ে তৃপ্তিকর হয়ে উঠেছিল বুদ্ধদেবের কাছে। এ মুগ্ধতা থেকেই বিদ্রোহী বা সাম্যবাদী কবিরূপে নজরুল স্মৃতিজীবিত হবেন কিনা সংশয় প্রকাশ করে বলেন– 'কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়।' এ মন্তব্য একেবারে অযৌক্তিক না হলেও কবি হিসেবে নজরুলের কবিতাকে বুদ্ধদেব যতখানি বালখিল্য[৪১] ভেবেছেন, তা সর্বদা মেনে নেওয়া যায়না। নজরুল-চর্চার মাধ্যমেই এটা স্পষ্ট যে, বিদ্রোহ-চেতনা কীভাবে কালোত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁর প্রেমবোধ ও জীবনের যন্ত্রণাক্ষুব্ধ অনুভূতিও গভীরভাবে কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য নজরুলের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর ও অব্যবহিত আঘাতের শক্তিকে স্বীকার করেই বুদ্ধদেব বলেন– রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই আজ উজ্জ্বলতম সেতু বলে মনে হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যলেখক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের (১৯০৪-২০০২) স্থান প্রথম শ্রেণিতে' বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা নিয়েই আলোচনা করেছেন 'নূতনা রাধা' প্রবন্ধে (*কালের পুতুল*)। 'গদ্যসতিনের' চাপে তাঁর কবিত্ব অবগুণ্ঠিত হয়েছে বলেও তিনি মনে করেন। তবে তাঁর 'নূতন রাধা'র অন্যান্য কবিতায় বুদ্ধদেব দেখেছেন, 'ভাববিলাসী নবযৌবনের সহজ আবেগ' ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে প্রখর সচেতনতা এবং উইলিয়ম মরিসের মতো ইনি একজন 'সুখী কবি'। শুধু প্রিয়ার নয়, সমস্ত পৃথিবীর প্রেমেই এই কবি পাগল। তাঁর লেখার মধ্যে আছে wit-এর দ্যুতি। 'কবিত্বের সঙ্গে হাসিঠাট্টার বিবাহ ঘটাতে' অন্নদাশঙ্কর পাকা পুরোহিত এবং এরই চর্চা করা তাঁর দরকার, বুদ্ধদেব বলেছিলেন ১৯৪২-এ। 'পুনশ্চ' অংশে তিনি ১৯৪৫-এ জানালেন, 'ছড়ার মধ্যে আবিষ্কার করছেন' কবি অন্নদাশঙ্করকে; যে ছড়া নিছক শিশুপাঠ্য নয়, বয়স্কপাঠ্য। তাঁর 'হালকা কবিতা' বা ছড়াগুলি বুদ্ধদেবের রসগ্রাহিতায় 'ছোটো এবং আঁটোসাঁটো; লঘু অথচ তরল নয়; উজ্জ্বল কিন্তু উগ্র নয়... ছন্দে মিলে বাক্‌চাতুর্যে, কৌতুকের বক্রতায়, ইঙ্গিতের বিকিরণে প্রায় প্রতিটি পদ্যই যথোচিত।' সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে ছড়া লিখলেও সেখানে তাঁর 'শিল্পী-মনই প্রকাশ পেয়েছে।' বুদ্ধদেব সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে ছড়া লেখার প্রবণতাকে বলেছেন 'পদ্য-সাংবাদিকতা।' তাই তথ্য নয়, বিষয়-অতিক্রান্ত রূপের কারণে তাঁর ছড়া সাময়িকতার গণ্ডি ভেঙেছে। শিল্পের প্রতি বুদ্ধদেবের এই রকম মূল্যায়ন আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা যায়। কেন গদ্য লেখক অন্নদাশঙ্করের কবিরূপ বুদ্ধদেব মেনে নিয়েছিলেন, তা তাঁর কবিতা ও ছড়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানো যায় :

১. সারাদিন ভর পদে-পদে ব্যর্থতা
তিক্তমনের বিরস রুক্ষ কথা
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত-
এই কি মোদের বহু দিবাবাঞ্ছিত
পদ্মার চরে বাস। (জর্নাল থেকে)

২. তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যেসব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা! (খুকু ও খোকা)

মশায়!

৩. দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।

কবিতা হিসেবে এগুলির উপভোগ্যতা আজও খুব একটা কমেনি বলে অনেক সমালোচক মনে করেন।[৪২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক কবি ও কবিতা : মতাদর্শিক অবস্থান ও নান্দনিক রূপাদর্শ

জীবনানন্দ দাশ

ক.

'কালের পুতুল' গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশকে (১৮৯৯-১৯৫৪) নিয়ে রচিত প্রবন্ধ তিনটি। জীবনানন্দের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রচনাই বেরিয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায়। বিশেষত *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের সিংহভাগ মুদ্রিত হয় এতে। জীবনানন্দের কাব্য আলোচনার শুরু যে বুদ্ধদেব করেছিলেন, পরে বহুবার এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি তা জানিয়েছেন। যে দুই-আড়াই বছর 'প্রগতি'র বয়স, তাতে তাঁর স্মরণীয় কাজ জীবনানন্দের কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা। জীবনানন্দ-বিরোধিতাকে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন, তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিবাদ করা বিশেষভাবে তাঁর কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দের প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্যদের তুলনায় বেশি পৌনঃপুনিক, যার অনেকটা অংশই প্রতিবাদ। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে 'মাসিকী' বিভাগে (১৩৩৪) বুদ্ধদেব লিখেছিলেন :

> পত্রিকার সম্পাদনার কাজ যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের হাতে একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্যের ভার থাকে– সে হচ্ছে অজ্ঞাত প্রতিভা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য-সমাজে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সত্যিকারের প্রতিভা কারও পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু আত্মবিস্তৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেলে তা শুকিয়ে যেতে পারে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু স্মরণ করেন যে জীবনানন্দের প্রথম যে কবিতাটি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে 'নীলিমা'। জীবনানন্দের 'নীলিমা' যখন বের হয় তখন মাত্র সতের বছরের বুদ্ধদেব (১৯২৫) ঢাকার একটা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। কিন্তু তিনিই সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড় অপরিচিত কবিকে আবিষ্কার করে সামনের সারিতে নিয়ে আসেন।[৪৩]... জীবনানন্দ নিজে প্রগতি পত্রিকার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রভাকর সেন নামে এক স্নেহার্থী যুবক-কবিকে জানিয়েছিলেন[৪৪]:

> বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদের বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথায় নয়; স্পষ্টতাসম্ভব তারা; অতএব সাহস ও সততা

> দেখাবার সুযোগ লাভ করে চরিতার্থ হলাম– বুদ্ধদেব বসুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে।

জীবনানন্দের বক্তব্য যথার্থ; তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ১৬৭টি কবিতার ১১১টি প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর পৃষ্ঠপোষকতায়। বুদ্ধদেব প্রাথমিকভাবে জীবনানন্দকে চিহ্নিত করেছিলেন 'প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি' হিসেবে। এক হিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি একথা মানলেও সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন'[৪৫] এমন কবিকেই বিশেষ ভাবে প্রকৃতির কবি বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। অবশ্য এ কথা বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল, যখন *ধূসর পাণ্ডুলিপি* নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের রূপ পেল। যদিও জীবনানন্দের সমস্ত কবিতাই কোনো না কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা বলে মনে করেন তিনি। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পড়তে পড়তে সমালোচক কবির মৌলিক সৃষ্টিপ্রেরণা ও নতুন কবিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। কবিতাগুলোতে তিনি আরো খুঁজে পেয়েছেন এক আদিম অপূর্বতা, 'মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন; এই কবিতাগুলোয় ছিলো সেই সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা।'[৪৬] জীবনানন্দের কবিতায় এই সুরের সম্মোহন সৃষ্টির ব্যাপারটা বুদ্ধদেব বসু আগাগোড়াই উপলব্ধি করেছেন। এ কারণে বলেন, 'জীবননান্দের কবিতায় যেটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ব'লে আমার মনে হয় সেটি– একটি সুর, আর-কিছু নয়।'[৪৭] অবশ্য কবিত্ব সুর ছাড়া আর কিছু কি? বুদ্ধদেব এ প্রশ্ন তোলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব না পড়া জীবনানন্দীয় কবিতাগুলোতে নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি রয়েছে, সমালোচকের মতে :

> যে দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হয়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। অতি ক্ষুদ্র উপাদান নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সংগীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষণে তা ধরা দিতে চায় না। ...ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও প্রতিধ্বনিতে মনে হয়, যেন এই কবিতাগুলি আঁকাবাঁকা জালের মতোই ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটা সুদূরতা ও নির্জনতা; আমাদের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোনো আকাশে অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথা তিনি রচনা করেছেন। ...প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।[৪৮]

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাগতিক রূপকথা রচনার জীবনানন্দীয় পরিতৃপ্তির সাথে পাঠকের রূপমুগ্ধ বিহার কিংবা এ জগতের রস আস্বাদন তখন অল্প হলেও চলছিল। তাঁর কবিতা পাঠককে তখনকার তথাকথিত আধুনিক

বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মতো শব্দপীড়িত করে নি। তাঁর কবিতা বুদ্ধদেবের মতে, জাদুমুগ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো লেখেন :

> এ-কথা ঠিক যে ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র বাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে। ...জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যায়;– সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো। ...[সেইজন্যই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় 'renascence of wonder' ঘটেছে।[৪৯]

অবশ্য 'জীবনান্দ দাশ-এর স্মরণে' প্রবন্ধেই জীবনানন্দের রোমান্টিকতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের ভিন্নতর মূল্যায়ন হল :

> [তিনি] বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের আলোড়নের নয়– তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হ'য়েও তাই তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো। অর্থাৎ, এক হিশেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।...বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে– তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশ দ্বারা কখনো সংক্রামিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল ; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি– 'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো–একেবারেই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত ও তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়।

'জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল, মৃত্যুতে সব-কিছুরই সমাপ্তি, এই আদিম বেদনা জীবনানন্দর কাব্যের ভিত্তি'– *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বিষয়ক আলোচনায় করা বুদ্ধদেবের এই মন্তব্যকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। জীবনানন্দের কবিতায় তাঁর মৃত্যু-বোধ জীবনকেই ছায়ার মতো অনুসরণ করে না কি তীব্র জীবন-প্রীতি মৃত্যুকে আকর্ষণ করে তা সবসময় বোঝা যায় না। তবে এটি নিশ্চিত, সাধারণের চেনা যে মৃত্যু, এ মৃত্যু সেরকম নয়। সেখানে নতুন মুহূর্ত অবিরল জন্মায়, আর জন্মলগ্ন থেকেই জীবনের দেহে নিত্য স্পর্শ

বোলায় মৃত্যু। বুদ্ধদেবের বক্তব্যে 'আদিম বেদনা' আসলে কবির আদিম প্রেরণা; মুত্যু ও জীবনের বোধকে যা স্বাভাবিক করে তোলে। "মৃত্যুর আচ্ছন্নতার চেয়েও অধিকতর কিছু প্রকাশ করে, এরকম মৃত্যু জীবনানন্দের অনেক কবিতায় পরিব্যাপ্ত। বিশেষত তাঁর সনেটগুলো। এগুলোর কোনোটিতে কবি মানবজাতিকে বর্জন করে মরণোত্তর সময়ে রূপান্তরিত হতে চান বাংলার বৃক্ষ ও পাখিতে। আবার কোনোটিতে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে চলে যাবেন, শুধু যদি মৃত্যু নিয়ে যায় তাঁকে। এখানেই তাঁর সংকট– বাংলার প্রতি সুনিশ্চিত উদ্বেলিত আবেগ ও মৃত্যুর প্রলোভনের মধ্যকার সংঘাত"[৫০] :

কখন মরণ আসে কে বা জানে– কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে– ছিঁড়ে ফেলে গাঙচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো– তবু যেন মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়– যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখেথ– রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারই নিচে শুয়ে থাকে যেন আমি অধর্নারীশ্বর।

সুতরাং মৃত্যুর পরও প্রাকৃতিক বাংলা তাঁর সঙ্গে থাকবে, তাই তিনি কামনা করেন অর্ধনারীশ্বর হতে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য– বিষন্নতার পাশাপাশি শ্মশানে বসবাস করেও কবি বাংলার প্রকৃতি থেকে সান্ত্বনা পান, যদিও থেকে যায় মৃত্যুর কঠোর সত্য। 'ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে ...বয়ে'– জীবনানন্দ তাঁর নিজের মৃত্যুকে রূপান্তরিত করেন মধুর ভীতিহীন নিদ্রায় :

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে;
তখনও যৌবন প্রাণে লেগে আছে হয়তো বা– আমার তরুণ দিন
তখনও হয় নি শেষ– সেই ভালো– ঘুম আসে– বাংলার তৃণ
আমার বুকের নিচে চোখ বুজে– বাংলার আমের পাতাতে
কাঁচপোকা ঘুমায়েছে– আমিও ঘুমায়ে রব তাহাদের সাথে,
ঘুমাব প্রাণের সাধে এই মাঠে– এই ঘাসে– কথাভাষাহীন
আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে– অনেক নবীন
নতুন উৎসব রবে উজানের– জীবনের মধুর আঘাতে।

এইসব সনেটকে যদি 'পরাক্রমশালী সৌন্দর্যকে মেনে নিতে সচেষ্ট শক্তিশালী আবেগের মিশ্রণে সৃষ্ট খণ্ডচিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে বিস্ময়কর লোভনীয় জীবনের মুখোমুখি মৃত্যু: এই দুর্বহ সত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কবির নিষ্ফল সংগ্রামের দৃশ্যমান ইতিহাস হয়ে কবিতাগুলো সামষ্টিকভাবে একটা বাড়তি মাত্রা লাভ করে।'[৫১]

জীবনানন্দের কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায়। দুটি মহাযুদ্ধ, খণ্ডিত স্বদেশ; আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বিপর্যয়, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে এক অবসাদগ্রস্ত বাস্তবতায় আক্রান্ত কবির অনিবার্য আশ্রয় প্রকৃতি,সেই অনুষঙ্গে মৃত্যু ও জীবনের প্রতি দ্বান্দ্বিক আকর্ষণ ; বিশেষত অন্ধকার ও মৃত্যুর কাছে আশ্রয় নেবার অমোঘ আকাঙ্ক্ষা– এই সবই সমকালের চেতনা-জারিত; বুদ্ধদেবের সমালোচনায় তা স্পষ্ট হয়নি। জীবনানন্দের কবিতার রোমান্টিক উপাদানকে তাঁর কবিসত্তার মৌলগুণ চিহ্নিত করে বিচার করেছেন তিনি।

জীবনানন্দের কবিতার দুটো ধারা শনাক্ত করেন বুদ্ধদেব বসু। বিভাজিত একটি ধারাকে তিনি বলছেন বিশুদ্ধ বর্ণনার অথবা স্মৃতিভারাতুর, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত। যেমন : 'মৃত্যুর আগে' 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'নির্জন স্বাক্ষর', '১৩৩৩', ইত্যাদি। অন্যদিকে আছে, যে-সব কবিতা 'মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।'[৫২] এর মাঝে উল্লেখ্য কবিতাগুলো হলো : 'বোধ, 'ক্যাম্পে', 'লাশ-কাটা ঘর' বা 'আট বছর আগের একদিন'।

বর্ণনার ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে জীবনানন্দীয় কবিতার এরকম আরো কিছু বিভাজন করেছেন সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। যেমন- আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্য-বিভাগ। প্রথমত– সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা বা যে-কবিতার সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে। এ ধরনের কবিতার মধ্যে রয়েছে: 'মাঠের গল্প', 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা'। দ্বিতীয়ত- আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ করেছে; যেমন- 'অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস', তৃতীয়ত– যে সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর

অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। যেমন- 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'।

'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতার বিস্ময়কর গঠনে মুগ্ধ সমালোচক, যে কবিতার আরম্ভ অন্ধকারে, যার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' পাঠকের মনে "এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয়না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন- 'হায় চিল'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হ'য়ে উঠলো- 'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।"[৫৩]

সৌন্দর্য ও স্বপ্নচারিতায় জীবনানন্দ পুরোপুরি রোমান্টিকদের মতো নন, এসবের পেছনে তাঁর মনে এক নিষ্কৃতি বা অবগতি পাওয়ার গোপন অনুক্রিয়াও রয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রকৃতিতে-জীবনাচারে, যেখানে যা সৌন্দর্য আছে, তাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে-মন দিয়ে যেন উপভোগ করেছেন তিনি। জীবনানন্দকে জীবনের কথা, সমাজ-দেশ-পৃথিবী ও সভ্যতার কথা যেভাবে বলতে শোনা যায়, তার দু'একটি হল :

১. 'কবিতা ও জীবন এক-ই জিনিসের-ই দুই রকম উৎসারণ।'
২. '...সময়-প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।'[৫৪]

বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো লিখে ওঠা কবির জীবন-চেতনায়নের ক্ষেত্রে বড় ঘটনা। '*মহাপৃথিবী*তে এসে জীবনানন্দ সদর্থক জীবন-প্রত্যয়ের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ এবং সূক্ষ্ম চিন্তায় শাণিত,পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। বুঝে নিয়েছেন, মানুষকে সাহায্য করার জন্য নিরন্তর বয়ে চলেছে সময়ের প্রবাহ অপরূপ রূপ-লাবণ্য ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির সুনিয়মিত আবর্তন-বিবর্তনে, রয়েছে ইতিহাস– এদেরই অর্থময়তা থেকে প্রাজ্ঞ করে নিতে হবে চেতনাকে।'[৫৫] কবিতা-পর্যালোচনায় সংক্ষেপে হলেও বারবার

জীবনের সম্ভাবনাকে খুঁজে নেয়া এই কবির কিছু কবিতা পুনর্বার পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দের 'অসংরক্ত-অমানবিক জগতে শ্রান্তি' বোধ করলে পাঠককে 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাদ্বয় পাঠ করতে বলেছেন তিনি। তাঁর মতে :

> জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও স্তরবহুল; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই 'স্বচ্ছল' ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি (জাগিবার কাল আছে–দরকার আছে ঘুমাবার;/এই স্বচ্ছলতা আমাদের) নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন ক'রে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের ভায়বহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারীদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে জীবনের গম্ভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখলে আলোচনার সহায়ক হতে পারে।[৫৬]

জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৪ সালের চৈত্র সংখ্যায়। স্থান পেয়েছে কবির মধ্যপর্যায়ী *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থে। কবিতাটি মৃত্যু অতিক্রমী জীবনের জয়গাথা; তবে তা জীবনের বিস্ময়কে স্মরণে জ্বেলে রেখেই। বুদ্ধদেবের মতে, "যদি অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতাটির শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হ'তো না।... ঠিক শেষের ক–লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম– যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো– কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটিকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারে নি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জ'পে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন– 'আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'– মৃত্যু পার হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি, আর– সেই সঙ্গে– নির্বোধ ও পাশবিক জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।"[৫৭]

জীবনানন্দ দাশের কবিসত্তার 'নির্জনতা' বিষয়ে সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য সমকালে ও দীর্ঘ সময় ধরে পরবর্তীকালের জীবনানন্দীয় কবিতার ভাব বিচারে নানাভাবে উপজীব্য হয়েছে।[৫৮] এই সুশোভন

অভিধা কাব্য বিশ্লেষণে সমালোচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে বলেই *কালের পুতুল*-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (ডিসেম্বর, ১৯৫৮) বুদ্ধদেব বসু লেখেন :

> বইখানা প্রায় পূর্বের আকারেই পুনঃপ্রকাশ করা হ'লো এই ভরসায় যে পরবর্তী সমালোচকেরা, জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলার সময় অন্তত তাতে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করবেন।

এছাড়া উক্ত গ্রন্থের 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে লেখেন :

> তাঁর (জীবনানন্দ দাশ) অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক্ষ'য়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'– তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা'... [৫৯]

জীবনানন্দ নিজেও তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা*র ভূমিকায় এ বিষয়ক মন্তব্য করেছেন। তিনি এই অভিধাটিকে আংশিক সত্য বলে মানেন, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। তবে বুদ্ধদেবের প্রয়োগ করা এই বিশেষণ জীবনানন্দের কবি-স্বভাবের একটি দিককে চিহ্নিত করে, তা তাঁর সমগ্র কবিসত্তার পরিচয় নির্ণীত হবার একমাত্র উপায় নয়। সেরকম হওয়া যে অনুচিত, পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনানন্দ সমালোচনায় তাঁর মতাদর্শের রূপান্তর লক্ষ করেও তা বলা যায়।[৬০] সুতরাং 'সবচেয়ে নির্জন' এই অভিধাটি সঠিক বিশিষ্টতাসঞ্চারী হয়ে ওঠেনি। এ পর্যায়ে 'নির্জনতা' অর্থে সমালোচক কী বুঝিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বলা যায়, মূলত তা বাংলা কব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাকে ও অন্য অর্থে স্বাতন্ত্র্যকেই নির্দেশ করা হয়েছে মাত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে কবি জীবনানন্দ তাঁর মনোলোকে 'সুদূর ও স্বপ্নাবিষ্ট' বটে, কবির একান্ত নিজস্ব সে জগত 'রূপকথার জগতের মতোই আমাদের আত্মসাৎ করে নেয়।'[৬১] তবে সেটাই বুদ্ধদেবের মতে একমাত্র সত্য নয়। তিনি জীবনানন্দের কবিতার আঙ্গিক বিশ্লেষণ করেও নির্জনতা অর্থে স্বাতন্ত্র্যকে বোঝান; আর সেটি বিশ্লেষণের চেয়ে একান্ত অনুভবযোগ্য বলে মনে

করেন। 'নির্জন বিষন্ন কবিপ্রাণেরই ক্ষরণ' হিসেবে কবিতার আঙ্গিক-অভিনবত্ব কিংবা বিষয়-বৈশিষ্ট্যও একাকার হয়ে যায়। বুদ্ধদেব বলেন :

> আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা ঘাত প্রতিঘাত তাঁকে যে স্পর্শমাত্র করেনি, এটাকে নিন্দে ক'রে বলা যায় যে তিনি আত্মকেন্দ্রিক, প্রশংসা ক'রে বলা যায় যে তিনি আত্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান। আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে সেই-যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে-মাঝে আমরা দেখতে পাই, যার দেশ নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থানপতন পার হ'য়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্ত প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে আঘাত করে, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায়–[৬২]

খ. জীবনানন্দের কাব্যশৈলী বিচার

বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ-সমালোচনার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কবিতার শিল্প-প্রকৌশল বিষয়ক পর্যবেক্ষণ। জীবনানন্দের বিচিত্র ও সাংকেতিকতাময় উপমা, বিশেষণ ও ভাষা-প্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার তাগিদ অনুভব করলেও বুদ্ধদেব রচিত *কালের পুতুল* গ্রন্থে সংকলিত তিনটি প্রবন্ধে রয়েছে নানা কবিতার আঙ্গিক বা শিল্পরূপ ভাবনা। তাছাড়া কবি হিসেবে জীবনানন্দের শব্দ-প্রয়োগ প্রধান শিল্প-স্বভাব বা নানা বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছেন বুদ্ধদেব বসু। ১৯৩৫-এ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' প্রকাশিত হতেই এতে জীবনানন্দের তেইশটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতে ছাপা হল 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি। এছাড়া ছাপা হল প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখদের কবিতা। বুদ্ধদেব 'কবিতা'র সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় সবক'টি কবিতার উপর মন্তব্য করে পত্রের শেষাংশে জীবনানন্দের কবিতা সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> জীবনানন্দ দাশের চিত্র রূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। [৬৩]

আরো পরে, জীবনানন্দের প্রথম 'আত্মচারিত্রিক' কবিতাগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাতে লক্ষ করেছিলেন 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ'। রবীন্দ্র-উক্ত 'চিত্ররূপময়' অভিধাটি বিশেষভাবে বুদ্ধদেব বসুকে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ আলোচনাগুলোতে 'নির্জনতার কবি' 'প্রকৃতির কবি' অভিধাগুলো খানিকটা রবীন্দ্র-মন্তব্য প্রভাবিত। *বনলতা সেন*-এর উপরে রচিত প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখলেন– 'তার বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।' আবার *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বিষয়ক আলোচনায়

বুদ্ধদেব এ প্রসঙ্গে বলেন– "তাঁর একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'; জীবনানন্দর সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এই আখ্যা প্রযোজ্য। ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে; বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের। গন্ধ ও স্পর্শ দিয়ে অনেক অপরূপ অভিজ্ঞতা আমরা সংগ্রহ করি; কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জীবনানন্দের মতো এত পূর্ণমাত্রায় আমাদের আর কোন্ কবি ব্যবহার করেছেন জানি না।"[৬৪] এ পর্যায়ে জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতা থেকে যে দুটো স্তবক তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলোকে বলছেন 'কয়েকটি ছবি', তা হল :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে–পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ–মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জোছনার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ–বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে। [মৃত্যুর আগে, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

জীবনানন্দের সমস্ত কবিত্বলক্ষণ যেন স্তবক দুটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। 'দৃষ্টি, স্পর্শ ও গন্ধের বিচিত্র ভোজ' যেন বসে গেছে স্তবকসমূহে, কোনো শব্দের যেখানে উল্লেখ নেই, প্রকৃতি এখানে শান্ত, সান্ধ্য, স্বপ্নাচ্ছন্ন, শব্দহীন।[৬৫] বুদ্ধদেবের মতে, কবিতায় এই ইন্দ্রিয়স্বাদের অবিমিশ্র প্রকাশ অনেকেই করেন না বা করতে পারেন না। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার তুলনা সমালোচক কবি কীটস ও সুইনবার্নের কবিতার সাথেও করেন । তিনি বলেন–

> আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে জীবনানন্দর চেতনা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই, উপদেশ নেই, তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি; তা নিছক কবিতা ছাড়া আর-কিছুই নয়।[৬৬]

'প্রগতি' যখন বেরুলো, তখন বুদ্ধদেবের আমন্ত্রণে জীবনানন্দের অনেক কবিতা ছাপা হতে থাকে পত্রিকাটিতে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রতিক্রিয়া :

> কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম– এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়সচেতন জগৎ যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাস পতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।[৬৭]

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দের কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো, সেখানেও বুদ্ধদেব এনেছেন চিত্ররূপময়তার প্রসঙ্গ। 'সহজ' *(ধূসর পাণ্ডুলিপি)* কবিতাটি প্রসঙ্গে এ আলোচনায় বুদ্ধদেব বলেন :

> জীবনানন্দবাবুর বহু কবিতায় পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subduded ।[৬৮]

সুতরাং 'ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে জীবনানন্দ অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ' বলে মনে হয় বুদ্ধদেবের। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক*-এ (১৯২৭) জীবনানন্দ ছিলেন একেবারেই চিত্ররূপময়। ক্রমশ তাঁর চিত্ররূপময়তা চিত্রকল্প ও প্রতীকে উন্নীত হয়। *বনলতা সেন* (১৯৪২) থেকেই এই অভিযাত্রা ব্যাপকভাবে সূচিত হয়েছিল। অর্থাৎ *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭) রচনার সমকালেই। সুতরাং চিত্ররূপময়তা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিংবা বুদ্ধদেবের মন্তব্য জীবনানন্দের আবহমান কবিতা সর্ম্পকেই প্রযোজ্য রয়ে গেছে।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'কবিতা তো উপমা নিয়েই, উপমা নিয়েই তো কবিত্ব।' জীবনানন্দের বরাত দিয়ে বুদ্ধদেব বসুও লিখেছিলেন, 'উপমাতেই কবিত্ব।' বাংলা অলংকার হিসেবে বৃহত্তর এই উপমার অধীনে দুটি উপচার– চিত্রকল্প ও প্রতীক জীবনানন্দ অজস্র প্রয়োগ করেছেন তাঁর কবিতায়। এইসব উপমা

কবির হাতে সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে ধরা দিয়েছে। 'তাঁর অনেক উপমাই আক্ষরিক নয়– তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হয়– যেমন হয় গানের পরে অনুরণন।'[৬৯] এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব আরো বলেন :

> যত উপমায়, যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ করেন, সেগুলি ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক ; চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক' ; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর। তাঁর এই বিশেষত্বই কাট্‌স ও প্রির‍্যাফেলালাইটদের কথা মনে করিয়ে দেয়।[৭০]

> বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার বাহন তাঁর উপমা। উপমার এমন ছড়াছড়ি আজকালকার কোনো কবিতেই দেখা যায় না। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ। এক-একটি উপমাই এক-একটি ছোটো কবিতা হ'তে পারতো। তিনি যে-জাতের কবি তাতে উপমাবিলাসী না-হ'য়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য।[৭১]

অবশ্য জীবনানন্দের ব্যবহৃত উপমাগুলোকে বিশ্লেষণ করে উপমা কথাটাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সমালোচক– ভাষায় কবির যেটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা– কোনো অভিনব বিশেষণ, কিংবা কোনো পুরোনো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্যপদের প্রতীকী প্রয়োগ– এ সমস্তই মূলত উপমা। বুদ্ধদেবের মতে এই অর্থ স্বীকার ক'রে নিলে বলা যায় যে উপমা পরীক্ষা করলেই একজন কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।[৭২] কবির ব্যবহৃত উপমায় যে গভীর জীবন-দর্শন, আবেগের আন্তরিকতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়, বুদ্ধদেব সেদিকেই ইঙ্গিত করেন। এছাড়া উপমাগুলো কেবল চিত্র নয়; এগুলো কবির চিন্তা আর তা অধিকাংশই তুলনাগত নয়, মনোগত। বুদ্ধদেবের বাছাইকৃত কয়েকটি জীবনানন্দীয় উপমা বা উপমা-সদৃশ অলঙ্কার-প্রতীক-চিত্রকল্প হল :

- বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?
- পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন–

  [বনলতা সেন]

- এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার– আধো ঘুমের ভিতর হয়তো–
  মাথার ওপর মশারি নেই আমার,
  স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে! [হাওয়ার রাত]

- পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
  রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
  তোমার নগ্ন নির্জন হাত;
  তোমার নগ্ন নির্জন হাত। [নগ্ন নির্জন হাত]

- হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে
  দিগন্ত প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
  মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
  জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়! [হাওয়ার রাত]

প্রথমোক্ত উপমাটিতে চোখের রূপের বর্ণনা কবি করেননি, করেছেন মনোভাবের বর্ণনা। এ উপমা উপলব্ধি করতে হলে তাই হৃদয় ও মন দিয়ে অনুভব করতে হবে। বুদ্ধদেবের মতে, নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ– এ সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকালব্যাপী ভাবের চিত্রকল্প, তা অনুভব করলেই কবিতাটির মর্মস্থলে পৌঁছুতে পারা যায়। এছাড়া নানা উপমার মাঝে কবির নিছক গভীর কল্পনাশক্তি পাঠককে মুগ্ধ করে, আর মদির সেই সব কল্পনা থেকে ফুটে ওঠে দৃঢ় রেখার উজ্জ্বল রঙের ছবির মিছিল– 'নগ্ন নির্জন হাত' পুরো কবিতাটি এরকম। আবার কখনও কখনও এক-একটি চিত্ররূপ থেকেই আবেগের আঘাত উৎসারিত বলে আবিষ্কার করেন সমালোচক। যেমন, উল্লিখিত চতুর্থ উদাহরণে পরপর চারটি বিশেষণকেই অত্যন্ত সার্থক মনে করেছেন বুদ্ধদেব। বিশেষত, 'বলীয়ান রৌদ্র'– এই শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পড়লেই মনে হয় রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আবার এরই পাশে পাশে 'পরদায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ'– বাক্যটি চিন্তা করলে রোদ জিনিষটাকে এক স্থাপত্য কর্মের মতো ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগে। বুদ্ধদেবের মতে, 'রক্তাভ রৌদ্রর বিচ্ছুরিত স্বেদে' দৃষ্টি ও স্পর্শের যে বিবাহ ঘটেছে তার আনন্দে পাঠকের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলিত হতে থাকে। আবার 'নগ্ন নির্জন হাত' চিত্রটি যেন 'একটি still life, শুধু ঐ হাতখানা তাকে মানবিক ব্যাকুলতায় স্পন্দিত ক'রে তুলেছে।'[৭৩] জীবনানন্দের উপমা এভাবেই ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে অনুভূতিতে নাড়া দেয়, আবার একই সময় এক 'দূরতিক্রম্য' অতলৌকি আবহাওয়া আমাদের আচ্ছন্ন করে দেয়। বুদ্ধদেব বলেন :

> যেহেতু তিনি (জীবনানন্দ) মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ।[৭৪]

কেবল বিশেষণ-ই নয়, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা কিংবা চিত্রকল্পের তফাৎ সত্ত্বেও জীবনানন্দ তা এক আশ্চর্য প্রকৌশলে উপমা-রূপেই শিল্পিত করেন। বুদ্ধদেব এরকম টুকরো টুকরো অনেক উপমা উদাহরণ হিসেবে দিয়েছেন। যে দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ কখনো কখনো তাদের একত্র করে দুটোকেই আরো স্পষ্ট করে ফোটাতে পেরেছেন। যেমন–

- কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস
- শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা

আবার যে দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অসদৃশ, তাঁদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে কবির বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি ' চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতী জানালার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক প্রবল নিস্তব্ধতা। ইন্দ্রিয়-অতিক্রমী এসব উপমা ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যলোকে। বৌবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী, 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো জাগা গানের গলা ঝরে পড়েছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোসার মত শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। যে মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কবির অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত; আত্মহত্যার উদ্‌যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচা'র জীবনস্পৃহার 'তুমুল, গাঢ় সমাচার' ইত্যাদি।[৭৫]

জীবনানন্দের শব্দ-ব্যবহারই তাঁকে স্বতন্ত্র ও অনন্য করেছে– বুদ্ধদেব বসুসহ আদ্যন্ত সকল সমালোচকের একই মত। কবিতা শব্দোত্তর আরো-কিছু; কিন্তু শব্দই কবিতার অত্যুজ্জ্বল দিক। জীবনানন্দ শব্দ-রূপার্ত কবি। তাঁর চয়নিকায় ছিল ললিত, মধুর রঙিন শব্দ; এছাড়া কবিতায় বৈচিত্র্যিক বিষয় প্রবেশ ও সেই সাথে

বিন্যাসের পৃথকতা তৈরি হয়েছে সমকালীন প্রায় সকল কবির রচনা থেকে। কবিতা জীবনানন্দের কাছে নিশ্চয়ই গভীর অনুশীলনেরও বিষয় ছিল। তাই তাঁর শব্দ-কলাকৌশলও এত বিশিষ্ট হতে পেরেছে। জীবনানন্দের শব্দ ব্যবহার যেমন বহির্লোকের সংবাদবহ, তেমনি অন্তর্লোকবিহারী।

যাত্রারম্ভের সূচনায় কবি জীবনানন্দ উল্লেখ করেছিলেন মোহিতলাল-নজরুল-সত্যেন্দ্রনাথের। *ঝরা পালক* পর্বে কবি এঁদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিতও ছিলেন, তুলনায় রবীন্দ্রসন্নিহিতি বিরল। 'এর কারণ : জীবনানন্দ প্রথমাবধি রূপতৃষ্ণার্ত; এবং সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলে এই রূপতৃষ্ণাই প্রধান; যদিও রূপপিপাসী কবির রূপান্বেষণের রীতি বদলে গিয়ে নিজস্বের মুদ্রাচিহ্নিত হয়ে উঠেছিল *ধূসর পাণ্ডুলিপি* থেকেই।'[৭৬] *ঝরা পালকে* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব সর্ম্পকে বুদ্ধদেবও বলেছেন *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বিষয়ক আলোচনায়। তবে প্রভাব সত্ত্বেও সত্যেন্দ্র দত্তীয় ঝংকার থেকে 'ছন্দের নবত্বে ও ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে জীবনানন্দের লাইনগুলো আলাদা', আর তা যে কলাকৌশলে বিন্যস্ত হয়েছে তা এই কবিরই নিজস্ব সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করেন সমালোচক। জীবনানন্দের শব্দ-ব্যবহারের প্রধান বিশেষত্ব সর্ম্পকে বুদ্ধদেব বলেন :

> আমরা লক্ষ করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার ক'রেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে– তা'র অনুকরণ করাও সহজ ব'লে মনে হয় না।... তিনি এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করেনি– যথা; 'ফেঁড়ে', 'নটকান', শেমিজ', 'থুতনি' ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতার যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে কথা আগেই বলেছি; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী।[৭৭]

কেবল তাই নয়, মৌখিক ভাষার ইডিয়ম ব্যবহার করে, দেশজ-শব্দ ব্যবহার করে, বিদেশী শব্দের স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহারে– তৎসম শব্দের মালিন্য ঘুচিয়ে ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাংলা করবার চেষ্টায় জীবনানন্দ কাব্যে যে স্পন্দন এনেছিলেন– সেটা চমক লাগানো ব্যাপার নয়– সেটা সজীব, সেটা নবীন, অনুভবযোগ্য ও তুলনাহীন বলে বুদ্ধদেব মত প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রাত্যহিক শব্দ ও বাক্যভঙ্গির ব্যবহার জীবনানন্দীয় কাব্যভাষার একটি বিশিষ্টতা। বাংলা কবিতায় চলতি দেশজ শব্দের ব্যবহারে জীবনানন্দের কৃতিত্ব হয়তো আজ আর তেমন করে বোঝা যাবে না। সমকালে তাঁর শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের মন্তব্য "তোমার শরীর– তাই নিয়ে এসেছিল একদিন, এই পংক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি

'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।"[৭৮]

নামশব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে সমকালীন বাঙালি কবির মাঝে জীবনানন্দের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি বলে জেনেছেন বুদ্ধদেব। তিনি বলেন, "জীবনানন্দ নামশব্দ ব্যবহার করেন মিল্টনের মতো জমকালো ধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য নয়, প্রির‍্যাফেলাইটদের মতো ছবি ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জয়নী মালবিকা প্রভৃতি পুরাযুগের নাম যে উদ্দেশ্য সাধন করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই জীবনানন্দ সাধন করেছেন বম্বাই, বনলতা সেন প্রভৃতি আধুনিক নাম শব্দ দিয়ে" :

সাগরের অই পারে– আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর–
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!
বাদামি-সোনালি-শাদা-ফুটফুট ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল–
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে! [পাখিরা]

ইংরেজি শব্দগুলোকে বাংলার প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে নিপুণভাবে মেশানো হয়েছে। 'পাখিরা' কবিতার প্রথম পাঠই বুদ্ধদেবের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিল– 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো বলে।

১৯২৮ সালেই বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি' পত্রিকায় জীবনানন্দের কাব্যভাষা সর্ম্পকে লিখেছিলেন, তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটিন আলাদা ভাষা তৈরি করে নিতে পেরেছেন, এজন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। ১৯৪৪ সালে জীবনানন্দের আর একজন প্রধান গুণগ্রাহী ও সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য

লিখেছিলেন[৭৯], "লক্ষ করলে দেখা যাবে জীবনানন্দের কবিতায় ভাষা গদ্যে আটপৌরে ভাষার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে। জনসাধারণের মানসকে ছুঁয়ে যেতে হলে এ ভাষার আশ্রয় না নিয়ে উপায় কি?"

কাব্যবোধে বুদ্ধদেব বসু অনুভববাদী; তিনি ঐসব কবিতাকেই মূল্যবান মনে করেন যা তাঁর মনে দোলা দেয়। তিরিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দের পঙক্তিমালাই তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয়কে সর্বাধিক আন্দোলিত করেছিল। আর জীবনানন্দ প্রসঙ্গে *কালের পুতুল* গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধে তিনি যা বলে গেছেন, এ যুগের সমালোচকেরাও কবি সর্ম্পকে তা-ই জানেন। জীবনানন্দ সর্ম্পকে বুদ্ধদেবের সমালোচনা কিংবা উদ্ধৃতির সুরস্বাদসৌগন্ধ পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কবির অনুভবে ও সংবেদনশীলতায় আর এক কবির গড়ে তোলা রূপ-কে তিনি করেছেন আরো রূপময়, তথ্যকে পরিণত করেছেন সৌন্দর্যে। এটি বুদ্ধদের বসুর সাহিত্য সমালোচনারও এক অনায়াস ও অভ্যস্ত ভঙ্গিমা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ক.

বুদ্ধদেব ও জীবনানন্দের মতো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) কবিতা প্রকাশের শুরু উত্তর-তিরিশে। তাঁদের মতোই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও অধিককাল তাঁর কাব্য সাধনা প্রসারিত। সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকা বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকার মতো একসময় আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। আধুনিক কাব্যের অনেকগুলো লক্ষণ তাঁর বিদ্যমান থাকলেও এই দর্শন-বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যের স্বতন্ত্র। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দশ বছরের মধ্যেই জীবনানন্দের মতোই প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তসহ অন্যেরা। *কালের পুতুল* গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ তিনটি। এছাড়া *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা/ রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থেও রয়েছে দুটি প্রবন্ধ– যার একটি সুধীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ও তাঁর স্মরণে রচিত, দ্বিতীয়টি *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহের* (১৯৬০) ভূমিকা স্বরূপ লেখা। সমকালে বাংলা ভাষায় যাঁরা কবিতা লিখেছেন, সুধীন্দ্রনাথের মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে অতঃপর অগ্রসর হয়েছেন এমন কবি কমই ছিলেন বলে মনে করেন বুদ্ধদেব বসু। অর্থাৎ তাঁকে বুদ্ধিনির্ভর কবি, 'স্বভাবকবি' বা ঠিক 'স্বতঃস্ফূর্ত গীতিকবি' হিসেবে দেখতে গেলে তাঁর প্রতি সুবিচার হবে

না; তিনি স্বাভাবিক কবি। ধরে নেয়া যায়, 'আত্মপ্রকাশের অনিবার্য তাগিদে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হিসেবে কবিতা লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।'[৮০]

১৯৩০ থেকে ১৯৪০- এই দশ বছর সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল। প্রায় সমগ্র *অর্কেস্ট্রা*, *ক্রন্দসী* ও *উত্তরফাল্গুনী*, প্রায় *সমগ্র সংবর্ত*, সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, *স্বগত* ও *কুলায় কালপুরুষের* প্রবন্ধাবলি– সব এই একটিমাত্র দশকের মধ্যে তিনি সমাপ্ত করেন। 'পরিচয়' পত্রিকার সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায় (১৯৩১-১৯৩৬) তা-ও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। বুদ্ধদেব বসু তিরিশ ও চল্লিশের দশকে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যমূল্যায়ন প্রসঙ্গে মেজাজগত বৈপরীত্য স্মরণ রেখেই বুদ্ধিনির্ভর কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের জাতিনির্দেশ এবং তাঁর কবিতার আবেগ ও আঙ্গিক সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করে তাঁর কবিত্বশক্তিকে নন্দিত করেছেন। উত্তরোত্তর সুধীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, প্রতিভার সার্বভৌমতা, দেশী-বিদেশী সাহিত্য বিষয়ক অগাধ জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বের মোহনীয়তা সর্ম্পকে তিনি সচেতন হয়েছেন, ফলে বন্ধুত্বসূত্র প্রগাঢ় হয়েছে। জীবন ও সাহিত্যের বিপুল বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও উন্মীলিত হয়েছে অন্তর্লীন ঐক্যবোধ; বিশুদ্ধ নান্দনিক সূত্রে উভয়ের সহাবস্থান, বুদ্ধদেব তাঁর আলাপচারিতায়, ভাববিনিময়ে, রচনা ও সম্পাদনাকর্মে সুধীন্দ্রনাথকে শুধু সঙ্গী নয়, উত্তমর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ সম্পাদনাকালে তিনি বিস্মিত হয়েছেন প্রতিভার 'বিরতিহীন পরিণতি' দর্শনে এবং *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহকে* অবশিষ্ট আয়ুষ্কালের 'নিত্যসঙ্গী' রূপে গ্রহণ করেছেন বুদ্ধদেব। এছাড়া বাংলা কাব্যজগতে যথাযথভাবে জীবনানন্দ দাশের বিপরীত প্রান্তে তিনি সুধীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের *অর্কেস্ট্রা*, *ক্রন্দসী* ও *উত্তরফাল্গুনী*– এই তিন কাব্যগ্রন্থ আলাদা হলেও বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে এ তিনটি আসলে একটিই বই, একই বইয়ের তিনটি অধ্যায়, তিনটি বইয়ের ভিতর দিয়ে একটি কথাই কবি বলেছেন। 'সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা বই যেন তিনটি যন্ত্র, স্ব-তন্ত্র, কিন্তু সমতন্ত্রী, স্বর তাদের আলাদা কিন্তু সুর এক, ভঙ্গি তাদের বিচিত্র, কিন্তু বিষয়, যাকে বলে থীম, সেটা অভিন্ন।'[৮১] তবে যেকথা বিশেষভাবে কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য, সেটি সবচেয়ে অখণ্ডরূপে, প্রচণ্ড তেজে প্রকাশ পেয়েছে *অর্কেস্ট্রায়*; তাই একে সমালোচক বলেছেন 'সর্বলক্ষণ সম্পন্ন'। তাছাড়া এ গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলি রসের দিকে থেকে এমন পরস্পর-সংলগ্ন যে শেষ পর্যন্ত কবিতাগুলি একত্র হয়ে একটি কবিতার মতো

এবং সেই কবিতা একটি পংক্তির মতো হৃদয়ে প্রবেশ করে। 'অর্কেস্ট্রা' মূলত প্রেমের কাব্য। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন :

> *অর্কেস্ট্রা*তে কবি প্রেমের সংগীতের উচ্চতান তুলেছেন। অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণবের লালিত্য-লালিত বাংলা কাব্যে সে-প্রেম ভাবের দিক থেকে বিস্ময়কর, পারিপার্শ্বিকেও বিধর্মী। নায়িকা বিদেশিনী ও তরুণী, নায়ক ভোগক্লান্ত রস-তৃষ্ণার্ত যুবা, কিন্তু তরুণ নয়, প্রেমের ঘটনাস্থল বিদেশ, আর তার স্মরণের লীলাভূমি সপ্তসিন্ধুপরপারে কবির মাতৃভূমি। সমস্ত নিবিড় নাট্যটিকে দেখা হয়েছে স্মৃতির মধ্য দিয়ে; বর্তমান কবির কাছে অর্থহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, জীবন্ত শুধু স্মৃতি-প্রজ্বলন্ত অতীত, সেই অতীতের আগ্নেয় সংরাগে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা দীপ্তিময়। মিলন-যজ্ঞে চরম আত্মাহুতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তিম বিচ্ছেদের প্রলয় নামলো– তারই পিঙ্গল পটভূমিকা দেখতে পাই *অর্কেস্ট্রায়*।[৮২]

তবে *অর্কেস্ট্রা*র প্রেম ভিন্নধরনের। সমালোচকের মতে, এত পূর্বরাগ নেই, অভিসার নেই, অভিমান নেই, সুখের চেয়েও সুমধুর বিষাদ নেই, নেই লাস্য বা নৃত্য। এলিজাবেথান গীতবিতানের মতো নয়, *ক্ষণিকা* বা *মহুয়া*র মতোও নয়। নায়িকার দেহ ছাড়া কিছু দেবার নেই, আর সেই দেহের স্মৃতি ছাড়া কিছু সম্বল নেই নায়কের। "সমাজের প্রতি, নীতিধর্মের প্রতি অপরিসীম অবহেলায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অফুরন্ত মহিমা উচ্চারিত হয়েছে বারবার– কবিতাগুলি আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধ, নিষ্ঠুর–বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় মিলন স্মৃতির দারুণতর মত্ততায় কবি কখনো চীৎকার ক'রে উঠছেন, কখনো তিনি হতাশায় মগ্ন, কখনো বা সেই স্মৃতিকঙ্কালকেই জীবনের পরম উপার্জনজ্ঞানে অঙ্কশায়ী ক'রে আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত, আবার কখনো এ-কথা ভেবে মোহ্যমান যে মহাদস্যু কাল জীবনের এই একমাত্র স্মৃতিরত্নকেও একদিন লণ্ঠন ক'রে নেবে, নিবিয়ে দেবে সেই দুঃখের অগ্নিশিখা, যেটা তাঁর উপজীবিকা, তাঁর জীবন। ...দেহচ্যুত, দেহাতীত প্রেমসাধনার রোমাঞ্চ কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি।"[৮৩]

সুধীন্দ্রনাথের বিরহবোধও ভিন্নরকমের। *অর্কেস্ট্রা*য় প্রকাশিত এ বিরহবোধ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেন :

> বিচ্ছেদবেদনার যে উত্তেজনা তাঁর কবিতাগুলির প্রাণ, একদিকে যেমন তার চরম ব্যঞ্জনা বর্বর বাঁশির মতো তীব্র দ্রুত উচ্চস্বরে অকস্মাৎ ধ্বনিত হয়েছে 'নাম' কবিতাটিতে, তেমনি অন্য দিকে এই অন্ধমত্ততার পরপারে মুহূর্তের জন্য, শুধুই মুহূর্তের জন্য, একটু শান্তি, একটু মধুরতা, একটু বা বিশ্বাসের আবেশ তাঁকে যেন স্পর্শ করেছিলো

'শাশ্বতী' কবিতায়। মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রিয় তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলো, আসক্তি দিয়েছিলো মুক্তি, খুলে গিয়েছিলো সেই স্বর্গের দুয়ার, যেখানে একবার পেলে কখনো আর হারানো যায় না। তাই তো–

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী;

–এই তুলনাহীন পঙক্তি দুটি তিনি লিখতে পেরেছিলেন।[৮৪]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তাছাড়া তাঁর মনে হয়, কবির বর্ণিত প্রেম একবারের বসন্ত-বন্যাতেই নিঃশেষিত; তাঁর নায়ক-নায়িকা স্বীকার করেই চপল। আর "এই চপল প্রেমের প্রকাশ-ভঙ্গিতেও চপলতায় অভ্যস্ত হয়েছিল আমরা: দেখেছি হেরিকের প্রজাপতি-পাখার সঞ্চালন, আর প্রকাশ্য হাসির সঙ্গে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বেদনার মিশ্রণে হাইনের[৮৫] ও 'ক্ষণিকা'র কৃতিত্ব। সুধীন্দ্রনাথের গম্ভীর ও জটিল রচনাভঙ্গির সঙ্গে এই ভঙ্গুর দেহনির্ভর প্রেমের একটা অসংগতি আছে ব'লে মনে হয়। এটা বুঝতে পারি এই কারণে যে এই কথাটাই তিনি যেখানে হালকা ক'রে বলেছেন– যেমন *অর্কেস্ট্রা* কবিতার একটি লিরিকে ('খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম তোমার প্রেমে') –সেখানে আমাদের উপভোগ কোথাও পীড়িত হয় না, সম্পূর্ণ এবং অকুণ্ঠভাবেই ভালো লাগে।"[৮৬]

*ক্রন্দসী*তে সমালোচক আবিষ্কার করেন পরিণত এক কবিকে; সেই পরিণতি বিষয়বস্তুর; যেখানে কবি বুদ্ধিজীবী সন্ন্যাসী, পৃথিবীর মায়ায় বিমুখ, পরমের সন্ধানী। এখানে তাঁর আদর্শ সম্পূর্ণ নৈব্যর্ক্তিকতা, জীবনের সুখ-দুঃখ, ভয়-আশার অতীতে এক 'অনাথ চিরসত্তা'। 'প্রার্থনা', 'স্বপ্ন', 'অকৃতজ্ঞ' ইত্যাদি কবিতায় কবি "সমাজবিধি ও সংস্কারের সারাম আশ্রয়ের উপর বিদ্রূপের চাবুক চালিয়েছেন। বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন জীবনের ব্যর্থতা।... তাঁর উপলব্ধির শেষ কথা এই":

জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী" [নরক]

এছাড়া জীবন নানা রঙের নানা ছলনায় ভোলায় ব'লে তাকে তিনি ঘৃণা করেন, অথচ তাঁর অভীষ্টও অপ্রাপণীয়। মনে হয়, 'নির্গুণ নির্বাণে'র অবস্থায় কখনোই বুঝি পৌঁছনো যাবে না। গভীর বিতৃষ্ণার সুরে তিনি স্বীকার করেন :

> নাই নাই মৌন নাই, সর্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ;
> নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয়...
> কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন,
> অনন্ত প্রস্থান মিথ্যা; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা। [সৃষ্টিরহস্য]

*ক্রন্দসী*র কবিতাগুলো ১৯২৭ থেকে ১৯৩৪-এর রচনা বলা যায়, কালিক বিচারে *অর্কেস্ট্রা* পর্যায়ের কবিতা এখানে সংকলিত হলেও কাব্যদ্বয়ে কবির অনুভব ও বিচরণগত ভিন্নতা লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে জীবনের ব্যর্থতার যে কথা যেভাবে 'ক্রন্দসী'তে রূপ পেয়েছে, অর্থাৎ ব্যর্থতা ও হতাশাকে যেভাবে কবি নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছেন, কবির আদর্শ হিসেবে তা মনঃপুত হয়নি সমালোচকের। কারণ, এই ধরণের 'বুদ্ধিপ্রসূত বৈরাগ্যের সমাপ্তি বন্ধ্যতায়, কবির পক্ষে যা অসংগত।'[৮৭] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যপ্রকৌশল সর্ম্পকে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য গুরুত্ববহ। তাঁর বিরাট প্রস্তুতির প্রতি সমালোচকের মুদ্ধতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক কবি হিসেবে সৃষ্টির প্রেরণা সুধীন্দ্রনাথের কাছে 'পরিশ্রমের পুরস্কার।'[৮৮] তিনি এও বলেন, 'প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে বলে, সাহিত্যসৃষ্টির উক্ত উপকরণ আমি সাধ্যপক্ষে মানতে চাইনি, তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলুম অভিজ্ঞতাকে।'[৮৯] প্রেরণার বিরুদ্ধে সুধীন্দ্রনাথের অভিযান একারণেই এমন পৌনঃপুনিক হয়েছে বলে বুদ্ধদেব বসু মনে করেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তিকে প্রেরণা হিসেবেই বিবেচনা করেন সমালোচক; কবির মনের প্রয়াসপ্রসূত এই উদ্বর্তন তাঁর কাছে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু– 'প্রথম কাঁচা হাতের খাতা থেকে *সংবর্ত* ও *দশমী*তে তাঁর উত্তরণ পর্যন্ত যে গতিবেগ কাজ করে গেছে, তারই অন্য নাম প্রেরণা।'[৯০]

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় ও রীতি বিবেচনার সূত্রে অনেক সমালোচক তাঁকে ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক বলেন। বুদ্ধদেব বসু এর প্রতিবাদ করে বলেন যে সুধীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে রোমান্টিক কবি এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক। যুক্তি হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেন তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রতিফলিত "আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চীৎকার– যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা

খুঁজে পাবো না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথে, না তাঁর সমকালীন কোনো কবিতে। দ্বিতীয়ত, ভগবানের অভাবে যন্ত্রণাবোধ– এটিও একটি খাঁটি রোমান্টিক লক্ষণ। তিনি ভগবানের অভাব কবিতা দিয়ে মেটাতে চাননি, জনগণ বা ইতিহাস দিয়েও না। তাই নিজেকে জড়বাদী বলে থাকলেও, তাঁর কবিতা আমাদের বলে দেয় যে তাঁর তৃষ্ণা ছিলো সেই সনাতন অমৃতেরই জন্য।"[৯১] এ বক্তব্যে বুদ্ধদেবের শিল্পদর্শনও প্রতিফলিত।আর এদিক বিবেচনা করেই সুধীন্দ্রনাথকে একান্তভাবে লিরিক কবি বলতে চেয়েছেন সমালোচক। শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর ধারণায় থাকা জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতার প্রশংসা করেন। শব্দকে তিনি প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে অর্জন করেছিলেন, জীবনব্যাপী সেই সংসর্গ ও অনুচিন্তনের ফলেই তাঁকে অভিজ্ঞতা-নির্ভর, বুদ্ধিপ্রধান ও অধ্যবসায়ী 'শাস্ত্রকবি' বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর শব্দব্যবহার 'শিক্ষিত ও যথাযথ, চিন্তা ও যত্নপ্রসূত।' কাব্যগুরু হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ যাঁকে নন্দিত করেছেন তিনি মালার্মে। ১৯৫৩ সালেও *সংবর্ত* কাব্যগ্রন্থের 'মুখবন্ধে' কবির স্বীকারোক্তি, 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।'[৯২] তবে কাব্যাদর্শ ও কাব্য-অভিজ্ঞতা এক নয়, মালার্মে সুধীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট ও উজ্জীবিত করেছেন সত্য, কিন্তু উভয়ের মানস-সংগঠনের বৈপরীত্যে সৃষ্টিকর্ম সমীকৃত হয়নি। বুদ্ধদেব বসু একারণেই বলেন যে, 'তার কবিতা কোনো দিক থেকেই মালার্মের মতো নয়, ভুল হবে তাঁকে সিম্বলিস্ট বলে ভাবলে; তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈবর্জনের সংকল্পে, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়।'[৯৩]

সুধীন্দ্রনাথ 'কারিগর কবি'। বুদ্ধদেব বসু কবিত্বশক্তি ও কারিগরিতে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের প্রমাণ পান সবক'টি কাব্যগ্রন্থে, বিশেষত *অর্কেস্ট্রায়*। এ প্রসঙ্গে সমালোচক স্মরণ করেছেন সুধীন্দ্রনাথের উক্তিকে : 'আমার আনন্দ বাক্যে।' তবে বুদ্ধদেবের মতে, "যে জাদুতে কবিতার বাক্য মন্ত্রের মতো ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে ওঠে যাতে কয়েকটি সহজ কথার সংযোজনায় জীবনের কোনো গূঢ় প্রদেশ উদ্ভাসিত হয়, বাক্যের সেই ঐন্দ্রজালিক সাধনার পথে তিনি চলেন না। কথাকে তিনি ব্যবহার করেন, যেমন ক'রে বাস্তুশিল্পী ব্যবহার করে ইষ্টক; অতি সাবধানে কথার পর কথা সাজিয়ে কবিতাকে গঠন করেন তিনি; তাঁর মন তার্কিকের তাত্ত্বিকের, গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরণটা তিনি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। সেইজন্য, যদিও আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য, শব্দার্থ ও উল্লেখগুলো বের ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে পড়লে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হতে পারে।"[৯৪] অনেক নতুন শব্দ বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অনুধাবনে এটাই একমাত্র বিঘ্ন বলে তাঁর কবিতা দুরূহ, আর সেই দুরূহতা অতিক্রম করা

অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষ বলে বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে। তাছাড়া, 'সুধীন্দ্রনাথের তনু-তন্ময়তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর আভিজাতিক সুমিতি, তাঁর ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোক দুর্লভ মননশীলতায় গম্ভীর। সুদৃঢ়, প্রগাঢ়, চিন্তা-ছায়াচ্ছন্ন তাঁর কবিতাগুলির সঙ্গে প্রথম দর্শনেই তাই প্রেমে পড়া সহজ নয়।'[৯৫] বুদ্ধদেবের মতে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন যুক্তিনিষ্ঠ, তাঁর বাক্যবিন্যাস সুমিত, পঙক্তিসমূহের পারম্পর্য নির্বিকার এবং শব্দপ্রয়োগ যথার্থ; আর মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না করলে তাঁর কবিতা অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, ঘন ও সুশৃঙ্খল হতো না, অর্থাৎ তাঁর চরিত্র প্রকাশ পেতো না। এই সব শব্দরচনার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতাকে দিয়েছেন এক 'শ্রবণসুভগ সংহতি ও গম্ভীর ঐশ্বর্য,'[৯৬] আর এভাবে বাংলা ভাষায় সম্পদ ও সম্ভাবনাকে গভীরভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ছন্দ প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথের কুশলী নির্মাণের প্রশংসা করেছেন। তাঁর 'কবিতা ঘন ও সাকার, আঠারো মাত্রার পয়ারে আট-দশের নিখুঁত ভারসাম্য তিনি এমনভাবে বজায় রেখে চলেন যা হুবহু পোপ ও ড্রাইডেনের অ্যান্টিথিসিস-নির্ভর 'হিরোয়িক কাপলেটে'র কথা মনে করিয়ে দেয়':

> মেঘার্ত পাণ্ডুর শশী; শঙ্কাকুল শ্রাবণশর্বরী;
> ... ...
> নিঃস্পন্দ নিরিক্ত কুঞ্জ; পরিত্যক্ত অচ্ছোদ সরসী। [কুক্কুট : ক্রন্দসী]

এছাড়া চতুর অনুপ্রাসে, ব্যঞ্জনবর্ণের ঠাশবুনোনে, তুচ্ছ বিষয়বস্তুকে ধ্বনি-কল্লোলিত ক'রে তোলার কৌশলও কবির জানা :

> ডাহুকী, সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল
> নির্বিঘ্ন তিব্বতপানে নিরুদ্দেশ আসন্ন দুর্দিনে।
> চক্রধর চর্মচটী লুক্কায়িত দুশ্চর বিপিনে।
> প্রেতসঞ্চারিত কক্ষে চিত্রার্পিত সারিকা বাচাল। [কুক্কুট : ক্রন্দসী]

অর্কেস্ট্রা কবিতার বর্ণনার অংশে আঠারো মাত্রার পয়ার নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের দুঃসাহসী পরীক্ষা বুদ্ধদেব বসুকে বিস্মিত করেছে। যেখানে একদিকে চলেছে সংগীতের বর্ণনা, অন্য দিকে সেই সংগীত, যে-সব স্মৃতির ঢেউ তুলছে কবির মনে, তারই প্রকাশ চলেছে লিরিকের পর লিরিকে। সেই লিরিকগুলো মিলে যেন

'বাণীহীন সংগীতকে মূর্তি দিতে চাইছে ভাষায়। এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সুধীন্দ্রনাথ নিপুণ শিল্পের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। লিরিকগুলো ছন্দের দোলায় কর্ণেন্দ্রিয়কে আদর করে...।'[৯৭]

পয়ারকে সুধীন্দ্রনাথ ভেঙে-চুরে যেমন খুশি চালিয়েছেন, আর চালিয়ে নিতে পেরেছেন একমাত্র প্রবহমানতার জোরে, বুদ্ধদেব মধুসূদনের কবিত্বের সেই জোরের সাথেই সুধীন্দ্রনাথের তুলনা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনার উপসংহারে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেন যে বাংলা কবিতার নতুন পরিণতির ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রধান কর্মী; আর তাঁর নির্মাণের কলাকৌশল, পূর্ণমনস্ক গঠনকর্ম অত্যন্ত মূল্যবহ; তিনি আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) কাব্যচর্চা 'বিচিত্রা' পত্রিকার পাতায় ১৯২৭ সালে শুরু হয়েছিল। কাব্যের বিষয়বস্তু, রচনাকাল এবং প্রধাণত ধরণ অনুযায়ী অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাগুলোকে তিনটি পর্যায়ে ফেলা যায়। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে *খসড়া* (১৯৩৫) ও *একমুঠো* (১৯৩৯)। ১৯৩৫-এ *খসড়া* প্রকাশের সঙ্গে তিনি অবিসংবাদিত ভাবে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে *মাটির দেয়াল* এবং তৃতীয় পর্বে রয়েছে *পারাপার*, *পালা-বদল*। *কালের পুতুলে* অমিয় চক্রবর্তী *খসড়া*, *একমুঠো* ও *পালা-বদল* নিয়ে তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর। *খসড়া* প্রকাশের পর অমিয় চক্রবর্তীকে উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাঙালি কবিদের অন্যতম হিসেবে অভিহিত করেছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ অন্যান্য কবিদের মধ্যে যে কতগুলো মুদ্রাদোষের সৃষ্টি করেছিল তা থেকে দূরে যাবার উদ্যোগ আধুনিক কবিদের প্রধান প্রবণতা; অমিয় চক্রবর্তী এদিকে থেকে একেবারেই অভিনব ও আধুনিক হতে পেরেছিলেন বলে সমালোচকের ধারণা। তিনি বলেন :

> তিনি অভিনব, কিন্তু অভিনব হবার শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়েই তিনি আসরে এসেছেন। তাঁর ছন্দের বিচিত্র তির্যক গতি, অদ্ভুত শব্দযোজনা, দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব- সমস্তই নিবিড় মননশক্তির ফল। এর ফলে অবশ্য তাঁর কাব্য কিছুটা আত্মসচেতন হ'য়ে পড়েছে; কিন্তু আজকের দিনের কাব্যে আত্মবিস্মৃতির প্রগলভতার চাইতে আত্মসচেতনতার দুরূহতাই বরেণ্য। অমিয় চক্রবর্তীর মন পুরোপুরি আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বহির্মুখী।[৯৮]

অমিয় চক্রবর্তীর এই বহির্মুখিতা বুদ্ধদেবের মতে মূলত আন্তর্জাতিকতা। সমালোচনায় তিনি কবি হিসেবে অমিয়ের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে কবিদের মধ্যে তিনি প্রকৃতই

সর্বদেশীয়। নতুন বিচিত্র ভূগোলের অভাবিত রস পরিবেশর করেছেন তিনি। সমকালীন কবিতার মধ্যে বিদেশের আবহাওয়া বা আবহময় ছবি, বিচিত্র বহির্জগত অমিয় চক্রবর্তীই কৃতিত্বের সাথে জীবন্ত করে তুলেছেন বলে মনে করেন বুদ্ধদেব। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, কবির জীবনের তিন দশক কেটেছে আমেরিকায়, তবে বহু বাঙালি কবি বিদেশ ভ্রমণ করে, সেখানে বসে কবিতা লিখলেও বাংলা কবিতায় বিদেশের আবহাওয়া বিরল। *একমুঠো* কাব্যগ্রন্থের কবিতায় যদিও তাঁর আন্তর্জাতিকতা পরিব্রাজকতা ইত্যাদি কবিতায় এসেছে চিত্রসংবলিত তথ্যের মতোই। এরোপ্লেনে বসেও ছোটো ছোটো পঙক্তিতে গতিশীল পৃথিবীর ছবি আঁকেন কবি, আবার মঙ্গলগ্রহে বসে পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে জল্পনা আছে। ননো শব্দে, অনুষঙ্গে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠে এই কবির দৃষ্টি যখন ঘরের আঙিনা স্পর্শ করে, বিদেশে এলবে অরন্য আর নিজের দেশের দিঘির পাড়, মৃন্ময়ী বাড়িতে ভেদ মুছে যায়; তখন পরিচিত অনেক কিছুই অপরূপ হয়ে উঠে এবং পাঠকের মনে সংক্রমিত হয়। তাঁর অনুভূতির ব্যাপ্তি তাই আন্তর্দেশিক, এমনকি আন্তর্জাগতিক। *পারাপার* কবিতাগুচ্ছের পটভূমি বাংলা, ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা। এইসব কবিতার আর একটি মূল সুর বিশ্বজনীনতা। এখানে বারেবারেই পৃথিবীর প্রতি, বিশ্বজীবনের প্রতি কবির অম্লান শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধদেব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন– এই সব কবিতার প্রতি তাঁর প্রীতি 'ক্লান্তিহীন'। অমিয় চক্রবর্তীকে তৎকালীন সময়ের প্রধান 'আধ্যাত্মিক; কবি আখ্যা দিয়েছেন সমালোচক। কবিতামাত্রেই মানুষের আত্মা থেকে উদ্ভূত একথা মানলেও এ প্রসঙ্গে 'আধ্যাত্মিকতা' কথাটা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর কবিতায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে 'এক আশ্চর্য বৈদেহিকতা।' এ প্রসঙ্গে সমালোচক আরো বলেন[৯৯] :

> ইন্দ্রিয়চেতনার কবি জীবনানন্দর সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্য যেমন মেরু প্রমাণ, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বরক্তিম মানসও তাঁর সুদূরবর্তী।... এক দিকে তাঁর স্বভাবের আপতিক বহির্মুখিতা, অন্যদিকে তাঁর আস্থার নৈষ্ঠিকতা– এই দুটি কারণে, অন্যান্য বিষয়ে যতই গরমিল থাক, তাঁর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র। ... কলাকৌশলের নূতনত্ব, ভাষার চমকপ্রদ ভঙ্গিমা, এই সব আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর রচনার মধ্যে গ্রথিত হ'তে পারলে আমরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করি যে, তিনি আর রবীন্দ্রনাথ একই জগতের অধিবাসী; যে জগৎ অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতার বিশেষ লক্ষণ এই যে তা কোথাও কোথাও মিস্টিসিজম– এর প্রান্তে এসে পৌঁছয়; বিশেষত তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা অনেক সময় সেই অতি সূক্ষ্ম সীমান্তরেখায় বেপথুমান, যাকে অনুভব করার জন্য প্রায় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর জগৎ এক হলেও দুজনের মিস্টিক বোধে পার্থক্য রয়েছে। প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত এক মিস্টিক চেতনায় দৃষ্টির দর্শনই আধুনিক কবির কাছে বড় কথা নয়। 'এ পর্যায়ে ধ্যানের মূল্য অমিয়ের কাছে বিশ্বরহস্যের উপলব্ধির প্রয়োজনে, কেবল বিজ্ঞান ও বস্তুচেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল রহস্যের শেষ হয়না, বাইরের সকল ঘটনার তাৎপর্য; সকল বিরোধের সংগতি সকল বৈষম্যের ঐক্য নিহিত আছে আত্মসমাহিত সারল্যে।'[১০০] এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা, উপাদান ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে হয়েছে বুদ্ধদেবের কাছে। 'রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই– কোনো আধুনিক কবিতেই তা সম্ভব নয়।'[১০১] সুতরাং দু'জনের আধ্যাত্মিকতা এক নয়, তাছাড়া ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী। বুদ্ধদেব সমকালীন অস্থিরতা উপলব্ধি করেন এবং জানেন গোটা দুনিয়াতেই তখন স্থায়িত্বের অভাব। মানুষের নীড় ভেঙ্গে গেছে, 'বুদ্ধিজীবী মানেই উদ্বাস্তু।' অমিয় চক্রবর্তী এই পরিবর্তমান জগতের বিষয়ে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। তাঁর রচনায় এক ভ্রাম্যমান মানুষকে দেখা যায়, যে ঘুরে বেড়ায়, বাসা বদল করে। ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে ভ্রাম্যমান অবস্থায় তাঁর বহু কাব্য রচিত হয়েছে। কখনো ক্যানসাসে, কখনো প্রিস্টনে, কখনো বোস্টনে– তাই রচনায় এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। বুদ্ধদেবের মতে; "এই জঙ্গমতাবোধ রবীন্দ্রনাথের ছিলো না, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাঁর প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে নি, তাঁর চেনা জগৎ যে হারিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেও কাব্যের মধ্যে তা স্বীকার ক'রে নেয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। এই স্বীকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী– শুধু দীর্ঘকাল প্রবাসে আছেন বলে নয়, স্বভাবেরই প্রেরণায়; রবীন্দ্রনাথে যে শানাইয়ের সুর কলকাতায় গলির অসংগতিকে মিলিয়ে দিয়েছিলো তাকে অমিয় চক্রবর্তী প্রয়োগ করেছেন আমাদের সমকালীন পরিচিত পৃথিবীর বিবিধ, বিচিত্র, পরস্পরবিরোধী তথ্যের উপর; যে পরিবেশের মধ্যে আমরা প্রতিদিন বেঁচে আছি এবং যুদ্ধ করছি, তাঁর মিলনমন্ত্র একেবারে তার কেন্দ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে। এই উপাদানের আয়তন ও বৈচিত্র্য তাঁকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছেন তার ব্যবহারের ক্ষেত্র আলাদা ব'লে তাঁর কবিতার রসবস্তুও স্বতন্ত্র; তাঁর কাছে আমরা যা পাই, রবীন্দ্রনাথ তা দিতে পারেন না।[১০২] কেবল অমিয় চক্রবর্তীর সমালোচনার প্রসঙ্গ-সূত্রে নয়,এ বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের সাথে বুদ্ধদেবের নন্দনতাত্ত্বিক একটা বিরোধও স্পষ্ট হয়েছে। সমালোচক হিসেবে সাহিত্যাদর্শ, ঐকান্তিক বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্য যুক্তিনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন বুদ্ধদেব। এ পর্যায়ে তাঁর কাল-সচেতনতারও প্রমাণ পাওয়া যায়, সমালোচনা করতে গিয়ে এ সর্ম্পকে খুব কমই বিস্মৃত হয়েছেন তিনি। প্রেমের কবি হিসেবে বিচার করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেছেন অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় রক্তমাংসের সংক্রাম

সবচেয়ে কমে; এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও পবিত্র তাঁর রচনা। দৈহিক সংসর্গে তিনি 'দুর্বারভাবে পরাঙ্মুখ; বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যাঁর রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপসর্গসম্পন্ন কোনো নায়িকাকে একটিবারও দেখা যায়নি সেখানে; দেহটাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে তিনি শুধু ভাবটিকে রেখেছেন।[১০৩] কবিতাগুলোকে সমালোচক নাম দিয়েছেন ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতা। এধরনের কবিতা বলতে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন- 'বৃষ্টি', 'চিরদিন', 'পারাপারে', 'পরিচয়', 'শ্রীমান শ্রীমতী', 'পালা-বদলে', 'মিলন দিগন্ত', 'দুই স্বপ্ন', ইত্যাদি কবিতা। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে অমিয় চক্রবর্তীর অধিকাংশ প্রেমের কবিতা বিরহের। তাই বলে তাঁর কাব্যের নারীরা ছায়াময়ী নয়, প্রেম ও দেহ সেখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিতও নয়। হয়তো যৌনাতুর শরীরী প্রেমের কবিতা লেখেননি তিনি। তাঁর বিভিন্ন প্রেমের কবিতা বিষয়ে সমালোচক বুদ্ধদেবের মত :

> বাংলা ভাষার প্রেমের কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অমিয় চক্রবর্তী প্রাপ্য। দেহের প্রসঙ্গে নির্মমভাবে মৌন থেকেও তাঁর বেদনায়– এমনকি তাঁর বসনায়– কোনো কোনো রচনা রঙিন হয়ে উঠেছে; যার উল্লেখমাত্র নেই তাকেও আমরা অনুভব করতে পারি; এই খানেই তাঁর কৃতিত্ব।"[১০৪]

তবে শরীরী ব্যাপার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে বুদ্ধদেবের বিরোধী মনোভঙ্গি থাকলেও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সেই শরীরী ব্যাপারটার অভাবই এখানে তাঁর দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। একে তাঁর শিল্পসত্তার স্ববিরোধ হয়তো বলা যায় না, শরীরী প্রেম থেকে অতনু প্রেমের পথে উত্তরণের যে শিল্পসৌন্দর্যে বুদ্ধদেব আকর্ষণ অনুভব করতেন, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সেই ধরনের বোধ শিল্পিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে তাঁর। প্রেমের শরীরী কবিতা না লিখলেও প্রেমের বিচ্ছেদ বেদনা পাওয়া যায় কবির 'পারাবার' ও 'পালাবদল' কাব্যগ্রন্থে। এই বিরহবেদনার নায়িকা কোথাও স্পষ্টভাবে তাঁর কাব্যে নেই– তবু তা যেন আছে :

যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে,
শুধু মিনিট খানিকও নয়;
দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে। ('অ্যান আর্বর', *পালা-বদল*)

দুই জন্ম দুই থাক, মধ্যে সাঁকো পারাপার,

কার্মেলিতা, দেখ এক প্রেম পারাবার। ('পরিচয়', *পারাপার*)

এছাড়া বুদ্ধদেবের মতে, *পালা-বদলের* 'রাত্রি' কবিতায় 'হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না, দেখি তুমি নেই' পংক্তিটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় *লিপিকার* 'পরির পরিচয়' এবং 'বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় মন আবহমানভাবে যে বিরহের গান গেয়েছে, তার ধারা সমকালীন বাঙালি কাব্যে লুপ্ত হ'য়ে যায়নি।'[১০৫] বুদ্ধদেব দৃঢ়তার অঙ্গে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য যতই ভিন্নধর্মী হোক– 'বিরহ' সব কবিরই বিষয়বস্তু। বিষয়ে যতই ভিন্নধর্মী হোক, 'অর্কেস্ট্রা' 'বনলতা সেন' বিরহের কাব্য। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণতা', সুধীন্দ্রনাথের 'নাম', জীবনানন্দের 'আকাশলীনা', অমিয় চক্রবর্তীর 'বিনিময়' এই সব আপাত-বিসদৃশ কবিতার মধ্যে রয়েছে মৌলিক সম্বন্ধ। তবে ভাবের দিক থেকে জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির কারণে যেমন, তেমনি যুগের কারণেও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বিরহান্তক। বুদ্ধদেব তা ইঙ্গিত করলেও সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ বিরহের মধ্যেও পূর্ণতার প্রসাদ পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল 'তবু শূন্য, শূন্য নয়।' আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী সে সান্ত্বনা হতে বঞ্চিত।

কবি হিসেবে অমিয় চক্রবর্তীর সাফল্যের প্রায় কোনো দিকই দৃষ্টি এড়ায়নি সমালোচক বুদ্ধদেবের। বরং বিশেষ অনুরোগে তাঁর নানা বৈশিষ্ট্যের ওপরে গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি, সমালোচক হিসেবে এটি তাঁর আপন স্বভাবেই করেছেন। বেদনামিশ্রিত ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় অমিয় চক্রবর্তীর নিপুণতাকে তুলে ধরেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে, এইসব কবিতা আপাতদৃষ্টিতে হালকা হলেও অর্থের দিক থেকে হালকা নয়। যেমন– 'বিধুবাবুর মত', 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', 'মামুলি', 'লগ্ন' প্রভৃতি। তবে কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর ত্রুটি নির্দেশে দ্বিধান্বিত নন সমালোচক। ফ্রি ভার্সের (ব্রিটিশ কবি ম্যানলি হপকিন্সের আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত 'স্প্রাং রিদ্‌ম') ব্যবহারের জন্য কবি অমিয় চক্রবর্তীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বুদ্ধদেব। এছাড়া ছন্দ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পারে বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু ভাষা ব্যবহার, বিশেষ্য-বিশেষণ প্রয়োগে অভিনবত্ব আনার চেষ্টাকে সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। যেমন– উত্তমতা, সংসারতা, আসলতা, পুণ্যতা, সংসর্গতা, ধ্যানতা ইত্যাদি প্রয়োগের সার্থকতা কোথায় জানতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, ব্যকরণপুষ্ট শব্দ তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন 'তার দ্বারা কবিতার

কোনো বিশেষ লাভ হচ্ছে'। এলিয়টকে সাক্ষ্য মেনে বলেছেন, 'কবিতাও গদ্যের মতো সুলিখিত হওয়া দরকার। বুদ্ধদেবের অধ্যয়ন কতখানি গভীর ছিল এই সব সমালোচনা আমাদের জানায় ।

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে-র (১৯০৯-১৯৮২) *চোরাবালি* কাব্যের আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু পত্র-আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। এ কারণে লেখার মধ্যে এক ধরনের আলাপচারিতা ও অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠেছে। 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৪-এর চৈত্র সংখ্যায় বুদ্ধদেব পত্রাকারে এই সমালোচনা করেছিলেন। বিষ্ণু দে এ পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিজের কবিতা প্রকাশের ধারাকে মুক্ত করেছিলেন তাঁর বহু কবিতা দীর্ঘকাল এতে ছাপা হয়েছে। এমন কি মার্কসীয় ভাবাদর্শে প্রবেশের আলেখ্য *পূর্বলেখ*র কবিতাবলিও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবিতা' পত্রিকার নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থানটি ছিল ইন্দ্রিয়মুখী অভিজ্ঞতাশ্রয়কে মুখ্য ভূমিকায় দাঁড় করানো। "বিষ্ণু দে-র চৈতন্যের সঙ্গে এর সূক্ষ্ম-সংযোগটি হচ্ছে তাঁর মধ্যেও ছিল অনুরূপ ইন্দ্রিয়বেদ্য অনুভব ও অভিজ্ঞতার গূঢ় উপাদান। প্রবল মনন ও বুদ্ধিবাদ সত্ত্বেও তাঁর চেতনায় রয়েছে যে ধরনের ইন্দ্রিয়ানুভব, বিশেষত প্রকৃতিকে শরীরী করে তোলার নিও ক্লাসিক্যাল রীতি যা তাঁর কবিতাকে করেছে ব্যঞ্জনাময় এবং কাব্যপ্রত্যয়কে করেছে জীবনযাপনের আস্বাদ্যমানতায় নিষিক্ত, তার প্রণোদনা 'কবিতা'র আবহের দ্বারাই প্রোৎসাহিত। ... প্রকৃতি–সম্ভোগ ও আলোছায়াময় ইম্প্রেশনিস্টিক দৃশ্যাবলি অঙ্কনেও ইন্দ্রিয়-সংবেদনের যে রং ও রেখার প্রয়োগ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় দৃষ্ট হয়, তার পেছনেও 'কবিতা' পত্রিকার রুচি ও আদর্শের প্রবর্তনাকে চিহ্নিত করা সম্ভব।"[১০৬] 'বিষ্ণু দে : চোরাবালি' (*কালের পুতুল*) প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ থেকেও জানা যায় যে, *চোরাবালি*র অনেক রচনাই হয় 'প্রগতি'তে না হয় 'কবিতা'য় বেরিয়েছিল।

আধুনিক কাব্য আঙ্গিকের দ্রুত পরিবর্তনে এবং প্রকাশের নিত্য নব রীতিতে অনেক পাঠকের কাছেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। দুর্বোধ্যতা বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু ব্যাখ্যামূলক একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেকথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। যুগজীবনের জটিলতা ও ব্যাপকতার কারণে আধুনিক মানসে অন্তর্দ্বন্দ্ব মনোবিচ্ছিন্নতা, অসংলগ্নতার বোধ ইত্যাদি কবিতায় দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করেছিল তা সত্যি হলেও বুদ্ধদেবের প্রবন্ধে আধুনিক যুগের সত্যকার মৌলিক সৃষ্টির প্রতি পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে। মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ, বাংলার দুই প্রধানতম কবিকেও দুরূহতার অপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল এবং তা কেবল যুগের কারণে। বুদ্ধদেব

আধুনিক কবিতার এই দুরূহতার কথা জানতেন। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কাব্যসমালোচনায় তাঁর অনেক কবিতা তিনি বোঝেন না বলে যে মত দিয়েছেন তাতে শাব্দিক দুর্বোধ্যতাকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ 'অধীত বিদ্যার উপরে নির্ভর না করেও' বিষ্ণু দে-র কবিতা উপভোগ করা সম্ভব। সুতরাং বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা সর্ম্পকে সমালোচকের আপত্তি নেই তা বোঝা যায়। তাঁর কবিতার দুরূহতা প্রসঙ্গে সমালোচক দুটি প্রশ্ন তুলেছেন– *চোরাবালি* গ্রন্থের প্রারম্ভে সুধীন্দ্রনাথের লেখা 'ভূমিকা' সংযুক্ত করার সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা। কারণ বিষ্ণু দে-র কবিতার দুরূহত্ব সুধীন্দ্রনাথের অধিক দুরূহ 'ভূমিকা'র দ্বারা কিছুমাত্র লাঘব হয় নি।" দ্বিতীয়ত, 'অলাতচক্র', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে কবিতার কি লাভ হয়, তা সমালোচক বুঝে উঠতে পারেন না। সংস্কৃত এবং বিদেশী শব্দের প্রচুর ব্যবহার বিষ্ণু দে-র কবিতায় দেখা যায় এটা সত্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শব্দ প্রয়োগ সার্থক হলেও কখনও কখনও তা অপ্রয়োজনীয় এবং শ্রুতিকর্কশ হয়েছে। সেইসাথে রয়েছে পদবিন্যাসে বিশৃঙ্খলা (Semantic distance)। 'ক্রেসিডা' এবং 'ওফেলিয়া' কবিতা দুটির মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়। এ দুটো কবিতার স্তবক-বিন্যাস নিয়ে সমালোচকের জিজ্ঞাসা রয়েছে; কবিতা-দ্বয়ের নানারকম দুরূহ ব্যাখ্যাও তাঁকে বিচলিত করে বলে জানিয়েছেন। উল্লম্ফন কৌশলের প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে বিচার্য। বিষ্ণু দে-ই প্রথম বাংলা কাব্যে উক্ত আধুনিক রীতিটির প্রবর্তন করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বোধ্যতার কারণও এখানে মিলবে। 'ওফেলিয়া', 'টম্পা-টুংরি' প্রভৃতি কবিতার প্রায় প্রত্যেক স্তবকের মধ্যবর্তী স্তরগুলি অনুক্ত। বুদ্ধদেব 'চোরাচালি' কাব্যের আলোচনায় 'ঘোড়সওয়ার' কবিতা সর্ম্পকে অকপটে জানান :

> ঘোড়সওয়ার একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা, বর্তমান যুগের বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কথাও বলবো, এই কবিতা যে-কোনো ভাষাতেই গৌরবের বিষয় হ'তো।[১০৭]

'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটিকে কেবল বুদ্ধদেবই নন, সমকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবীন্দ্রনাথ দত্তসহ অনেকেই সমালোচনা করেছেন। তবে বুদ্ধদেবের সমালোচনা একান্তই প্রাকরণিক। কবিতার বিষয়বস্তুতে থাকা কেন্দ্রীয় আবেগকে তিনি এর শব্দ-ছন্দ-ধ্বনির মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেন। 'যৌবনাবেগকে সৃষ্টিশীলতার শক্তিতে রূপান্তরের গভীর যে আকুলতা কবিচিত্তকে তীব্র গতি দিয়েছে'[১০৮]; সেই শক্তি সত্তার প্রতীক ঘোড়সওয়ার-এর শাব্দিক রূপান্তর বুদ্ধদেব বসুর চোখে ধরা পড়ে এভাবে :

ছন্দের উপর বিশেষত তিনমাত্রার ছন্দে– আপনার সহজ অধিকার আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। 'ঘোড়াসওয়ারে' ধ্বনির উত্থান-পতন এমন অভ্রান্ত, অনিয়মিত মিলের ও আকস্মিক অনুপ্রাসের বিস্ময় এমন সংগত ও সুন্দর, নাট্য ও গীতির মিশ্রণ এমন নিখুঁত যে পুরো কবিতাটি জটিল ও গম্ভীর সংগীতের[১০৯] মতো মনের মধ্যে হানা দিতে থাকে।

কাঁপে অনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!

শেষের পংক্তিটিতে ঠিক যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তা ছাড়া এ কবিতার অন্যতম গৌরব আমার কাছে এই যে একে হৃদয়াঙ্গম করতে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না।[১১০]

কেবল 'ঘোড়সওয়ার' নয়; 'ভালো বুঝতে না পারা', 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতাও বুদ্ধদেব পড়তে ভালোবেসেছেন মাঝে মাঝে চমকপ্রদ চিত্রকল্প দেখে; মনের মধ্যে যা বিচিত্র ছবি ফোটায়, আর কবিতাদ্বয়ের 'ছন্দের কৌশল ধ্বনিমর্মরের মোহ ছড়ায়। 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতা থেকে তাই কোনোরকম অর্থের প্রত্যাশা না করেই তিনি ধ্বনি-নির্ভর কয়েকটি পংক্তি চয়ন করেন; যেসব 'শ্লোক' একবার পড়লে বার বার পড়তে হয়, 'মগজের মধ্যে যারা গুনগুন ক'রে ফেরে' :

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়াকে হানো।
এনেছিলে বটে হাসি
মেঘের রেশমি আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া-আসা। ['ওফেলিয়া']
সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া।–
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল
হালকাহাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?
পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে

পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে
স্তব্ধ নিথর পাঁচ-সায়রের বিল। ['ক্রেসিডা']

পংক্তিসমূহ পাঠের মুগ্ধতায় সমালোচক বুদ্ধদেব বসু স্বীকার করেন যে তাঁর কখনও কখনও একথা মনে হয়– কবিতা যে আমাদের এমনভাবে অভিভূত ও আলোড়িত করে সে তার ধ্বনিরই প্রভাবে, অর্থগৌরবে নয়। 'কয়েকটি আপাতসামান্য শব্দের সমাবেশ থেকে যে এক অনন্য ভাবমণ্ডল উৎসারিত হয়, তার কারণ কি প্রধাণত ধ্বনি নয়? ছন্দোবন্ধন নয়? সুতরাং সমালোচক কবিতার প্রতি বিশুদ্ধ ভালোবাসায় আধুনিক কবিতার দুরূহতা অতিক্রম করে অনিন্দ্য ও অসামান্য ধ্বনিময় পংক্তির অন্বেষায় পরম আনন্দ লাভ করেছেন। তাই সুধীন্দ্রনাথ কিংবা বিষ্ণু দে-র কবিতা 'ভালো বুঝতে না পারলেও এঁদের রচনার কঠিন উজ্জ্বলতা' বুদ্ধদেবের ভালো লাগে। ধ্বনির ওপর স্বচ্ছন্দ প্রভুত্ব, সমিল গদ্যে সাফল্য প্রভৃতি কারণে সমালোচক মনে করেন কাব্যজগতে বিষ্ণু দে-র আসন স্থায়ী হবে।

কবিতার মৌল প্রেরণা বিষয়ে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের সাথে বুদ্ধদেবের পার্থক্য ছিল। তাই আলোচনার শেষে 'একটি নৈয়ায়িকসুলভ' প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেছেন, বিষ্ণু দে-র মত এলিয়ট-ভক্ত নিছক অন্ত:প্রেরণায় যদি কবিতা না লেখেন, তবে কিসের তাগিদে লেখেন? এ জিজ্ঞাসা কিছুটা শ্লেষ প্রবণ বলে মনে হলেও ব্যাপারটি সমালোচককে পীড়িত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যে এলিয়টের আগমন ও প্রভাব সর্ম্পকে তিরিশের সব কবিই ছিলেন সচেতন, বিমুগ্ধ। এলিয়টের প্রভাব-পরিগ্রহণ সর্ম্পকে বিষ্ণু দে-র স্মৃতিচারণ :

> এলিয়টের সাহায্যে আমাদের অনেকেরই প্রথম বয়ঃপ্রাপ্তির সংবেদন, জিজ্ঞাসা সাহিত্যচিন্তা পেয়েছিল এবং আশা করি পেতে থাকবে পরিণতির দিশা।[১১১]

এছাড়া এলিয়টের *সেকরেড উড*-এর অন্তত দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য বা নন্দনচিন্তা বিষ্ণু দে-কে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর সাথে এলিয়টের কাব্যদৃষ্টির সাযুজ্যের একটি নেপথ্য-সূত্র হচ্ছে কবিকে তাঁর নিজের কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত না করা। কোন্ উৎস থেকে কবিতার জন্ম তাঁর সংবাদ কাব্যেপলব্ধির সময় নিস্প্রয়োজন বলেই মনে করতেন এলিয়ট।[১১২] বিষ্ণু দে-এ মত-ও প্রকাশ করেন যে, 'নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিয়টের দান। এ দান ভুললে এলিয়টোত্তর কাব্যের মুক্তির উৎসও ভুলতে

হয়।'[১১৩] এছাড়া কেবল নৈর্ব্যক্তিক তন্ময়ত্বই নয়, আত্মসচেতনতাও এলিয়ট-অনুপ্রাণিত। বিষ্ণু দে-র চিন্তায় এই আত্মসচেতনতার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। আত্মসচেতনতা যখন চিন্তার ক্রিয়াশীলাকে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় যুক্ত করে, তখন শিল্পীর উদ্দেশ্য দাঁড়ায় মানুষকে সুষুপ্তি থেকে জাগ্রত করা, স্বল্পার্জিত আত্মজ্ঞানের সীমাকে পরিবৃদ্ধি করা এবং মানুষের প্রচ্ছন্ন শক্তির উদ্‌ঘাটন করা; শিল্পের সত্য তখন মানুষের আত্মসচেতনতার তথা অস্তিত্বের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। কবিতারচনা মাত্রেই আত্মসচেতনতার এক সক্রিয় কর্মরূপে তাঁর কাছে পরিগণিত হয়েছিল বলে তাঁর মনন কাব্যরচনায় মানবজাতির চিন্ময়সত্তা ও শিল্পের সত্যকে অঙ্গীকারের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল।"[১১৪] কাব্যচর্চার প্রাথমিক প্রয়াসে বিষ্ণু দে সচেতনভাবে যা পরিহার করে চলেছিলেন তা হল ব্যক্তিসর্বস্ব অনুভূতির চর্চা। 'এর বিপরীতে তাঁর আরাধ্য ছিল টেকনিকের গুরুত্ব ও কবিতারচনার শ্রমশীলতা অঙ্গীকার করা।'[১১৫] কবিতার শিল্পরূপের উৎস সম্পর্কিত জ্ঞান আধুনিক চৈতন্যে তিনি যেভাবে ধারণ করেছেন, সৃষ্টির মৌল অন্তঃপ্রেরণা বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে চর্চিত হওয়া সংজ্ঞার্থের সাথে ভাবনাহীন একাত্মতা তখন সম্ভবও ছিল না। সুতরাং 'জ্ঞানের সাথে নন্দনচেতনায় বিচ্ছিন্নতাকে দূর করবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের মত আবেগাত্মক আধুনিক প্রকাশবাদী হয়েও মনন ও চৈতন্যের দ্বৈত টানের সংযোগে আধুনিকতার নতুন মাত্রায় আত্মসংগঠন করেন কবি।'[১১৬] তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাও এই সূত্রে বিচার্য। বুদ্ধদেব বসু কাব্যের অন্ত:প্রেরণা বিষয়ে এলিয়টীয় প্রভাব নিয়ে বিষ্ণু দে-কে যে কারণে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তা সমালোচকের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণার সাথে আপাত বিরোধপূর্ণ হলেও বিষ্ণু দে-র ঐ স্বীকারোক্তি তাঁর মানসগঠন, বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের রূপ অনুসারে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বাভাবিক।

সমর সেন

সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭) সাথে বুদ্ধদেব বসুর পরিচয় ১৯৩৪ সালে।[১১৭] নিজের চেয়ে আট বছরের বয়োকনিষ্ঠ সমর সেনের কবিতার গুণমুগ্ধ ছিলেন বুদ্ধদেব। আর তা পরিচয়ের প্রথম থেকেই 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় (১৯৩৫) সমর সেনের চারটি কবিতা ছিল; তারপরেও যতদিন না সমর সেনের কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে গেছে, বুদ্ধদেব নিয়মিত তাঁর গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। যখন কবিতাভবন প্রকাশনার সৃষ্টি হল, সেখান থেকে সমর সেনের প্রথম কবিতার বই বের হল, *কয়েকটি কবিতা* এছাড়া 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম আটটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র আর সহকারী সম্পাদক সমর সেন (আশ্বিন ১৩৪২ থেকে আষাঢ় ১৩৪৪)। এরপরেও পৌষ ১৩৪৭

(১৯৪১) পর্যন্ত সমর সেনের নাম সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মুদ্রিত হতে থাকে।[১১৮] *কালের পুতুলে* 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭) নামে বুদ্ধদেবের সমালোচনাটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যভাবনায় দুস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়–এ দুজন তরুণতর কবিকে সূচনালগ্নেই অসামান্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। 'উভয় তরুণ কবিকেই আলোচনায় তাঁর মনে পড়েছে, তিনিও একদা ছিলেন বাংলা ভাষার তরুণতম কবি। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন ও অগ্রজের স্নেহ নিয়ে তিনি সমর-সুভাষ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁদের তিনি উৎসাহিত করেছেন উজ্জ্বল প্রশংসায়, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ধরিয়ে দিয়েছেন দীর্ঘ আলোচনায় এবং তাঁদের মধ্যে লক্ষ করেছেন এক রকমের আশু নিঃশেষের সম্ভাবনা।[১১৯] সমর সেন সমাজতন্ত্রী কবি, কবিতায় তা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। বুদ্ধদেব সমকালের রাজনৈতিক মতাদর্শ সর্ম্পকে সচেতন, তবে আর্টের সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার (শিল্পচর্চার প্রতি একান্ত অভিনিবেশ ও শিল্পের স্বরূপকেই শ্রেষ্ঠতর মূল্যায়নের প্রশ্নে) বিষয়ে সমালোচকের নিজস্ব বিশ্বাসের সাথে একটা দ্বন্দ্ব সমর সেনের একনিষ্ঠ বামপন্থী মনের সঙ্গে হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। সমর সেনের সমালোচনার শুরুতেই তিনি কবির বিদ্রোহী চেতনাকে শিল্পরচনার বা সৃষ্টির তথা নবযৌবনের বিদ্রোহ হিসেবে ধরে নিয়ে একে প্রেরণার এক পথ-বিভূষণ বলে বিচেনা করেছেন। *কয়েকটি কবিতার* অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলোতে শ্রেণী-সংঘর্ষ, অস্থির পরিবেশ, সমাজ-বিরোধ, নানা প্রকার সংঘাত, অর্থনৈতিক দুর্ব্যবস্থা, এককথায় পূর্ণ প্রতিকূল সময়কে স্বীকার করে সমালোচক এর একটা সমর্থন প্রয়াসী যৌক্তিক বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব তাঁরই *বন্দীর বন্দনা* কাব্যরচনার কালে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা কেমন ছিল তা স্বীকার করেছেন। আর তা ছিল 'সৌন্দর্যানুভূতি', 'সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিজের ভেতরে যত বাধা, যত প্রলোভন ও দুর্বলতা, তার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ; একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্রকামনা–এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রনা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত।[১২০] একান্ত আত্ম-সংকট বা আত্ম-মীমাংসার কাব্য[১২১] 'বন্দীর বন্দনা'র বিষয়বস্তু ও এ কাব্য লেখার প্রেরণার সাথে সমর সেনের কবিতার কিংবা কাব্যপ্রত্যয়ের বিভেদ এ বক্তব্যে নির্দ্বিধায় ঘোষিত হলেও এক্ষেত্রে সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সচেতন প্রত্যয়ই প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় একই কালে অগ্রজ হিসেবে অনুজের কাব্য সমালোচনায় সময়-প্রভাবিত পার্থক্য ও বৈচিত্র্যকে সৃষ্টির শিল্প বাস্তবতা হিসেবেই গণ্য করেছেন তিনি; এতে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনন ও সমাজ-বাস্তবতার সাথে শিল্পসৃষ্টির স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিষয়ে সচেতনতাও ব্যক্ত হয়েছে। *কয়েকটি কবিতা* কাব্যগ্রন্থ রচনার পেছনে সমর সেনের কবিসত্তা যে ধরণের অনুপ্রেরণা যে কারণে পেয়েছে, তা বুদ্ধদেবের ভাষায় :

> যে-রকম বয়সে সমর সেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' লিখেছেন, সে-রকম বয়সেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লিখেছিলুম; এই দুই নবযৌবনের কাব্য মনে মনে তুলনা করতে লাগছে। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে; দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে; তুলনা করলে এইটেই দেখা যাবে যে 'কয়েকটি কবিতা' কালপ্রভাবে কিছু বেশি 'আধুনিক', এবং লেখকের স্বভাবের প্রভাবে কিছু বেশি সীমাবদ্ধ। 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন ... সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বাইরের; আত্মবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। ... বর্তমান সময়ের সংশায়াচ্ছন্ন অন্ধকার যে-তরুণ চিত্তকে আবিষ্ট করেছে, সমর সেন তারই প্রতিনিধি।[১২২]

শিল্পসৃষ্টির বা কবিতা-রচনার অন্তরালে প্রেরণার আনুকূল্যকে স্বীকার করেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেরণার একটি কারণ হিসেবে এখানে তিনি যে সৌন্দর্যানুভূতির কথা বলেছেন তা ভিক্টোরীয় বা রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্যবোধের মতই শোনায়, রোমান্টিকদের সত্য ও সুন্দরের সামঞ্জস্য বিষয়ক শিল্পচিন্তাও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তবে বুদ্ধদেব বসু স্পষ্টই বলেছেন সৌন্দর্যানুভূতির এই ঐতিহ্যের দিকে যাত্রা তাঁর সাহিত্যেক জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। সমর সেনের সমালোচনা সূত্রে এই প্রসঙ্গে তিনি আলোকপাত করেছেন বিশেষত সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্য উপলব্ধি করার প্রশ্নে। তাঁর মতে, মানবসমাজ যে অর্থনৈতিক দুর্ব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়েছিল সেই সময়ে, সেখানে ধনিকের লোভ, রোগ ও দুর্ভিক্ষ, সময়পিষ্ট স্থূল ও নির্বোধ, মধ্যবিত্ততা, আধুনিক জীবনে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 'ব্যভিচারী প্রতাপে' নষ্ট হওয়া মানজীবনের ভারসাম্য এই সকল কিছুর মাঝে শিল্পসৃষ্টির স্বাভাবিক প্রেরণা, নিস্কলুষ শিল্পচর্চার পরিবেশ বিপর্যস্ত ও বিনষ্ট। তাই সেখানে সৌন্দর্যের বোধ ব্যাহত হয়েছে; ছোটো ছোটো গণ্ডির দ্বারা রক্ষিত স্বার্থের খাতিরে বহুর দৈহিক ও আত্মিক বিনাশ ঘটেছে, রয়েছে বড়ো বড়ো নীতিকথার আড়ালে অনাচার, অত্যাচার, যৌবন-বাসনার বিকৃতি ও অবাননা, নিরানন্দ যান্ত্রিক কাজের নিষ্পেষণ আর নিরানন্দ ক্লীব সম্ভোগের ক্লান্তি। এছাড়া কোনোখানে বড়ো কোনো আদর্শ নেই, মানুষের দেহমনের সহজ স্ফূর্তি অন্তর্হিত, সারা জীবন তখন এক কঠিন নিষ্ঠুর নিয়মের ক্রীতদাস। 'এই সামাজিক পরিবেশ কবির উন্মীলমান যৌবন পীড়িত হবেই, এবং সেই পীড়া থেকে তার কাব্য একেবারে মুক্ত হবে না।'[১২৩] সুতরাং বিশ শতকের সেই সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার গতি ও আবর্তে অনিশ্চয়তা-আক্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে অসুস্থ পীড়িত সময়েরই প্রতিফলন ও শিল্প-সাহিত্যে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সমালোচক বুদ্ধদেব সমর সেনের নানা কবিতার বিষয়বস্তুতে অসুস্থ যুগের নির্মম ছবির নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ লক্ষ করেন। সেখানে রয়েছে আধুনিক নগর জীবনের অতি বাস্তবিক চিত্র:

> মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাৎরার মতো রাত্রি
> ...
> আর কতো লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
> আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
> হে মহানগরী!
> যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্তবাতাসে
> স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ স্ট্রিট জনহীন
> দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
> সন্ধ্যা নামলো;
> মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
> দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়;
> কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে! [নাগরিক]

কবিতার কথাগুলোতে বুদ্ধদেব দেখেছেন 'শহরের উচ্ছৃঙ্খল তোলপাড়ের প্রতিধ্বনি, ব্যঙ্গ ও বিক্ষোভ, নীরক্ত মানুষের ক্লান্তি, আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদের ইঙ্গিত'– সেটাও তাঁর মতে অগ্রাহ্য নয়। নগরজীবনের এইসব বর্ণনা থেকেই সমর সেন প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন; কিন্তু আমাদের কাব্যে এ-পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল-বালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খণ্ড-খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো-কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও সমগ্রভাবে আধুনিক নগর জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি।[১২৪]

তাছাড়া ক্লান্ত নগর জীবনে, বিপর্যস্ত ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় কী করে আক্রান্ত হয়েছে জীবন বিষয়ে কবির উপলব্ধি তা অনুভব করে সমালোচক বলেন, 'সমর সেনের কবিতায় অসুস্থতা-বোধ খুব বড়ো একটা লক্ষণ।' স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ও তা থেকে মুক্ত নয় :

> আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে

আজ তোমার আবির্ভাব হলো:
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ম প্রহার। [একটি মেয়ে]

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষন্ন মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে;
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি
কত দীর্ঘশ্বাস
কতো সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কতো দিন। ['উর্বশী']

তবু সমর সেনের কবিতায় বুদ্ধদেব খুঁজে পান 'একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনকে।' এ প্রসঙ্গে বলেন :

> এরই মধ্যে 'কয়েকটি কবিতা'য় খাঁটি নবযৌবনের দেখা পেলাম। প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরূদ্ধে এ বিদ্রোহ নতুন নয়; কিন্তু সমর সেনের সুর নতুন বলেই বিষয়ও নতুন মনে হয়। প্রথম অংশের কবিতাগুচ্ছ লিরিকধর্মী; সেখানে শুধু সুরটাই আমরা শুনি, তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের নিয়ে যায় না।[১২৫]

নবযৌবনের বিষন্নমধুর দীর্ঘশ্বাস আর কবির ব্যাকুলতাকে বুদ্ধদেব আবিষ্কার করেন নিজ কবিসত্তার নিবিড় উপলব্ধিতে :

অনেক, অনেক দূরে আছে
মেঘমদির মহুয়ার দেশ

সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ। [মহুয়ার দেশ]

সমর সেনের কবিতার রীতি বিচার ও গুরুত্বের সঙ্গে করেছেন বুদ্ধদেব বসু। কেবলই গদ্যে রচিত সমর সেনের এইসব কবিতাগুলো কারুর প্রভাব ছাড়াই বাংলা ভাষার অভিনব হয়েছিল– সমালোচককে তা মুগ্ধ করেছে। নিখুঁত গদ্যছন্দে রচিত কবির কবিতায় কখনও কখনও জোরালো রেখায় ফুটে উঠেছে গভীর ইঙ্গিতময় ছায়া-ছবি। তাছাড়া কবির নির্বাচিত বিষয়বস্তু ও কলাকৌশলে প্রায় প্রথম থেকেই এক ধরনের পরিণত আত্মপ্রত্যয়ের ভাব দেখেছেন সমালোচক, যা শক্তিশালী কবিতেও বিরল বলে মনে করেন তিনি। 'কবিতা' পত্রিকায় সমর সেনের *কয়েকটি কবিতা* সম্পর্কে বুদ্ধদেবের এই সমালোচনাটি বের হলে এর পরবর্তী ফল সম্বন্ধে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

> বুদ্ধদেব বসু যদি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ না করতেন এবং সমর সেনের কবিতা নিয়ে উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখতেন, তাহলে হয়তো তাঁর কবিতার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি পড়ত না।[১২৬]

সমালোচনার শেষে বুদ্ধদেব কামনা করেছেন সমর সেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' কাব্যে পরিণতির প্রথম পরিচ্ছেদ পার হবার পরে 'নতুন কল্পনার অভিনিবেশ জয় করবেন।' ভাঙাচোরার মাধ্যমে নতুন গঠনের জন্ম দেবেন এবং ক্রমেই নিজের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যাবেন। আর এর দিয়ে 'বাংলা কাব্যকেও দিগন্তবিহারিণী' করবেন কবি সমর সেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯৪০ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯-২০০৩) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। প্রবেশিকা পাশ করে তিনি আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, ছাত্র-আন্দোলনে শরিক হয়ে ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন তিরিশের দশক থেকে। ১৯৪২ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন। ১৯৪৩ সাল থেকে তিনি পার্টির সবসময়ের কর্মী। এই সম্পৃক্তি ও ব্যস্ততায় তাঁর এম.এ.পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ১৯৪৩

সালে গড়ে ওঠে ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক হলেন। এ পর্যায়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর অন্যতম প্রধান সংগঠক হয়ে উঠেছিলেন। তিরিশ থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতেই রাজনৈতিক দার্শনিক, নৈতিক এবং অস্তিত্বগত নানা সংকট চলেছে। পুঁজিবাদ, বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধঘটিত নানা বিপর্যয়ে রাষ্ট্র, সমাজ এবং তার অর্থনৈতিক ভিত্তি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা ও প্রতিবাদ বৈশ্বিক গুরুত্ব পায় ১৯১৭-য় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার তাগিদ ক্রমেই বেড়ে চলে। ভারতবর্ষে এ আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হবার মূল কারণ, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বিদেশী শোষণ; এছাড়া জাতীয়ত্বের বোধে বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নানামাত্রিক স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রগাঢ় হয়েছিল। ১৯১৯ সালে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতবর্ষে সাম্যবাদ বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯২৭-২৮ সালের মধ্যে ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস, পূর্ববর্তী দেশীয় নানা আন্দোলন (গান্ধীবাদ, সন্ত্রাসীবাদ) বা রাজনৈতিক মতাদর্শে থাকা 'ভুল' সর্ম্পকেও সচেতনতা ছিল। গণমুখী শ্রেণিসংগ্রামের প্রস্তুতি, আর্থ-সামাজিক উৎপাদন কাঠামো সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান, সামাজিক ধনবৈষম্য বিষয়ে স্পষ্ট অভিজ্ঞান সর্বোপরি সাংগঠনিকভাবে বিপ্লবকে একটি মতাদর্শভিত্তিক জাতীয়-আন্তর্জাতিক মূল্য দেয়া– কম্যুনিস্ট আন্দোলন এইসব প্রত্যয়ে পরিচালিত হবার প্রয়াস পায়। কারণ ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থায় আপোসী তা বুর্জোয়া আন্দোলনে পরিণত হবার আশংকা ছিল, কম্যুনিস্ট বিপ্লবী চেতনা তা মেনে নিতে চায় নি। আধুনিক কবিরা বিভিন্ন চিন্তাধারা ও অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হয়েছেন। লক্ষ্য ও পন্থা নিয়ে দেশব্যাপী অনিশ্চয়তা তাঁদের অনুভূতিপ্রবণ মনকে বিভ্রান্ত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই বিভ্রান্তি আরো বেড়ে গেল ১৯২৯-৩০ এর চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে। পারিপার্শ্বিক নানামুখী আঘাতের ফলে আধুনিক কবি-চিত্ত পরিচিত জগৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাল। সুতরাং মানুষ হিসেবে, উপনিবেশী শোষিত রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন সংবেদনশীল কবির কর্তব্যচেতনা তাকে নির্দেশ নিয়েছে প্রত্যহ স্পষ্ট সামাজিকের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হতে। এছাড়া ইতিহাসের বড়ো মোড়ে দাঁড়িয়ে যেকোনো সৎ সাহিত্যিকই সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করবেন। বাংলা আধুনিক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্য হল– 'গণ কবিতা বা সাধারণের কাব্যই তিনি লিখেছেন, তবে সে রচনায় তিনি স্মরণীয় সিদ্ধির প্রমাণ রাখলেও তাঁর প্রধান সার্থকতা তাঁর ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরে।'[১২৭] নিজের কর্তব্য ও প্রত্যয়ের উপরোধে লেখা তাঁর রাজনৈতিক পংক্তিগুলোর সার্থকতা সমালোচক বুদ্ধদেব বসুও এই দৃষ্টিতে

দেখেছেন। *পদাতিক* কাব্যগ্রন্থের বিশেষ নামকরণটির মধ্যেই তাঁর তৎকালীন কবি-অভিপ্রায় নিহিত। বুদ্ধদেব বসু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি-স্বভাবের নানা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে কবির সব স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য সমানভাবে ইতিবাচক নয়, এর কোনোটি নঞর্থক। তবে এক্ষেত্রে সমালোচক হিসেবে তাঁর নান্দনিক মতাদর্শ, বিশ্বাস, সময়-সমাজ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, সচেতনতা কিংবা জ্ঞান ইত্যাদি বজায় থেকেছে। বুদ্ধদেব বসুর বিচারে সুভাষের কবি-বৈশিষ্ট্য যেভাবে ধরা পড়েছে, তার সংক্ষিপ্ত-সার হল :

- 'সমকালীন কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই 'প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করেন নি।'[১২৮] এমনকি তিনি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও লিখলেন না; তাঁর কবিতায় কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ নেই।
- সুভাষের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ। যাকে দুর্লক্ষণও বলতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব।
- প্রবল ও স্পষ্টভাবে তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী।
- সুভাষের কবিতায় প্রতিফলিত মুক্তিকামনা ব্যক্তিক নয়, সমগ্র মানবসমাজের জন্য। আর কেবল সাম্য ও সংহতিই তাঁর কাছে এই মুক্তির সমার্থক সংজ্ঞা। কবিতাগুলো হয়ে উঠেছে সমাজবিপ্লবের আগমনী গান।
- শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক ব্যঙ্গনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করলেও তিনি নিরাশ কবি নন।
- 'জনগণের কবি' হবার প্রায় সমস্ত উপাদান কবির আছে। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ তখন ইতিহাসের এমন একটি পর্যায় এসে পৌঁছেছে, 'যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হ'য়ে বাজছে না, অস্ত্র হ'য়েও ঝলসাচ্ছে।'[১২৯]
- তাঁর কবিতায় রয়েছে উচ্চস্বর বা বক্তৃতার ঢং, কিন্তু তাতে কবিতার সুর বিকৃত হয়নি। কারণ সে স্বর পরিশীলিত ও ধ্বনিময় অথচ অনুগ্র।
- শক্তিমান কবি বলেই 'সাম্যবাদে সন্দিহান পাঠকের' পক্ষেও 'পদাতিক' উপভোগ্য হতে পারে। কলাকৌশলের গুণে সুভাষের কাব্যে প্রকাশিত নীতি বা বিশেষ বিশ্বাস সত্ত্বেও কাব্যে তিনি সরসতার সঞ্চার করতে পেরেছেন। প্রবল বিশ্বাসের এইসব কবিতাগুলো স্পষ্ট ও সরল, সভা-

> সমিতিতে পঠিত হবার মতো বলেই তিনি চেয়েছেন সোজা কবিতা লিখতে। 'নিছক কান দিয়ে শুনলে এসব কবিতা ভালো লাগবে। কবিতাগুলোতে শোনা যাচ্ছে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট, একটি আশার– এমনকি বেপরোয়া ফুর্তির– সুর; এ যেন বৃহৎ জনসভায়, বা 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে' গাইবার মতো রচনা, আর কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা ব'লেও তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়নি; যে ছন্দ তাঁর কথাগুলোকে দোলাচ্ছে, নষ্ট হয়নি তার সুমিতি।'[১৩০]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যাদর্শের সঙ্গে বুদ্ধদেবের কবিপ্রকৃতি মেরুপ্রতিম দুরত্বের। একজন মনে করেন, 'তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। অন্য জন হতে চান জনতার একজন এবং কমরেড।'[১৩১] তবু সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্য *পদাতিক* প্রকাশিত হলে তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন ও সমাদর জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁকে 'বাংলার তরুণতম কবি' রূপে অভিনন্দিত করেন। প্রেমের কবিতা না লিখেও সার্থক কবি হওয়া যায় তা বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় দেখিয়েছেন। আর কবিতার ছন্দ ও প্রয়োগে নবীন কবির দক্ষতা বিস্ময়কর, যা 'অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও শিক্ষণীয়।' এছাড়া সুভাষের কাব্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন 'আশার উল্লাস' ও বিশ্বাস। তাই কবিতা উপভোগে কোনো বাধা থাকে না। তবে এ সমালোচনায় বুদ্ধদেবের কিছু জিজ্ঞাসা ও প্রত্যাশাও রয়েছে– যেগুলো তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমত, সুভাষের কাব্যে সাময়িকতার প্রসঙ্গ। এ কথা স্মর্তব্য যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই মুখ্যত সমকালীন জীবনের কবি। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে সতত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর কবিভাষায় ধরে রেখেছেন। আজীবন তিনি সংগ্রামী মানুষের সহযাত্রী, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয়ের নিত্যসঙ্গী। এককথায়, সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর কবিভাষা। সাম্যবাদী প্রত্যয়, বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আগস্ট-আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাতচল্লিশের বিভক্ত ভারতবর্ষ, স্বাধীনতাত্তোর ভঙ্গুর বা দ্বান্দ্বিক রাজনীতি, উনসত্তর ও একাত্তরে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অরাজকতা, সার্বভৌম সাংস্কৃতিক সংকট, প্রান্তিক কৌম জীবন– সব কিছুই সুভাষের তীক্ষ্ম সংবেদনশীল মনে অভিঘাত হেনেছে, তাড়িত কবি এক গভীর মানবিকতাবোধে অজস্র-বর্ষী লেখনী ধারণ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু কেবল তাঁর পদাতিক কাব্যগ্রন্থই আলোচনা করেছেন, সমগ্র সুভাষ সেখানে আলোচ্য ছিলনা তা সম্ভবও নয়। তবে সামাজিক পরিবেশ-সঞ্জাত বিষয়বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ ও কাব্যের সাময়িকতা–আক্রান্ত হওয়া প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মানুষের মূল্যবোধ মানুষের মনে ঘন-ঘন ওঠা-নামা করে। তাই 'শুধু বিষয়বস্তু নিয়েই কথা হ'লে এক যুগের সাহিত্য অন্য যুগে প্রায়ই পড়া

যেতো না। উদাহরণত, অনায়াসে কল্পনা করা যায় যে সাম্যবাদেই যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সাম্যবাদ হবে সাহিত্যের একটি নীরস বিষয়, কেননা সেটা আর প্রার্থনীয় থাকবে না, হ'য়ে উঠবে নিতান্ত বাস্তব। 'কালসংকটে যে-কোনো একটি সমাধানের ইঙ্গিতে অনেক পাঠকেরই মন নেচে ওঠে, কিন্তু সেটা অসাহিত্যিক কারণে।'[১৩২] সময়ের জালে আটকে পড়া কবি সকল কালের সময়োত্তর কবির ভূমিকায় উত্তীর্ণ হোন– সমালোচক বুদ্ধদেব সম্ভবত তাঁর বক্তব্যে এই কামনাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, পাশাপাশি সাময়িকতাকেও তিনি স্বীকার করেছেন। তা না হলে 'সরল চড়া গলার গণ-কবিতা'গুলো তাঁকে আকর্ষণ করতে না। আবার সরল চড়া স্বরের জনমুখী কবিতার সমান্তরালে 'পদাতিকে'র জটিল কলাকৌশল, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ বা 'জলিট বিন্যাসের সংস্কৃতিবান' কবিতা বুদ্ধদেবকে আকৃষ্ট করে। কারণ তিনি মনে করেন, সৎ কবিকে ভিড় এড়িয়ে 'ফিরতেই হয় স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর দিকে ... যদি তিনি কবি হিসেবে নিজের পূর্ণ বিকাশ প্রার্থনা করেন।[১৩৩] এ পর্যায়ে জনগণের সাহিত্যে তথা সাম্যবাদী চেতনার সাথে বুদ্ধদেবের চিন্তার দ্বন্দ্বের চেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে অন্য কিছু। বিশিষ্ট রীতির জন্ম দেয়া বা কলাকৌশল তথা সমৃদ্ধ শিল্পপ্রকৌশলকে আয়ত্ত করবার যে শিল্পবোধ, তার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, শুধু বিষয়বস্তু দিয়ে কবিতার বা যে-কোনো শিল্পের বিচার করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে; কেননা শুধু যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয় মহিমা লাভ করে তা নয়, উপরন্তু একই বিষয় কোনো পাঠকের চোখে মহৎ, আবার অন্য কোনো পাঠকের চোখে দুষ্য। 'এই কারণে কলাকৌশলের আলোচনা ভিন্ন কবিতার সমালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।'[১৩৪] এই প্রত্যয়ে সমালোচক *পদাতিকের* শিল্পরীতি বিষয়ক আলোচনা করেছেন। অবশ্য রচনার রূপগত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রতি আগ্রহ সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রধান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব প্রধাণত তাঁর ছন্দে, তাঁর 'ছন্দের কান নিখুঁত'। তিন মাত্রা ও পয়ার দুইরকম ছন্দেই কবির সাফল্যকে প্রশংসা করেন সমালোচক। অন্ত্যমিল বর্জন করে যুক্তবর্ণের কবির কৃতিত্ব রয়েছে, যেমন :

রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি

এছাড়া চিত্ররূপের বর্ণনায় সুভাষের দক্ষতা তাঁর নিজস্ব কবিস্বভাবকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। 'সাময়িক প্রসঙ্গকে কিংবা সংবাদপত্রের তথ্যকে আবেগের তাপে গালিয়ে' কবি তাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন :

'নিষিদ্ধ খনির গর্তে লালকোর্তা সূর্যের বারতা' ['দলভুক্ত']

তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায়। ['পদাতিক']

পাশাপাশি সৌন্দর্যমুগ্ধতাও আছে তাঁর কবিতায়। নাগরিক ধূসর জীবনকে পিছনে ফেলে কবি যখন নিসর্গ শোভায় মুগ্ধ তখন তাঁর বিশুদ্ধ কবিদৃষ্টি সমালোচক বুদ্ধদেবকে আকর্ষণ করে :

চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুজে
হবো অপরূপ অপরাহ্নের নদী। ['পদাতিক']

কল্প-আবেগ সমৃদ্ধ এই অপরাহ্নের নদী যা বুদ্ধদেব 'সহজে ভুলবেন না' বলেছেন তা সুভাষের রোমান্টিক নিসর্গ-প্রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সমালোচনার সমাপ্তিতে বুদ্ধদেব চেয়েছেন সুভাষ কবি ও কর্মী হওয়ার মধ্যে একটিকে যেন বেছে নেন। মানুষ ও কর্মী হিসেবে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কর্তব্য আর কবি হিসেবে কবিতার উৎকর্ষ সাধন– এই দু'য়ের পৃথকতা নির্ণয়ে বুদ্ধদেবের বক্তব্য স্পষ্ট। কারণ একই কালে একজন 'কঙ্কাবর্তী'র দীর্ঘ কেশপাশ আর কর্মী-কবি বহ্নিমান ক্যাপ্টেন সাংহাইকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁরা দুজনে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিগত আবেগের বিষয় নিয়েই কবিতা রচনা করেছেন। 'তফাৎটা হল– একজনের জগৎটাই ছিল নিজস্ব নিভৃত জগৎ, আরেক জনের জগৎ এবং জীবন একাকার। শেষোক্তের ব্যক্তিগত আবেগের বিষয়-উপাদান বাইরের সংঘর্ষ সঙ্কুল শ্রেণীবিভক্ত বিশ্ব মানব সমাজ থেকে সংগৃহীত।'[১৩৫] তাছাড়া সজাগ আত্মবীক্ষণের কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন, কিন্তু 'কর্তব্য'কে তিনি যেভাবে বুঝেছিলেন, তা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি, সাহিত্যিক হিসেবেও না। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক মতাদর্শ সবসময় এইসব বোধের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। এক্ষেত্রে সমালোচক হিসেবে কবির প্রতি তাঁর বিচার (appreciation) একান্তই ভিন্ন ব্যাপার।

তথ্য নির্দেশ

১ সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা* (১৯১৪-১৯৪১) পুস্তক বিপণি, প্র.প্র. এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ২২২

২ হুমায়ুন আজাদ, 'কালের পুতুল-এর কালপুরুষ', *আধার ও আধেয়* ,আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৩৮

৩ ১৯৫২ সালে বুদ্ধদেব বসু ভর্তি হন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেলে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্ম্মবাণী' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। ততাদিনে তিনি হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯২৭ সালে আই.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাসিক কুড়ি টাকার স্কলারশিপ পান বুদ্ধদেব। জুলাই মাসে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে; আর ওই সময়েই– ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত হয় 'প্রগতি' পত্রিকা। সাতচল্লিশ নম্বর, পুরানা পল্টন– ক্ষণজীবী 'প্রগতি'র কার্যালয়। দ্রষ্টব্য, সুদক্ষিণা ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসু*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্র.প্র. ২০ মে ১৯৯৭, পৃ. ৫-৬

৪ বুদ্ধদেব বসু, আমার যৌবন, উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, বিকল্প, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্কারণ, নভেম্বর ২০০৮ পৃ. ৪৩

৫ বুদ্ধদেব বসু, আমার যৌবন, উদ্ধৃত, সুদক্ষিণা ষোঘ, *বুদ্ধদেব বসু*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৬ স্বপন মজুমদার, 'সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু', *বৈদগ্ধ্য* (শেখর বসু রায় সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, কলকাতা মে ১৯৯৯, পৃ. ২৪১

৭ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা বের হয় শ্রাবণ ১৩৩৮ অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট ১৯৩১-এ। *বন্দীর বন্দনা*র সমালোচনা সহ 'পরিচয়ে' বুদ্ধদেবের কিছু কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। আর 'পূর্বাশা' প্রথম বের হয় ১৩৩৯ (১৯৩২-৩৩) বঙ্গাব্দে, কুমিল্লা থেকে। সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯) এ পত্রিকা পরে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার প্রথম দু'বছরে বুদ্ধদেবের অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকার সূত্রে কোনো এক বৈঠকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে হ্যারিয়েট মনরো (১৮৬১-১৯৩৬) সম্পাদিত ইংরেজি 'Poetry' পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখে 'কবিতা' পত্রিকার পরিকল্পনা করেন তিনি। দ্রষ্টব্য, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭,৬৯ ও ৭২

৮ উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার দাস, 'প্রগতি ও কবিতা-র উজ্জ্বল অধিনায়ক : বুদ্ধদেব বসু', *বুদ্ধদেব বসু : সঙ্গ-প্রসঙ্গ* (গৌরশংকর বন্দ্যোপধ্যায় সম্পাদিত), পত্রলেখা, কলকাতা, প্র.প্র. মার্চ ২০০৮, পৃ. ৯৯

৯ উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

১০ এডোয়ার্ড টমসনের মৃত্যুর পর, আষাঢ় ১৩৫৩ সংখ্যা, 'কবিতা'য় 'বিদেশী সাহিত্য' বিভাগে বুদ্ধদেব রচনাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

১১ উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার দাস, 'তরুণ কবিদের অভিভাবক', *বৈদগ্ধ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

১২ উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

১৩ উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার দাস, 'প্রগতি ও কবিতা-র উজ্জ্বল অধিনায়ক : বুদ্ধদেব বসু', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

১৪ বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'পদাতিক', *কালের পুতুল*, তৃতীয় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলিকাতা, মে ১৯৯৭, পৃ. ৮১

১৫ অমিয় দেব, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ', *বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য* (দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্র.প্র. জুলাই ২০০৫, পৃ. ২৫৬

১৬ ক্ষেত্রগুপ্ত, *মধুসূদন : কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্র. প্র. ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৩

১৭ বুদ্ধদেব বসু, 'মাইকেল', *সাহিত্যচর্চা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মে ২০০৯, পৃ. ২৩ ও ৩৬-৩৭

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৯ হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'শিল্পিত স্ববিরোধ : প্রবন্ধের শিল্পী', *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে* (তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, পৃ. ২৩২

২০ 'মাইকেল', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২১ হুমায়ুন আজাদ, 'কালের পুতুল-এর কালপুরুষ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

২২ 'প্রমথ চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ' (১৯৪১)-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। উদ্ধৃত, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বীরবল ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৬

২৩ বুদ্ধদেব বসু, 'প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

২৬ গদ্যভাষাকে শিল্পিত করার প্রযত্ন সব লেখকে পাওয়া যায়না। প্রবন্ধসাহিত্যে বুদ্ধদেবের গদ্যশৈলী উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছিল। গদ্যভাষার পেছনে প্রমথ চৌধুরীর ভাষাবিষয়ক যত্ন এ কারণেই তাঁকে আকৃষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন : "Though born to a literature naturally given to excesses of enthuasiasm and to a language yet untaught in the true discipline of prose, he has, all his life, valued order more than ardour, and precision more than tension, so that, despite his Oscar Wild-like weakness for epigrams and paradoxes, he has remained incapable of either the suffocating sensuousness or the hypnotic word-music of the English prose-poet. Averse to chairoscuro, he has insisted on a plain style, low of pitch and level of tone, farthest from oratory and nearest to conversation when conversation becomes an art". 'Pramatha Chaudhuri, *An Acre of Green Grass*, Papyrus, Calcutta, November 1982, p. 36

২৭ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', *সাহিত্যচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

২৮ দ্রষ্টব্য, মোহিতলাল মজুমদার, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ১৭৯

২৯ বুদ্ধদেব বুস, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৩১ বুদ্ধদেব বসু, 'কবি সুকুমার রায়', বুদ্ধদেব বসুর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (বিশ্বজিৎ ঘোষ সংকলিত ও সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৬৮

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩৪ বুদ্ধদেব বুস, 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

৩৫ তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুতুল : কবির চোখে কবি', *বুদ্ধদেব বসু : কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রতে*, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, প্র.প্র. সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ১১৪

৩৬ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', *সাহিত্যচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৩৭ বুদ্ধদেব বসু, 'নজরুল ইসলাম', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

৪০ উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পৃ. ৪৭-৪৮

৪১ "পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম।" বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৪২ দ্রষ্টব্য, তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুতুল : কবির চোখে কবি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

৪৩ দ্রষ্টব্য, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৪৪ উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার দাস, 'তরুণ কবিদের অভিভাবক', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

৪৫ -৪৬ বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯

৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৪৯ 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

৫০ ক্লিন্টন বি সিলি, *অনন্য জীবনানন্দ/ জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক জীবনী* (ফারুক মঈনউদ্দীন অনুবাদিত) প্রথমা, ঢাকা প্র. প্র. জুলাই, ২০১১, পৃ. ১১৪

৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

৫২-৫৩ 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

৫৪ জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা ও কবিতা প্রসঙ্গে', *কবিতার কথা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, দশম সংস্করণ ১৪১৩, পৃ. যথাক্রমে ১৩ ও ৪৪

৫৫ কৃষ্ণগোপাল রায়, 'জীবনের সম্ভাবনা খুঁজে তিনি কবি', *জীবনানন্দ নিয়ে* (প্রণব ভট্ট সম্পাদিত), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০১, পৃ. ৩৩৯

৫৬ বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ স্মরণে', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৫৮ "আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন এবং গেলো দশ বছর যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি।", বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ : বনলতা সেন', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৫৯ 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

৬০ ১৩৫৩-এর আশ্বিনের 'কবিতা' সংখ্যায় বুদ্ধদেব লেখেন : "জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল?" এ-প্রশ্ন সাধারণভাবে সাধারণ পাঠক করতে পারেন, আমরা তাঁর অদ্বিতীয় ভক্ত ব'লে বিশেষভাবে করতে পারি। অন্যদের বাদ দিয়ে বেছে-বেছে তাঁর নামই করলুম এই কারণে যে উদাহরণ হিশেবে তিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন। জীবনানন্দ দাশ আমাদের নির্জনতম স্বভাবের কবি। এই নির্জনতার বিশিষ্টতাই তাঁর প্রাক্তন রচনাকে দীপ্যমান করেছিলো। মনে মনে এখনো তিনি নির্জনের নির্ঝর, তাঁর চিত্ততন্ত্রী এখনো স্বপ্নের অনুকম্পায়ী। কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওঅরের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত ক'রে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য, এবং শোচনীয়। কিন্তু হুজগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। মনের অচেতনে তাঁর এই কথাই কাজ করছে যে আমি যদি এখনো মাকড়শার জাল, ঘাস আর শিশিরের কথা লিখি, তবে আর কি তার পাঠক জুটবে? তবু কবিতায় মাঝে-মাঝে রোম-বার্লিন দেখলে লোকে এ-কথা অন্তত ভাবতে যে লোকটা নিতান্তই ম'রে যায়নি। দ্রষ্টব্য, *বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য 'কবিতা' থেকে* (প্রথম খণ্ড/ সম্পাদকীয় ও সমালোচনা), দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত, বিকল্প, ২০১০, পৃ. ৬৩

৬১ বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ : 'বনলতা সেন', পূর্বোক্ত, ৩৬

৬২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৬৩ ৩ অক্টোবর, ১৯৩৫-এ শান্তিনিকেতন থেকে বুদ্ধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৬৪ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৬৫-৬৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৬৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৬৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৭১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৭২-৭৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৭৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৭৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৭৬ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *শুদ্ধতম কবি*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৩

৭৭ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৭৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৭৯ উদ্ধৃত, *শুদ্ধতম কবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

৮০ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৮১-৮২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৮৩-৮৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৮৫ জার্মান কবি হাইনরিখ হাইনে(১৭৯৭-১৮৬৫); যাঁর ষোলটি কবিতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদ করেছেন। দুজনের কবিমানসও সাযুজ্য বই।

৮৬ কালের পুতুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৮৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাব্যের মুক্তি', স্বগত, উদ্ধৃত, সিদ্দিকা মাহমুদা, *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯২, পৃ. ৬৯

৯০ বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি', সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা/রবীন্দ্রনাথ, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র. জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০১

৯১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

৯২ দ্রষ্টব্য, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, দে'জ সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ১৭২

৯৩ বুদ্ধদেব বুস, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

৯৪ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৯৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৯৬ কলাকৌশলে সুধীন্দ্রনাথের যা শক্তি, তা-ই তাঁর দুর্বলতাও ভেবেছেন বুদ্ধদেব বসু। এর প্রধান কারণ এই যে, তাঁর কবিতার গম্ভীর ধ্বনি-গৌরব সত্ত্বেও পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অভিভূত হওয়া যায়না। প্রতি পংক্তির অর্থগ্রহণের জন্য বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে হয়। কেননা শব্দগুলি পরিচিত হলেও ব্যঞ্জনা অপ্রচলিত। দ্রষ্টব্য, *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৯৭ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৯৮ 'অমিয় চক্রবর্তী : খসড়া', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৯৯ 'অমিয় চক্রবর্তী পালা-বদল', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

১০০ দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ২৭৬-২৭৭

১০১ 'অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

১০২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

১০৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১০৪ পূর্বোক্ত, পৃ.১০৩

১০৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

১০৬ বেগম আকতার কামাল, *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, ইত্যাদি, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১০, পৃ. ৫৪

১০৭ 'বিষ্ণু দে : চোরাবালি', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

১০৮ *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

১০৯ সংগীতধর্ম (এজ্‌রা পাউন্ডের ভাষায় Phanopeia) বিষ্ণু দে-র কবিতার একটি অন্যমত বৈশিষ্ট্য। সংগীতের টেকনিকে তাঁর অনেক কবিতাই রচিত হয়েছে। যেমন- 'জন্মাষ্টমী'।

১১০ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

১১১ বিষ্ণু দে, *এলিয়টের কবিতা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭, পৃ. ৭০

১১২ টি. এস. এলিয়ট, 'The Frontiers of Criticism', উদ্ধৃত, *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

১১৩ বিষ্ণু দে, 'এলিয়ট', সাহিত্যের ভবিষ্যত, উদ্ধৃত, দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

১১৪ বেগম আকতার কামাল, *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

১১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১১৭ 'আমার যৌবনে বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ : "এক গ্রীষ্মের সকালে আমার ঘরে এলো একটি ক্ষীণাঙ্গ ছেলে– প্রায় বালক, সবে পা দিয়েছে যৌবনে... কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রে বললো, 'আমি আপনার 'শাপভ্রষ্ট' কবিতার একটা ইংরেজি করেছি আপনি দেখবেন? পাণ্ডুলিপিতে তার নাম দেখলাম সমর সেন, ঠিকানা বেহালায় দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ি। ... তর্জমাটি প'ড়ে চমক লাগলো আমার– এত অল্প বয়স, অথচ ইংরেজি ভাষায় তার দখল অসামান্য, কবিতার দিকে মনের টান আছে বোঝা যায়। ... [বছর দুয়েকের ব্যবধান] তার মৌলিক কয়েকটি বাংলা রচনা সে দেখিয়েছিলো আমাকে; আমি, তার ছন্দের হাত টলোমলো দেখে তাকে গদ্যকবিতা লেখার পরামর্শ দিলাম। আর তারপর, 'কবিতা' পত্রিকা সূচনার সময়ে সে নিয়ে এলো তার প্রথম কবিতাগুচ্ছ– রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার সেই শেষ মধুর সৌরভ-ভরা দীর্ঘশ্বাস, আজকের দিনে অনেকেরই যা অন্তরঙ্গ। সমর সেনের সঙ্গে আমার বন্ধুতার সেখানেই শুরু।" উদ্ধৃত, বুদ্ধদেব বসু, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

১১৮ উদ্ধৃত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

১১৯ হুমায়ান আজাদ, 'কালের পুতুল-এর কালপুরুষ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১২০ বুদ্ধদেব বসু, 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১২১ বুদ্ধদেব বসু নিজেই স্বীকার করেছেন : "*বন্দীর বন্দনার* বিদ্রোহ ছিলো ব্যক্তিগত বা মানবিক।" দ্রষ্টব্য, 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা' *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

১২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬১

১২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

১২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

১২৬ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'কবিতা ভবন/দুশো দুই', 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১, উদ্ধৃত, সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, পুস্তক বিপণি, প্র.প্র. এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ. ২২৬

১২৭ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়– প্রত্যয়ী পথিক', *কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশন, কলিকাতা, প্র. সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৬, পৃ. ২৩০

১২৮ 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

১২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

১৩১ তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুতুল : কবির চোখে কবি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

১৩২ *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

১৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

১৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

১৩৫ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতার কালান্তর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

চতুর্থ অধ্যায়

সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর গদ্যশৈলী : রূপ-রূপান্তর

ক.

মননশীলতার উপযোগী ভাষা হিসেবে বাংলাকে গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় রামমোহন রায়ের রচনায় কিন্তু মাতৃভাষাকে বিকাশশীল ও সমৃদ্ধ করার জন্য কী কী শর্ত এবং কী ধরনের অনুশীলন জরুরি সেটা প্রথম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর পরে যে তিনজন সাহিত্যিক বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে নানা দিকে সম্পন্ন করে তোলেন– মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ- তাঁরা প্রত্যেকেই ইংরেজি এবং সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন এবং বাংলার বাগ্‌বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা সাহিত্যের ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত প্রতিভাবান কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিকের মাঝে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, রাজশেখর বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা গদ্যে নতুন মাত্রা আনেন এবং নব সাহিত্যরুচিতেও উৎকর্ষ ঘটান। তবে বাংলায় অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা সত্ত্বেও এমন গদ্যরীতির ঐতিহ্য তখনও গড়ে ওঠেনি যার ফলে তাত্ত্বিক অথবা বিশ্লেষণাত্মক রচনার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষত সমালোচনার ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য একটা পর্যায় পর্যন্ত সাধুরীতিতে লেখা। প্রথম চৌধুরী ও 'সবুজপত্রে'র প্রভাবে তিনি তিনি চলিত বাংলায় লিখতে শুরু করলেন তা-ও পুরোপুরি ঠিক নয়। তাঁর চিঠিপত্রের গদ্য ছিল মৌখিক, এমনকি *শান্তিনিকেতন* (১৯০৯-১৯১৬)-এর রচনাগুলিতে রয়েছে মৌখিকতার আদল। তাঁর অধিকাংশ সমালোচনার গদ্য সাধু-রীতির হলেও ভাষা আড়ষ্ট নয়। কারণ তাঁর শৈলীর সাধুভাষাও একটা পর্যায়ে অন্তরঙ্গ চলিতের কাছাকাছি এসেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্যে তৎসম শব্দের বেশি প্রয়োগ করেছেন কোথাও কোথাও। রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগের একটি বিশেষ চরিত্র তৈরি হয় তাঁর বিশেষণ ব্যবহারের মধ্যে। তাছাড়া সমালোচনার বিষয়ে রসোপভোগের পরিধি তাঁর নিজস্ব শিল্পরুচির দ্বারা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত; তাঁর প্রবন্ধের ভাষা কবি-সমালোচকের ভাষা। যা পাঠককে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ও তাঁর রসবোধকে গভীর করতে সাহায্য করে।

বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তাতে প্রায় সর্বত্রই গদ্যলেখক হিসেবে তাঁর অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও ভাষার নিপুণতা লক্ষণীয়। গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনী-আত্মজীবনীমূলক রচনা ইত্যাদিতে তাঁর গদ্যের বৈচিত্র্য রয়েছে। সেইসাথে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং সংবেদনশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা এবং যুক্তিবিন্যাসের দৃঢ়তা, ভাষার গতিশীলতা এবং লাবণ্য গদ্যকার বুদ্ধদেবকে প্রাতিস্বিক অবস্থানে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে, বাংলা ভাষাকে স্বাধীন, স্বনির্ভর করে না তুলতে পারলে এর কোনো মুক্তি নেই। ভাষার স্বাভাবিকতা বিষয়ক বোধ তিনি ঐতিহ্যচেতনার মতোই অর্জন করেছিলেন। যদিও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মত ভাষা বিষয়ক কোনো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন নি, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের তথা রচনার ভাষা ও ভঙ্গি নিয়ে তিনি বেশ ভাবিত ছিলেন। সৃষ্টিশীল লেখকদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্বাগত অনুভব প্রকাশিত হয়েছে 'লেখার ইশকুল' (১৯৩৮) প্রবন্ধে। এছাড়া শিল্প কেবল তার উপস্থিতির গুণেই মূল্যবান, এ বিশ্বাস থেকেই ভাষা বিষয়ে তাঁর মুল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। আশ্বিন, ১৩৫৫-এর কবিতা-সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব লেখেন[১]:

> চিন্তার সঙ্গের মস্তার এই লুকোচুরির বিবিধ প্রকটন আমাদের গদ্যালোচনায় লক্ষণীয়: যথা উপমাবাহুল্য, বৃত্তকথন, অতিসারল্য, অতিঘনতা এবং মধ্যপদলোপী পদ্ধতি। কিন্তু আদি দারিদ্র্যের ক্ষতিপূরণ কোনো কৌশলেই ঘটে না; ভাষার শতছিদ্রে বেরিয়ে যায় কিছু না কিছু অর্থ; এবং আতিশয্য বা অবৈশদ্য, অস্পষ্ট বা দুরূহতা থেকে সাধারণত নিস্তার পান না সাহিত্যিক অধিকর্তারাও। তাই, ভাষা চাই।

আদর্শ গদ্য বলতে কী বোঝেন তা বুদ্ধদেব বসু বিশদ-ভাবে আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' (১৯৬১) নামক রচনায়– তাঁর নিজের গদ্যপ্রসঙ্গেও প্রবন্ধটি মূল্যবান, "কেননা রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কে যা তাঁর বক্তব্য, নিজের সৃষ্টিকর্মে সেটাই তাঁর সাধনা। বুদ্ধদেবও চান মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হোক, কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত হবে, 'শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, মাত্রা ও ধ্বনিজ্ঞান'। ভাষাকে অস্বাভাবিক করে অসাধারণ হওয়া যায়না– এই ছিল তাঁর অভিমত।"[২] বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকের রচনা সাধুভাষায় (উপন্যাস *সাড়া* গল্পগ্রন্থ *রেখাচিত্র* ও অন্যান্য রচনা) লেখা। পরবর্তীতে ছন্দোমুক্তির অন্বেষণে তিনি বুঝেছিলেন যে চলিত ভাষাই স্বাভাবিক এবং এর কোনো বিকল্প নেই। চলিত ভাষার আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সার্থক করেছেন আধুনিক কবিরা। আসলে গদ্য-পদ্যের বিরোধ ভঞ্জনের প্রচেষ্টায় তাঁরা মৌলিক বাক্‌স্পন্দনকে খুঁজে পেলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই দিক-নির্দেশক, কিন্তু তাকে ব্যাপক রূপ দিলেন কবিরা এবং এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অগ্রণী।[৩] কবি ও গদ্যকার রূপে তিনি যে কতখানি

সচেতন ও মনস্ক শিল্পী ছিলেন, তা তাঁর সান্নিধ্যে থাকা অনেকেই জানিয়েছেন। বিশেষত উল্লেখ্য অধ্যাপক অমিয় দেবের উক্তি[৪]:

> ... আমি তাঁকে দেখতে চাই, দেখাতে চাই বাংলা ভাষার একজন শ্রমিক হিসেবে, পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে,– লক্ষ লক্ষ শব্দের রচয়িতা, অক্ষয়-সাধক হিসেবে।

মূলত সুললিত গদ্যশৈলীই বুদ্ধদেবের একাধিক প্রবন্ধের চালিকা শক্তি। বিভিন্ন সাহিত্য মাধ্যমে তাঁর বিপুল ও সার্থক সৃষ্টিসম্ভারকে স্মরণে রেখেও বলা যায়, প্রবন্ধসাহিত্যেই তাঁর গদ্যশৈলী উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক হলেও কবি ও কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

বুদ্ধদেবের গদ্যের অন্যতম গুণ সম্পর্কে প্রায় সকল সমালোচকেরই এই মত যে, তাঁর গদ্য 'রোমান্টিক কবিস্বভাবী'[৫], 'কবিতার ভিতরে থেকেই নিষ্ক্রান্ত, তা ভাবুকের গদ্য'[৬], 'তাঁর কবিতার ভাষার সঙ্গে প্রবন্ধের ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই'[৭] কিংবা তাঁর গদ্যের মধ্যে যে 'একটা মোহন আকর্ষণ আছে, তার উৎস তাঁর কবিত্ব। গদ্যেও তিনি কবি'[৮]। রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর ভাষার এই কাব্যধর্মিতা বাংলা গদ্যের এক নতুন আঙ্গিক চিহ্নিত করেছে। বুদ্ধদেবের সমালোচনার যে ভঙ্গি, যাকে বলা হয়েছে, 'মন্ময় সমালোচনা'[৯] তা একই সাথে বুদ্ধি ও বোধগ্রাহ্য হলেও সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান কবি হিসেবে তাঁর সমালোচনামূলক গদ্যের বিশিষ্ট মূল্য এর কাব্যধর্মিতায়। এছাড়া রচনায় 'প্রবল এক আমি'র প্রভাবের কারণে তাঁর সব প্রবন্ধকেই 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'[১০] আখ্যা দেয়া হয়েছে। সাহিত্য পাঠজনিত আনন্দের উপলব্ধি ও এর প্রকাশ তাঁর রচনায় স্পষ্ট, আর সে আনন্দকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির; বিশেষত তাঁর বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালীর। সাহিত্যধারার যেকোনো শাখার আলোচনাতেই তিনি যে কবি, একথা বিস্মৃত হওয়া যায়না; জীবনবোধের কবিত্ব-আদর্শকে তিনি তাঁর প্রবন্ধ-শিল্পের সঙ্গেও প্রযুক্ত করেছেন। একজন কবি হিসেবেই যে তিনি অপর কবিকে পাঠ করেছেন, তা তাঁর সমালোচনায় বারবার প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে তাঁর এসব গদ্যে উপমা-চিত্রকল্পের প্রাধান্যও বেশি।

যেমন :

(ক) রবীন্দ্রনাথকে ভাবলে... বরং মনে পড়ে এক স্রোতস্বিনী, সঞ্চারিণী, পরিবর্তনশীল, ক্রমান্বিত– যার জলে গা ডোবালে প্রথমে বড়ো মৃদু ও শীতল মনে হয়, কিন্তু যা গোপনে এত গভীর ও জোরালো যে অসতর্ক আগন্তুককে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিতে পারে।[১১]

(খ) আঠারো মাত্রার কোমর ভেঙে দিয়ে তিনি [সুধীন্দ্রনাথ দত্ত] তাকে সাপিনীর মতো যদৃচ্ছ যতিপাতে এঁকেবেঁকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন।[১২]

(গ) সুধীন্দ্রনাথের তনু-তন্ময়তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর আভিজাতিক সুমিতি, তাঁর ইন্দ্রলোক দুর্লভ মননশীলতায় গম্ভীর। ... 'অর্কেস্ট্রা' প্রেমের কবিতা, অথচ এতে পূর্বরাগ নেই, অভিসার নেই, অভিমান নেই, নেই সুখ, নেই সুখের চেয়েও সুমধুর বিষাদ, নেই লাস্য, নেই নৃত্য। এলিজাবিথান গীতবিতানের মতো কিছুমাত্র নয়, কিছুমাত্র নয় 'ক্ষণিকা' কিংবা 'মহুয়া'র মতো। ... কবিতাগুলি আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধ, নিষ্ঠুর-বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় মিলন-স্মৃতির দারুণতর মত্ততায় কবি কখনো চীৎকার ক'রে উঠছেন, কখনো তিনি হতাশায় মগ্ন, কখনো বা সেই স্মৃতিকঙ্কালকেই জীবনের পরম উপার্জনজ্ঞানে অঙ্কশায়ী ক'রে আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত, আবার কখনো এ-কথা ভেবে মোহ্যমান যে মহাদস্যু কাল জীবনের এই একমাত্র স্মৃতিরত্নকেও একদিন লুণ্ঠন ক'রে নেবে, নিবিয়ে দেবে সেই দুঃখের অগ্নিশিখা, যেটা তাঁর উপজীবিকা, তাঁর জীবন।[১৩]

(ঘ) এ-চোখ দেখতে ভয় পায় না, দেখতে পেয়েও আকুল হয় না, এতে কাছে ডাকা নেই, দূরে রাখাও না– ... আকাশের উঁচু পাড় থেকে যে-বাজ আমোঘ হ'য়ে নেমে আসে তাকেও এ নমস্কার জানায়, আবার পায়রার রক্তমাখা ছেঁড়া পালকটিকে করুণা দিয়ে ধুয়ে দেয়।[১৪]

উদাহরণগুলোতে বুদ্ধদেবের অবিচ্ছেদ্য কবিসত্তার প্রবল উপস্থিতি সহজেই লক্ষণীয়। তাঁর এ ধরনের গদ্যের বা সমালোচনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল– এরকম আকর্ষক গদ্যশৈলীর গুণেই কখনও কখনও মূল সাহিত্যগ্রন্থ আস্বাদনে পাঠকের আগ্রহও তৈরি হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ তা যেন নিজের উপভোগে অন্যকে সামিল করে নেওয়া। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের আর একটি সার্থক গুণ স্পন্দনময়তা। প্রথম দিকে তিনি পদ্যছন্দে কবিতা রচনা করলেও ১৯৩৩-৩৪ সালে লেখা *নতুন পাতা* কাব্যগ্রন্থে গদ্যছন্দের প্রয়োগ দেখা গেল। আর 'গদ্যকাব্য লেখার শুরু থেকে একই সঙ্গে এলো ছন্দ আর কবিভাষার বিপরীত প্রান্তকে স্পর্শ করার সচেতন প্রয়াস।'[১৫] তাঁর এ প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ভাষা অন্বেষণেরই পথ, ফলে গদ্যকে তিনি তুলে নিয়ে এলেন 'স্পন্দনমহিমায়।'[১৬] *দময়ন্তী* (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের শেষে 'বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দে'র মিলন বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য :

> গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি। দেখা গেছে এ দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়।

কবিতার প্রতি বুদ্ধদেবের প্রয়াস তাঁর গদ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ গদ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর লক্ষ্য ছিলো এই-ই।[১৭] 'ছন্দস্পন্দিত গদ্য' যা 'আধুনিক বাঙলা গদ্যের প্রবর্তক ও বিবর্তক' তা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া একথা বুদ্ধদেব বসু বারবার স্বীকার করেছেন।[১৮] "তাঁর নিজেরও লক্ষ্য ছিল এই স্পন্দনময় গদ্য। প্রথম যুগে তিনি চেয়েছিলেন শুধু আধুনিক গদ্য লিখতে (তখনো তাঁর আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ যুক্ত হয়নি), তারপর 'ছন্দস্পন্দিত গদ্য' এবং সবশেষে লক্ষ্য হল স্পন্দনময়তার সঙ্গে সংহতি। মধ্য পর্বে তিনি ছিলেন শব্দের সম্মোহে আবিষ্ট– শব্দনির্বাচনে পাই অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান, বর্ণনায় পরিপাট্য। কিন্তু তখনও সংহতি নয়, সৌন্দর্যই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।"[১৯]বুদ্ধদেব বসুর *হঠাৎ আলোর ঝলকানি* গ্রন্থের আলোচনায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর গদ্য সম্পর্কে লেখেন :

> বন্যা, তুফান অগ্ন্যুৎপাতাদির সঙ্গে কোনোরূপ সাদৃশ্য না-থাকলেও ভাষার অন্তরে সে প্রাণ ও স্পষ্ট গতি থাকতে পারে তার প্রমাণ বুদ্ধদেবের কোনো-কোনো প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ... এর ভিতর বন্যা নেই, স্রোত আছে, কিন্তু সে-স্রোত মনকে টেনে নিয়ে যায়। ... বুদ্ধদেবের ভাষার স্পষ্টগুণ তার গতি ও প্রাণ।[২০]

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের এই চরিত্র-লক্ষণ বা গতিকে সমালোচক বলেছেন 'সতত ও স্পতঃপ্রবাহিত। যদিও এ স্বতঃস্ফূর্ততার পেছনে রয়েছে অনুশীলন ও অভিনিবেশ'।[২১] অনেকে এই প্রবহমানতা তথা স্বাচ্ছন্দ্যকে তাঁর গদ্যের মূল লক্ষণও মনে করেন।[২২] রবীন্দ্রনাথের রচনাকর্মের সমালোচনা থেকে এ ধরনের গদ্যের একটি উদাহরণ :

> যেমন সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে, তেমনি শুধু কবি হিসেবেও তাঁর বহুমুখিতা বিস্ময়কর; যেমন চিত্ররচনায় পিকাসো, তেমনি কাব্যরচনায় বিশ্বম্ভর আমাদের রবীন্দ্রনাথ। পিকাসোর মতো, তাঁর আছে ভিন্ন-ভিন্ন রীতি, পর্যায় ও মনোভঙ্গি, উপাদানের বিরাট ভাণ্ডার, এমন সচ্ছল অপ্রতিহত দক্ষতা, যাতে খেয়ালখুশিও রূপান্তরিত হয় শিল্পকর্মে।[২৩]

কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) শিশুসাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনায় রচিত সাবলীল গদ্য :

> রবীন্দ্রনাথের নানা দিকের শুধু একটি ছিলো শৈশব-সাধনা, আর অবনীন্দ্রনাথে এটি প্রায় সর্বস্ব, অন্তত– তাঁর সাহিত্যে-সর্বপ্রধান। তাঁর ভিতরকার বালকটিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুললেন না, আর অবনীন্দ্র তাকে হারিয়ে ফেলতে অস্বীকার করলেন। রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য, হাওয়ার মতো হালকা, তিনি তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন পূর্ণপরিণত জীবনের ওজন; আর অবনীন্দ্রনাথ; শৈশবের পরশমনি ছুঁইয়ে, জীবন নামক ব্যাপারটাকেই নির্ভার

> ক'রে তুলেছেন। বয়স্ক জীবনের বড়ো-বড়ো অভিজ্ঞতাকে স্থান দিয়েছেন তিনি– ঘৃণা, হিংসা, প্রেম– কিন্তু সেগুলোকে এমন ক'রে বদলে নিয়েছেন, এমন কোমল স্বপ্নের রঙে গালিয়ে নিয়েছেন যে তাদের আর চেনাই যায় না অথচ ঠিক চেনাও যায়।[২৪]

প্রথমোক্ত উদাহরণে স্পন্দনময়তা সত্ত্বেও গদ্যের সংহতি লক্ষনীয়। তাছাড়া সমালোচনায় বুদ্ধদেব কেবল বিষয় নয়, বিষয় ও বিষয়ীকে একত্র করে লেখেন এবং রচয়িতার সংবাদের সঙ্গে নিজেকেও, নিজের সংবেদনকেও বাহিত করতে চান একত্রীভূত করে। পাঠক-সমালোচকের এই গভীর সংবিত্তি তাই ফুটে ওঠে তাঁর গদ্যে। "তাঁর যে-কোনো গদ্যরচনার প্রস্তাবনা থেকে উপসংহার পর্যন্ত প্রখর চৈতন্যের জাগর উপস্থিতি কাজ করেছে। ... বুদ্ধদেবের গদ্যের এই প্রাঞ্জলতা বা প্রসাদগুণ, প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রতারক। 'সুহৃদ সম্মিত'/ 'কান্তাসম্মিত গদ্যের প্রপঞ্চনিপুণ আয়োজন ঘটিয়ে তিনি প্রথম মুহূর্তেই পাঠককে জিতে নেন, অতঃপর স্বীয় সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে তাকে দীক্ষিত করেন।[২৫]

খ.

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যে ইংরেজি রীতির প্রভাব বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। লেখকজীবনের শুরুতে গদ্যে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার থাকলেও বুদ্ধদেব বসু পরের দিকে ইংরেজি রীতির আত্যন্তকিতা কাটিয়ে উঠেছিলেন। তবুও বাক্যের অন্বয়ে ইংরেজি বাচনিক পদ্ধতির ব্যবহার রয়েই গিয়েছিল। সমকালে তাঁর রচনারীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁকে লিখেছিলেন। *যেদিন ফুটলো কমল* (১৯৩২) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি :

> পড়তে পড়তে খটকা লেগেছে পদে পদে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি। মনে মনে ভাবছিলেম, এখনকার যুবকযুবতীরা সত্যিই কি এমনতরো তর্জমা করা ভাষাতেই কথাবার্তা কয়ে থাকে? অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় তো আমি এতটা লক্ষ্য করিনি।[২৬]

তাঁর গদ্যে সুকুমার সেন লক্ষ করেছেন, 'বুদ্ধদেব বাবুর গদ্যরীতি সযত্নরচিত, সুমিত, পরিপাটি। তবে গোড়ার দিকে ইঁহার গদ্য অনাবশ্যকভাবে ইংরেজির অনুবাদে ও অনুসরণে কন্টকিত ছিল।'[২৭] তাছাড়া অধ্যাপক বীতশোক ভট্টাচার্য (কবি ও প্রাবন্ধিক, জ. ১৯৫১) ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা একটি চিঠিতে প্রশ্ন করেন যে, তাঁর বাংলা গদ্য ইংরেজি গদ্যের অনুসারী কেন। উত্তরে বুদ্ধদেব লেখেন :

> ইংরেজি না-জানলে আজকালকার বাংলা বোঝা যায় না এ-কথা ঠিক নয়। রাজশেখর বসু মানিক বন্দোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেক আধুনিক লেখক ইংরেজি না জানা পাঠকের পক্ষে অনায়াসে অধিগম্য। পূর্ব-রবীন্দ্রের রচনাও তা-ই। অন্য কেউ কেউ; যেমন উত্তর-রবীন্দ্র সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, অন্নদাশঙ্কর, আমি– এঁদের রচনা বিষয়ে তোমার আপত্তি প্রযোজ্য হ'তে পারে, কিন্তু আমি অন্তত একজন পাঠকের কথা জানি (মেদিনীপুরের দরিদ্র চাষী সে) সে একবর্ণ ইংরেজি জানেনা অথচ আমার লেখার প্রতি যার অনুরাগ গভীর। ... আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা কিছুটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন তাতে সন্দেহ নেই– আমি ওটাকে ইংরেজি বলি না, বলি পাশ্চাত্য, য়োরোপীয় অন্যান্য ভাষার বহু পুস্তক আমরা অনবরত ইংরেজি অনুবাদে পড়ছি– এমন কোনো লেখক অথবা পাঠকের কথা আজকের দিনে ভাবা শক্ত যিনি একেবারেই পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত। আমরা যেটাকে সমাদর করছি সেটা ঠিক ইংরেজি ভাষা নয়, ইংরেজি ভাষার সেতুবন্ধনে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ।[২৮]

একথা ঠিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই বাংলা ভাষাকে আধুনিক চিন্তার উপযোগী করার প্রয়োজনে ইংরেজী গদ্যরীতি থেকে নানা বৈশিষ্ট্য বাংলায় আমদানি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুরও এ ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে :

> [রবীন্দ্রনাথ] দ্রুতি, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের সাধনায় স্বীকার ক'রে নেন, ইংরেজি ধরনের অন্বয়– যা তাঁর আগে বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগরও করেছেন, কিন্তু পার্শ্বোক্তি, সর্বনাম ও ব্যুৎক্রমের ব্যবহারজনিত যার পূর্ণরূপটি রবীন্দ্রনাথের আগে প্রতিভাত হয়নি, যদিও সমালোচকেরা তাঁকে ভুলে গিয়ে কখনো-কখনো এমনও বলেছেন যে কতিপয় অযোগ্য আধুনিক লেখকই বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতির প্রবর্তক। কিন্তু ইংরেজি তো আর নেই, সেটাই বিশুদ্ধ বাংলা হ'য়ে গেছে কিংবা ধরনটাকে ইংরেজি বলাই ভুল ...[২৯]।

চলিত বাংলা বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের সাথে বিরোধ নেই– এই ধরনের নতুন বাংলাকে "আয়ত্তে আনতে বুদ্ধদেবের সময় লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি শুধু আয়ত্তে আনেন নি, তার সম্প্রসারণ এবং ঋদ্ধি ঘটিয়েছিলেন।"[৩০] তবে বুদ্ধদেবের গদ্যের বিবর্তন লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রথম পর্বের ভাষায় তারল্য ও ইংরেজিয়ানা কাটিয়ে গদ্য ধীরে ধীরে সংহত ও অনন্য হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে তাঁর লেখার শিথিলতা, ইংরেজি শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে :

> জীবনানন্দবাবুর ... বহু কবিতায় ... পরম বিস্ময়কর কথাচিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subduded
>
> ... এতে melody না থাক music আছে– একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering।[৩১]

'প্রগতি'র পাতায় (১৩৩৬) জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত এই আলোচনায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার নিয়ে অবশ্য পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবেরও অস্বস্তি প্রকাশিত হয়েছে। তবে ইংরেজি বাক্যান্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও তিনি কালক্রমে এমন গদ্যরীতি গড়ে তুলেছিলেন, যা স্বতন্ত্র আকর্ষণীয় ও তাঁর ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* (১৯৬১) গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব রচিত গদ্যের একটি উদাহরণ :

> কাব্যকলায় বোদলেয়ারের মহৎ কীর্তি এই যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত করে দেন। প্রথম কবি তিনি, যাঁকে প'ড়ে আমরা উপলব্ধি করি যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ধারণা দুটি আমোঘভাবে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত, এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতার তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়। ছন্দোবন্ধের দার্ঢ্য, মিলের বিস্ময় ও পর্যাপ্তি, নিয়মনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অমর আসক্তি তাঁর– এই সবই নির্ভুলভাবে ক্লাসিক লক্ষণ, কিন্তু এই কঠিন রূপকল্পের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন রোমান্টিকতার আত্মা– এক দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চৈতন্য।[৩২]

বাক্যান্বয়ে ইংরেজি রীতির সমর্থক হয়েও শব্দ প্রয়োগে সংস্কৃত উৎসকে স্বীকার করেন বুদ্ধদেব বসু। কেবল 'মেঘদূতে'র অনুবাদে কিংবা 'মহাভারতের কথা'য় নয়, সাধারণভাবেই তাঁর শেষ পর্যায়ের গদ্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার বেড়েছিল। সেসব শব্দ অবশ্য প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং তাঁর গদ্যরীতির শক্তিশালী উৎসমুখ হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যে যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার-প্রাচুর্য রয়েছে। "১৯৬৬-র পর তাঁর বাক্যবিন্যাসে ঢুকে যায় স্তরবহুল অথচ এককপদান্ত্য মহিমায় উজ্জ্বল একাধিক বাক্যালংকারের ঘনীভবন এবং ভিতরের গঠন উপরিতলে চলে আসে। ভাষার বাহির-ভিতরের এই ওতপ্রোত আত্মীয়তার তাগিদে যতিছেদচিহ্নের সংক্রাম যায় বেড়ে, যেমন এই দৃষ্টান্তে"[৩৩] :

> শুধুমাত্র সৌন্দর্যের সূত্র যথেষ্ট নয় অথচ কখনো ত্যাজ্যও নয় এই ধরনের একটা অনুভূতি থেকে যোগ করলেন সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযম: সৌন্দর্য ভালো, কেননা তা 'সংযমের দিকে আকর্ষণ করে' আমাদের; সৌন্দর্য ভালো, কেননা তা 'সত্যকে জানার উপায়', গোতিয়ের সৃষ্ট সৌন্দর্য ভালো নয়, কেননা তা 'মরীচিকা-ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, সেইজন্যই সত্য নয়', অথবা 'সত্য নয় তা নয়, অল্প সত্য'– আর অবশেষে, লোকেন পালিতের অসিচালনা ঠেকাতে গিয়ে (আমাদের পক্ষে দুঃখের বিষয় যা অদৃশ্য)– রবীন্দ্রনাথকে এমন কথাও কবুল করতে হ'লো যে সৌন্দর্য– যাকে তিনি প্রথম যৌবনে বলেছিলেন 'স্বর্গমর্ত্যের বিবাহবন্ধন'– তার প্রকাশ সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র; 'জ্ঞান কবিতার বিষয় নয়', নিজের এই প্রাক্তন উক্তির প্রতিবাদ ক'রে তাঁকে ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে বলতে হ'লো যে কলালক্ষ্মীরাও সত্যের অভিসারিকা।[৩৪]

ছেদচিহ্নের প্রয়োগ বুদ্ধদেবের গদ্যকে সমকালীন গদ্যচর্চা থেকে পৃথক করেছে। 'একদিকে নিজস্ব লজিকের প্রকাশ, অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিক মনোবিশ্লেষণ এক আপাতবিরোধী অবজেক্টিভ আবহাওয়া তৈরি করেছে। বাক্যের পদ-বিন্যাস কিংবা বিভিন্ন পদের ব্যবহারে বুদ্ধদেব বসুর স্বতন্ত্র শ্রমশীল প্রায়োগিক ভাবনা ছিল। এ তাঁর ভাষাচারিত্র্যের একটি স্বধর্ম– 'বিশেষ্যকে স্থান করার আগে তাঁর অপ্রতিরোধ্য ও অসংবরণীয় বিশেষণপ্রীতি।[৩৬] বিশেষণকে তিনি শুধুমাত্র গুণবাচক বিশেষণ হিসেবে স্থাপন করতে চাননি, প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন 'এক-একটা স্বনির্ভর চরিত্র হিসেবে, স্ববশ ব্যক্তিত্ব হিসেবে, যাদের প্রকাশক্ষমতা অপরিসীম, অদ্বিতীয় দূরপ্রসারী।'[৩৭] বাগ্‌ভঙ্গিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের কিংবা ব্যাকরণিক এক একটা উপাদান কতখানি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তা তিনি জানতেন; যেহেতু বাংলাই কেবল নয়, ইংরেজি 'রেটোরিক' এও তিনি ছিলেন যথেষ্ট দক্ষ। সব মিলিয়ে একসময়ে তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে এই বিশেষণপ্রিয়তা। তাঁর গদ্যের ভেতরে বিশেষণের ব্যবহারকে বলা যায়, তা কবিতারই গুণসমৃদ্ধ। কখনও কখনও একটি বিষয়কে সুপ্রকাশিত একাধিক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন: অনুদিত 'মেঘদূত' কাব্যের ভূমিকায় সংস্কৃত কবিতার গতি-প্রকৃতি তুলে ধরতে তিনি লেখেন :

> এক ঋদ্ধ, বিধিবদ্ধ জগৎ; পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল, প্রচল-নির্ভর, ভঙ্গিপ্রধান ও বর্ণনাপ্রধান, সাবধানী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন; সদ্ব্যয়ী, সতর্ক, সৌষম্যযুক্ত; আচারনিষ্ঠ ও প্রতিমাপূজক; অমত্ত ও শিষ্ঠাভাষী, সামাজিক ও আমাদের পক্ষে সুদূর; বিস্তারধর্মী, অলঙ্কার মণ্ডিত, শোভমান; কল্লোলিত, প্রোজ্জ্বল ও নিস্তাপ– এমনই আমাদের মনে হতে পারে সংস্কৃত কবিতাকে, তার মধ্যে প্রথম যখন প্রবেশের চেষ্টা করি।[৩৮]

মোট চব্বিশটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে একটি বাক্যে। প্রগল্‌ভতা এখানে কিছুটা ক্লান্তিকর হলেও সর্বত্র হয়নি, কেননা এই প্রয়োগ বিষয়চ্যুত নয়; নিয়ন্ত্রিত ও সুমার্জিত। বিষয়টিকে অধিক স্পষ্ট করার জন্য সমালোচক যেমন করে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, একই কারণে 'থিসিস ও অ্যান্টিথিসিস রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রথমে একটি মত প্রকাশ করে (থিসিস) পরক্ষণেই তা খণ্ডন করে (অ্যান্টিথিসিস) পাঠককে তিনি পৌছে দেন সেই বিষয়ের স্বয়ংস্থিত সত্যের নিকট ।[৩৯] যেমন :

> তিনি কবিতা লেখেন আত্মপ্রকাশের তাগিদে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হিসেবে ... তিনি যতটা কবি তার চেয়ে কারিগর ঢের বেশি।[৪০]

বাক্যকে মনোহর করতেই বিশেষণের ব্যবহার ও বৈপরীত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে নেতিকরণ দ্বারা বুদ্ধদেব পৌঁছাতে চান সার্থকতায়। এছাড়া তাঁর গদ্যে বিশেষণের নব প্রয়োগও দেখা যায় :

সাহিত্যচর্চা [৪১] থেকে : জাদুকরী গদ্য, দিনানুদৈনিক রাজনীতি, বিজ্ঞাপন-বিশ্বাসী জনগণ, রেডিওমুখর যুগ, মন–খারাপ-করা ক্ষীণতা, বিশুদ্ধ ন্যাকামি, আত্মহারা তীব্রতা, অনম্য মতবাদ

কালের পুতুল[৪২] থেকে : অবক্ষয়চেতন কবি, নির্জনতম কবি, শিশির-কোমল ছন্দ, মানবিক ব্যাকুলতা, অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তি, হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্য, প্রতিভাবান বালক, চিন্তা-ছায়াচ্ছন্ন কবিতা, সিনেমা-চঞ্চল চিত্রাবলি, আস্বচ্ছ আচ্ছাদন।

বিবিধ : প্রতারক সরলতা, অন্তঃসত্তা ভাষা, পুস্তক-পীড়িত পণ্ডিত, সপ্রেম মনোযোগ, শোণিতগন্ধী উৎসব, অবমানবিক উন্মাদনা, আপতিক স্বতঃস্ফূর্তি, মন্থর সতর্কতা, যত্নসাধিত মৃদুতা।

বাংলা ক্রিয়াপদের স্বল্পতা বিষয়ে বুদ্ধদেব সচেতন ছিলেন। অত্যধিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বাক্যের গতিময়তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়– এ বিশ্বাস থেকে বাক্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্রিয়াপদ বর্জনের পক্ষপাতী তিনি। তা তিনি করেছেনও, যেমন :

> তাঁর (সুধীন্দ্রনাথের) প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চীৎকার– যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাবো না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথে, না তাঁর সমকালীন কোনো কবিতে।[৪৩]

উদ্ধৃত বাক্যটিতে 'খুঁজে পাবো'– এই একটি ক্রিয়াই ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্য অবশ্য এখানে দুটি– 'যার' সংযোজক দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং 'না' যুক্ত হয়ে দীর্ঘতর জটিল বাক্যের পরিণতি লাভ করেছে। সুতরাং দেখা গেল, জটিল বাক্যেও সমালোচকের একের বেশি ক্রিয়া ব্যবহারে অনীহা রয়েছে, কারণ তাঁর লক্ষ্য– বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতিময়তা। আর সাহজিকতা ও স্বাভাবিকতাভূষিত তাঁর গদ্যের বিশিষ্ট গুণ হল স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা এবং বাক্যবন্ধের ঋজুতা। যত দীর্ঘ বাক্যই তিনি রচনা করেন না কেন, তার অন্বিষ্ট অর্থ প্রখর ও পরিস্ফূট থেকেছে; বিষয়ের সংবদ্ধতাও শিথিল হয়নি। উপবাক্য বা অনুবাক্যসমৃদ্ধ এরকম একটি উদাহরণ:

> এই জন্য তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণমুখর; তার 'সারাংশ' বিচ্ছিন্ন করা যায় না , তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে-ভাঁজে খুলে; যেটা কবিতা, আর যেটা পাঠকের মনে তার অভিজ্ঞতা, ও-দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার ক'রে যায়, কিন্তু কেমন ক'রে তা করে আমরা ভেবে পাই না, সমালোচনার কলকব্জা দিয়েও ধরতে পারি না সেই রহস্যটুকু; – শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হতে পেরেছে, তা-ই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে তার অস্তিত্বেরই জন্য– আর কোনোই কারণ নেই তার।[৪৪]

ভাবপ্রকাশের দিক থেকে ও দৈর্ঘ্যের সমর্থনে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ হবার যোগ্য এই বাক্যটি– যাতে বিরাশিটি শব্দ এবং বারটি উপবাক্য রয়েছে। প্রতি সেমিকোলনেই এক-একটি স্বতন্ত্র বাক্য থাকলেও ভাবের অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রয়েছে। আবার অসমাপিকা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিক ব্যবহার না করে ইংরেজির অনুকরণে জটিল বাক্য গঠন করেছেন বুদ্ধদেব। 'যেটা', 'তা' ইত্যাদি সংযোজক যুক্ত করে এবং তার সঙ্গে মাত্র একটি অব্যয় 'কিন্তু' ব্যবহার করে দীর্ঘতর বাক্যকেও রমনীয় করে তুলেছেন তিনি।

নতুন শব্দ গঠনে বুদ্ধদেবের মনোযোগ ও শ্রম তাঁর শব্দচেতনার পরিচয় বহন করছে। শব্দের নতুন অর্থও দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। কখনও তদ্ধিত 'তা' প্রত্যয় বিশেষ্য-বিশেষণ পদের সঙ্গে ভাবার্থে যোগ করেছেন বুদ্ধদেব। যেমন– কারুকর্মিতা, শিল্পিতা, ব্যক্তিতা, নৈশ্যতা, অনুগামিতা, বাস্তবসদৃশতা, বৈদেহীকতা, আবিষ্কারধর্মিতা, নৈষ্ঠিকতা, নিশ্ছবিতা, মনীষিতা, প্রতীকিতা ইত্যাদি।[৪৫] নতুন শব্দনির্মাণের পেছনে সাদৃশ্যবোধ (অ্যানালজি) খাটিয়ে গদ্যকার শব্দে নতুন ব্যঞ্জনা এনেছেন। সাদৃশ্যমূল এবং সদৃশ শব্দগুলো এভাবেই তাঁর গদ্যে জায়গা করে নিয়েছে : অনতিবিত্ত (মধ্যবিত্ত), শতকান্তিক (ঐকান্তিক), চিত্রবণিক (স্বর্ণবণিক), আত্মভেদী (অভ্রভেদী) অপত্যপাঠ্য (শিশুপাঠ্য) দুষ্ক্রিয়তা (নিষ্ক্রিয়তা), আনুভাব্য (সম্ভাব্য), পিষ্টকগ্রাসী (সর্বগ্রাসী) ইত্যাদি। রয়েছে বিদেশি শব্দের বঙ্গীকরণ[৪৭] :

রোমাঞ্চিকা	=	অ্যাডভেঞ্চার
প্রাচীতত্ত্বজ্ঞ	=	ওরিয়েন্টালিস্ট
পার্শ্বোক্তি	=	অ্যাসাইড
স্মৃতিস্পন্দিত	=	নস্টালজিক
শোভনশিল্প	=	ডেকরেটিভ আর্ট
সবীজ	=	ফ্রুটফুল
হ্রস্ব চিত্রাবলি	=	শর্ট ফিল্মস

বুদ্ধদেব বসুর বানান-রীতি সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। লেখকজীবনের শুরুতে কোনো শব্দের বানান যেমন করে লিখেছেন, পরের দিকে তা অনেকটা বদলেছে। তবে একই সময়সীমার মধ্যে তাঁর লেখা বানানে অসংগতি প্রায় নেই। কিন্তু তিনি যা লিখতেন, তা ভাবনা চিন্তা করেই লিখতেন; এই কারণেই বুদ্ধদেব বসুর বানান রীতি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধদেবের লেখায় ও বানানে ঊর্ধ্বকমা, ড্যাশ, কোলন ও তালব্য শ–এর আধিক্য ছিল। এছাড়া শুরুতে তিনি ইংরেজি শব্দের মূল উচ্চারণ বানানে বজায় রাখার চেষ্ট করতেন। যেমন: লেইডিফ্রেন্ড, প্রফেসার, স্টেইট, স্যুটকেইস ইত্যাদি। উচ্চারণের কারণে শ, স, ষ লেখার প্রবণতা বাংলায় ছিল। বুদ্ধদেবীয় বানানেও তা আছে, যেমন: শাদা, জিনিশ, শবজি, হিশেব ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর চলিত ক্রিয়াপদের কিছু বানানভঙ্গি অনেক লেখককেই প্রভাবিত করেছিল।[৪৮] এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বকমা এবং ক্রিয়াপদের শেষের ও-কার । যেমন : দিয়েছিলো, উঠলো, হতো ইত্যাদি। আবার যেসব শব্দে স্বরসঙ্গতি, অভিস্রুতি বা অন্য কারণে বর্ণলোপ বা অন্য কারণে বর্ণলোপ বা পরিবর্তন হয়েছে সেখানে তিনি ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করতেন। যেমন: ক'রে, ব'লে হ'ল, হ'তে ইত্যাদি। "বানান ব্যাপারটি শুধু চোখের নয় কানেরও : ভাষার স্পন্দনময়তা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য হলো বানানের দৃশ্য এবং শ্রুতির রূপের ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। তাঁর অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান থেকে তিনি একদিকে যেমন ঝুঁকেছিলেন ধ্বনি-সংবেদী বানানের দিকে, তেমনি অন্যদিকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভাষার জাদু–শব্দের অভিনবত্বে নয়, শব্দের ব্যবহারে। বাঙলা শব্দ ভাণ্ডারের দুর্বলতা নিয়ে তিনি অনেক আক্ষেপ করে গেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিলো প্রচলিত শব্দের ব্যবহারে কিংবা পুরনো শব্দের পুনরুজ্জীবনে।[৪৯]

বুদ্ধদেব বসুর গদ্য সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, সহজতাই তাঁর শৈলীর অভিজ্ঞান; নিজস্ব সাবলীলতায় তাঁর গদ্য সমৃদ্ধ। তাঁর স্টাইলে কৃত্রিম প্রচেষ্টাও নেই। তাঁর গদ্য ক্লান্তিহীন চর্চার ফসল হয়েও অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে প্রচেষ্টার চিহ্ন।[৫০] সমকালীন লেখকদের চেয়ে তাঁর গদ্যশৈলী কতটুকু স্বতন্ত্র ছিল; স্বল্প দৃষ্টান্তে দেখে নিলেও তা বোঝা যায়। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর দুজন সৃজনশীল লেখকের কথা বুদ্ধদেব বসু নিজে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন– সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে। কারুর গদ্যশৈলী বিবেচনায় অবশ্য একথা স্মর্তব্য যে, লেখকের ব্যক্তিত্ব শৈলীশাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি 'variable' বা চল মাত্র তা 'constant' বা ধ্রুবক নয়। এ কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় মাত্রায় ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য ঘটলেও

সাধারণভাবে গদ্যের সার্বজনিক অংশই বেশি থাকে। যেমন বুদ্ধদেব বসু তাঁর শব্দচেতনায় ধ্বনিকে সাজিয়ে, অন্বয়কে কিছুটা পরিবর্তন করে নিজের শৈলী আলাদা করে নিলেও তাঁর গদ্যশৈলী অবোধ্য হয়ে ওঠে নি। সমকালে জীবনানন্দ দাশ-এর গদ্যের 'স্টাইল'ও স্মরণীয়; আলোচ্য হতে পারেন বুদ্ধদেব বসুর সমকালীন 'সবুজপত্র' গোষ্ঠী প্রভাবিত এবং 'পরিচয়' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৬১)। "জীবনানন্দের আলাপচারিতা, বিষ্ণু দে-র স্বরচিত ভাষাকুহেলিকা আর সুধীন দত্তের পরিশীলিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রবন্ধাবলিতে যে-আচ্ছাদন রচনা করে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনেক সময়ই সেই ব্যূহ ভেদ করে বক্তব্যে পৌঁছানো আয়াসসাধ্য, এমনকি অসম্ভবও হয়ে ওঠে। বক্তব্যের সমর্থনে চার জনের প্রবন্ধ থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হল "[৫১] :

১. লেখক হিসেবে আমি অবহিত হয়তো, – কিন্তু অসমর্থ। আমার সৃষ্টিপন্থাও সূর্য ও তপতীকে আশ্রয় করে; হয়তো তপতীকেই অবলম্বন করেছে বেশী– কোনও এক ভবিষ্যতে বিশেষ করে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য।[৫২]

জীবনানন্দ দাশ

২. একাধিক বিবেচকের বিচারে আমি নাকি দেশদ্রোহী; ... কিন্তু সেখানে বাদানুবাদ যদিও আপাতত অনাবশ্যক, তবু আমার আত্মদর্শন অনেকান্ত; এবং তাতে বাহ্যজ্ঞান শুদ্ধ স্বগত অভিভূতির মুখাপেক্ষী বলেই, তার সঙ্গতি শুধু স্কিৎসোফ্রেনিয়া নামক চিত্তভ্রংশের অনন্য প্রতিবন্ধক নয়, প্রাণ ধারণেরও অদ্বিতীয় প্রকরণ।[৫৩]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৩. আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম যে এই উচ্চাশা (ভালো কবিতা রচনা) পূরণ করতে হলে আমাকে ছাড়তে হবে অনেক প্রলোভন ও তাৎকালিক তৃপ্তি; ভুলে যেতে হবে হৃদয়ের অনেক ক্ষণচাঞ্চল্য, তার বহির্জগতের অনেক আন্দোলন ও ঘটনা। বিশ্বাস জন্মালো কবিতা লেখাও একটা কাজ ... তার জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হয়।[৫৪]

বুদ্ধদেব বসু।

৪. অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত এই দু'য়ের মধ্যে নির্ভুল যোগাযোগ আধুনিক শিল্পীর প্রেরণা অর্জন করে একাধারে তার আন্তরিকতা ও তার বিশিষ্ট আততি। ... (ঊর্বশী ও আর্টেমিস) কবিতাটিতে ... ঊর্বশী প্রতীকের কেন্দ্রের বিপরীত কাব্যাবেগ দানা বেঁধেছিল আর্টেমিস রূপে, শুচি কৌমার্যের তনু দেবী, চন্দ্রের হিম-অধিষ্ঠাত্রী, শিকারের দেবতা আর্টেমিসেই।[৫৫]

বিষ্ণু দে।

উদ্ধৃতিসমূহের প্রতিটিই নিজ কাব্যদর্শন বিষয়ে ভাবনা তথা আত্মসমালোচনায় ঋদ্ধ। জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যভঙ্গি স্বগতোক্তির মতো; বিষ্ণু দে-র ভাষাকুহেলিকাই বাক্যটিকে যুগপৎ দুরূহ ও অবোধ্য করে তুলেছে। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে ভাষার প্রাঞ্জলতা। স্থূলভাবে বললে যেকোনো

গদ্যরীতিকে দেখা যেতে পারে দুই ভাবে– বাকচাতুর্য সমন্বিত গদ্যভঙ্গি এবং সংক্রামক গদ্যভঙ্গি। প্রথমোক্ত ধারায় বক্তব্যের চেয়েও ভাষার কারুকাজ ফুটে ওঠে; প্রাধান্য পায় বক্তব্যের উপস্থাপনা। দ্বিতীয় ভঙ্গিতে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার ব্যবহার পাঠককে নিবন্ধের গভীরে অবগাহনে বাধ্য করে।[৫৬] বুদ্ধদেব বসুর গদ্যভঙ্গি উক্ত দুই ধারাতেই সমান পরিদর্শিতায় প্রতীয়মান হয়।

তথ্য নির্দেশ

১ উদ্ধৃত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা : বুদ্ধদেব বসু', *আমি কে, তা মনে রেখ* (বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মারক সংকলন), বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০, পৃ. ১২।

২ সুবীর রায় চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য', *আমি কে, তা মনে রেখ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩।

৩ সুবীর রায় চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

৪ উদ্ধৃত, তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'বুদ্ধদেব বসু : কবিতার শিল্পী, গদ্যের স্থপতি', *বুদ্ধদেব বসু: কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রতে*, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১১৫

৫ ড. অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা* (তৃতীয় খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্যমন্দির, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. ১৭৬

৬ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা : বুদ্ধদেব বসু', *আমি কে, তা মনে রেখ* (বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মারক সংকলন) পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯

৭ হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'শিল্পিত স্ববিরোধ : প্রবন্ধের শিল্পী', *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষনে* (তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ২১৯

৮ 'সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সমালোচক বুদ্ধদেব বসু', *উত্তারাধিকার* (নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত) ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৯০

৯ হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'শিল্পিত স্ববিরোধ : প্রবন্ধের শিল্পী', পূর্বোক্ত পৃ. ২২৩

১০ অরুণকুমার সরকার, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ', *কলকাতা* (জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত) সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারী ১৯৬৯, পুনঃপ্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা ২০০২ পৃ. ১০০

১১ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র. প্র. ২০০৫, পৃ. ২৯৬-৯৭

১২ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৮

১৩ বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা', *কালের পুতুল* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মে ১৯৯৭, পৃ. ৭৩

১৪ বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা শিশুসাহিত্য', *সাহিত্যচর্চা*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মে ২০০৯, পৃ. ৫৭

১৫ অলোক রায়, 'গদ্যের কণ্ঠে তালমান-ছেঁড়া লিরিক', *বুদ্ধদেব বসু: মননে অন্বেষণে*, (তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), পূর্বোক্ত পৃ. ৭৬

১৬ 'তেমনি বাঁধা-ছন্দ থেকে গদ্যের দিকে নয়, গদ্যকেই তিনি তুলে নিতে চান স্পন্দনমহিমায়। বাঙলা কবিতার ছন্দ অভ্যাসে তিনিও শেষ অবধি মুক্তিই খোঁজেন, তবে ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দে মুক্তি।' শঙ্খ ঘোষ, 'ছন্দের বারান্দা' (১৩৭৮), উদ্ধৃত, সুবীর রায় চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য', *কলকাতা* (জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত), পৃ. ১২৬।

১৭ সুবীর রায় চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

১৮ "আমার কাছে- প্রত্যেক আধুনিক লেখকের কাছে- বিশেষ করে আমার কাছে আপনি দেবতার মত। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি।" 'বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : রবীন্দ্রনাথকে', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১, পত্র ১, উদ্ধৃত, সুবীর রায় চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য', পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৫

১৯ সুবীর রায় চৌধুরী, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩০

২০ প্রথম চৌধুরী 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ (আনন্দ রায় সম্পাদিত), বর্ণালী, কলিকাতা, প্র.প্র. ১৯৭৮, পৃ. ৫

২১ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত পৃ. ৯১

২২ "যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁর (বুদ্ধদেব বসু) প্রবন্ধের মূল লক্ষণ কী, তাহলে হয়তো বলব, তাঁর গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও সংবেদন-মননের সম্মিলন.... যে প্রবাহ তাঁর গদ্যের গোড়ায় ছিল তা শেষে এসে ঈষৎ কমে গিয়েছিল, বদলে পাওয়া যাচ্ছিল এক ভাবনাস্পন্দ যাকে তথ্য ও যুক্তির উপর একটু বেশী নির্ভর করতে হয়। তাঁর সেই আগেকার 'আমি' অন্তর্হিত না হয়ে থাকলেও অন্তরালবর্তী হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো পর্যায়েই তাঁর গদ্যকে দুরূহ বলা যাবে না। তিনি স্বচ্ছ, তিনি প্রাঞ্জল এবং সেই বিচারে সুধীন্দ্রনাথের বিপরীত।" অমিয় দেব, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ,' *বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য* (দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্র. প্র. জুলাই ২০০৫, পৃ. ২৬৪

২৩ বুদ্ধদেব বসু, 'কবি রবীন্দ্রনাথ', *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭

২৪ বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা শিশু সাহিত্য', পূর্বোক্ত পৃ. ৫৬

২৫ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা : বুদ্ধদেব বসু', পূর্বোক্ত পৃ. ৯

২৬ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ এ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, চিঠিপত্র-১৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, , উদ্ধৃত, সমীর সেনগুপ্ত, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, বিকল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৭৮-৭৯

২৭ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), উদ্ধৃত, সুবীর রায় চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

২৮ উদ্ধৃত, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, বুদ্ধদেব বসুর পত্রগুচ্ছ, পত্রলেখা, কলকাতা, প্র. প্র. মার্চ ২০১০, পৃ. ১০২-১০৩

২৯ উদ্ধৃত, সুবীর রায় চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১

৩০ শিবনারায়ণ রায়, 'বাংলা গদ্য ও বুদ্ধদেব বসু', *বৈদগ্ধ্য* (সম্পাদক শেখর বসু রায়), বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, কলকাতা, মে ১৯৯৯, পৃ. ১৩

৩১ বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে', *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৭, পৃ. ৪৪-৪৬

৩২ বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা : শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা' *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৯, পৃ. ৭

৩৩ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'ভাবুকের গদ্যচিন্তা : বুদ্ধদেব বসু', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৩৪ বুদ্ধদেব বসু, *কবিতার শত্রু ও মিত্র : একটি খোলা চিঠি*, এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলিকাতা, প্র. প্র. আগস্ট ১৯৭৪, পৃ. ২১-২২

৩৫ আশিসকুমার দে, 'আকর্ষক গদ্যশৈলী : অব্যর্থ তীরন্দাজ', বুদ্ধদেব বসু: মননে অন্বেষণে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৩৬-৩৭ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিশেষণ প্রিয়তায় বৌদ্ধিক বাগ্‌বিধি', *বুদ্ধদেব বসু : সঙ্গ-প্রসঙ্গ*, (গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), পত্রলেখা, কলকাতা, প্র.প্র. মার্চ ২০০৮, পৃ. ৭৫-৭৬

৩৮ বুদ্ধদেব বসু, 'মেঘদুত' কাব্যের ভূমিকা (১৯৫৭), *কালিদাসের মেঘদুত*, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৯

৩৯ নীলরতন সরকার, 'কবির প্রবন্ধ : কলকব্জার কথা' *জলার্ক* (মানব চক্রবর্তী সম্পাদিত) প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা ২০০৮, পৃ. ১৭১

৪০ বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : অর্কেস্ট্রা', *কালের পুতুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৪১-৪২ উদাহরণসমুহ নির্বাচিত হয়েছে *সাহিত্যচর্চা*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মে ২০০৯ এবং *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৭ থেকে

৪৩ বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি', সঙ্গ: নি:সঙ্গতা / রবীন্দ্রনাথ, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

৪৪ বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', *সাহিত্যচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৪৫-৪৬-৪৭ উদ্ধৃত, আশিসকুমার দে, 'আকর্ষক গদ্যশৈলী : অব্যর্থ তীরন্দাজ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬-২০৭

৪৮ অশোক মুখোপাধ্যায়, 'বুদ্ধদেব বসুর বানান ভাবনা', *অহর্নিশ*, (শুভাশিস চক্রকর্তী সম্পাদিত) বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা (দশম বর্ষ বিশেষ সংকলন), অশোকনগর, চব্বিশপরগনা ২০০৮, পৃ.১১৯

৪৯ সুবীর রায়চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

৫০ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ধৃত, ওমর কায়সার, 'বুদ্ধদেব বসুর চোখে রামায়ণ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' *উত্তরাধিকার*, বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮ পৃ. ১০৭

৫১ নীলরতন সরকার 'কবির প্রবন্ধ : কলকব্জার কথা', *জলার্ক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৫২ *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র*, গতিধারা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৪৫

৫৩ *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ*; দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৯৯

৫৪ বুদ্ধদেব বসু, 'কবি ও কবিতা', *দেশ* (সাহিত্য সংখ্যা) কলকাতা, বাংলা ১৩৭৯, পৃ. ২০৫

৫৫ বিষ্ণু দে, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ২৪৪

৫৬. পায়েল সেনগুপ্ত, 'বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরীতি : ব্যক্তিত্বের অবয়ব নির্মাণ', *জলার্ক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

উপসংহার

সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিচারকে এক সমন্বিত অনুশীলনে পরিণত করেছেন, যে শ্রমের মাঝে যুগপৎভাবে মিশে আছে সৃষ্টির অবিরল আগ্রহ আর মনস্বিতার নিষ্ঠা। তাঁর শিল্পদর্শনের বিনির্মাণ, তাঁর আত্মপ্রকাশের শব্দময় রীতি-সব কিছুর পেছনে তাঁর সময়ের বাস্তবতাকে স্বীকার করেও বলা যায়, পূর্বসুরীদের থেকে তিনি নানা মাত্রায় আলাদা। সমাজ-সভ্যতার অনিবার্য অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য, শিল্প সাহিত্যে রূপান্বিত বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্যতা প্রভৃতিকে তিনি দেখেন নেতিরূপে, তাই 'অনন্য মানবিক চিত্তের উদ্বোধন ও অভিব্যক্তি ঘটানো মানুষের আত্মার পক্ষে রহস্যময় অবিচ্ছেদী প্রয়োজন হল শিল্পকলা'–বুদ্ধদেবের মতে তা মানুষের জন্য অনিবার্যও বটে। 'রোমান্টিকতা', 'আধুনিকতা' কিংবা 'প্রতীকবাদী' শিল্প আন্দোলন তাঁকে আকৃষ্ট করলেও আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ তাঁর কাছে মতবাদ অতিক্রান্ত এক নতুন শিল্পস্বভাবের নাম, যার দেশ-কাল সীমার বাইরেও বৈশ্বিক চরিত্র আছে, যা নিরন্তর শিল্পের সময়-সঞ্জাত স্বরূপ অনুধাবন ও সর্বোপরি শিল্প সাহিত্যের নিরন্তর অনুশীলনকে নিশ্চিত করে। পশ্চিমের গতিশীল তীব্রতা ও সমান্তরালে প্রাচ্য ঐতিহ্যলব্ধ শিল্প-সাহিত্যের সংহত অভিজ্ঞান– এ দুইয়ের প্রতিই সমান আকর্ষণের যে দ্বন্দ্ব তাঁর নিত্যসহচর ছিল বলে তিনি স্বীকার করেছেন, নব্য বাস্তবতায় এটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া না হয়ে অনায়াসে ব্যাখাত হতে পারে 'সৃজনাত্মক অভিভব' হিসেবে। সাহিত্য-সৃষ্টির পেছনে অন্তঃপ্রেরণা বা 'দৈবাবেশের' বিশ্বাসের সাথেই তিনি যা বুঝে নিয়েছেন তা হল সচেতন বিনিমার্ণ তথা ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ।

সমালোচনা বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে একেবারে অভিনব নয়, তবে এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভঙ্গির বলে মনে হয়। স্রষ্টার মত সৃজনক্ষমতা, পাঠক বা ভোক্তার মত আস্বাদনে সক্ষম মন- এই দুইয়ে মিলে সৃষ্টি করেছে তাঁর সমালোচক সত্তাকে। ঔদার্য, সততা, নিষ্ঠা, ইতিবাচকতা, সংবেদনশীলতা, সৃষ্টির প্রতি গভীর আবেগ ও দরদ– এই সবই তাঁর সমালোচনার গুণ হিসেবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। সমালোচনার তিনি প্রবক্তা বটে; কিন্তু তাঁর বিচাররীতি সাধারণভাবে কোনো সমালোচনাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়- মার্কসীয় বীক্ষা কিংবা জ্যাঁ দেরিদা, রলাঁ বার্ত-এর বিনিমার্ণবাদ, কাঠামোবাদে তাঁকে জরিপ করা কঠিন। সমালোচক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যই এখানে যে তাঁর নিজস্ব কোনো মতবাদ বা অনুসৃত তত্ত্ব নেই; রচনাটিকে নতুন আবিষ্কার হিসেবে গ্রহণ করে তিনি তাঁর সুবিস্তৃত সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে ও একজন একান্ত সহৃদয় পাঠক হিসেবে তিনি আলোচ্য সৃষ্টির মুখোমুখি হন। আর সেই সৃষ্টির পাঠসঞ্জাত আনন্দ তথা রসোপভোগের দ্বারা নিজেকে অধিকৃত করে

থাকেন। এইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনার ভঙ্গি 'বিম্বধর্মী' (impressionistic) বা সমালোচকের নিজস্ব উপভোগ নির্ভর বলে মনে হয়। তবে তাঁর অনুশীলিত সংস্কৃতিসম্পন্ন বিচারক সত্তা প্রচ্ছন্ন থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকর্মকেই প্রধান করে দেখেন বলে বিভিন্ন চরিত্রের লেখকদেরকে আবিষ্কার করতে, স্বাগত জানাতে ও তাঁদের প্রচারক হতে পেরেছেন। জীবনানন্দ দাশ ও সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুধীন্দ্রনাথ, বোদ্‌লেয়ার ও রিলকে–নানান আশ্লেষে নিজেকে সমর্পণ করেছেন বুদ্ধদেব। অর্থাৎ সমালোচনার জন্য তিনি জোর দেন কবি বা সাহিত্যিকের নিজস্ব চরিত্রের ওপর। 'বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গণবিগ্রহ মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত তা থেকে বের করে প্রকৃত স্বরূপে তাঁকে দাঁড় করানোই হোক রবীন্দ্রচর্চা– রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় এ-ই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় চাওয়া । রবীন্দ্র-সাহিত্যকর্মের সৃষ্টির সমগ্রতার সন্ধানে তাঁর মননশীল পর্যবেক্ষণই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রূপগত বিবর্তন ও শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতির প্রতি সবেচেয়ে গুরুত্ব দেন তিনি– যার ফলে সমকালীন ও উত্তরকালীন রবীন্দ্র সমালোচনায় তিনি মেলবন্ধনকারী হয়ে ওঠেন। অগ্রজ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সমালোচনায় তাঁর প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে তত্ত্ব ও তথ্যকে অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁদের সৃষ্টিকর্মকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন।

সাহিত্যপাঠ ও চর্চার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ অর্থাৎ এর পরিসর হওয়া উচিৎ বৃহৎ; আপন দেশীয় সমাজব্যবস্থা কিংবা সংস্কৃতি-ইতিহাস পাঠের মধ্যে সাহিত্যের স্বরূপ অনুসন্ধানের সঙ্গেই সাহিত্যপাঠে প্রয়োজন বিশ্ববোধ ও তুলনামূলক বিচার– সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশে এ ধরনের মতাদর্শে তিনি গোড়া থেকেই বিশ্বাসী। তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ ও সার্থকতা নিয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপনের পথ বেছে নিয়ে পঞ্চাশের দশকেই ভারতবর্ষে তুলনামূলক সাহিত্যের মত একটি ব্যতিক্রমী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যপাঠকে সংকীর্ণমনস্কতা থেকে মুক্তি দেবার পথ প্রদর্শন করেন বুদ্ধদেব। তুলনামূলক বিচার ধারার পদ্ধতিকে কেবল একটা পদ্ধতি হিসেবে নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাবনাসমৃদ্ধ হয়ে ওঠার উপায় হিসেবে একে বিচার করেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার করতে চেয়েছেন– বুদ্ধদেব বসু সেই ধারাকেই আরো বিস্তৃত এবং গভীরতর পরিসরে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জীবনানন্দ ও ইয়েট্‌সকে তিনিই প্রথম সমধর্মী বলে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু আধার ও আধেয়ের সামঞ্জস্যকে শিল্পের সফলতার শর্ত মনে করলেও তাঁর সাহিত্যবিচারে আঙ্গিকগত বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে। সমালোচ্য বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করেছেন ছন্দ-মিলে-উপমা

কিংবা গাঠনিক সংহতি। আঙ্গিকের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি নির্ণয় করেছেন লেখকের শক্তিমত্তা। কাব্যের রূপগত বিচারপদ্ধতির প্রয়োগ বুদ্ধদেব বসুর আগে অনেক সমালোচকই করেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের একটি উজ্জ্বল কৃতিত্ব কথাসাহিত্যের মুল্যায়নে আঙ্গিকনির্ভর বিশ্লেষণের প্রবর্তনা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ছোটগল্প ও প্রবন্ধের বিচারে তাঁর ভাষা ও ফর্মকেন্দ্রিক পর্যালোচনা বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষত রবীন্দ্র-উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর ভূমিকা কেবল ঐতিহাসিক নয়, ভাষারীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তা অনতিক্রমনীয়।

সমালোচক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি– কোনো বিশেষ রচনা নয়, কোনো বিশেষ লেখককে প্রতিষ্ঠা দেওয়াও নয়, শ্রেষ্ঠ কীর্তি– সাহিত্যের মুল্য সম্পর্কে তাঁর সমাজকে সজাগ করা। সাহিত্য সৃষ্টি করে, সাহিত্যের মূল্যের কথা বলে তিনি সাহিত্যের জন্যই পূর্বাপর সংগ্রাম করে গেছেন। আর সাহিত্যগুণকে আবিষ্কারের জন্য সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টি করে– এমন সমালোচনা যে আবশ্যক এই মতের প্রচারকও তিনি। তাই নিজের সাহিত্যরুচির সীমানা অনুধাবন করেও একজন উল্লেখযোগ্য সম্পাদক হিসেবে, একজন গভীর সাহিত্যনুরাগী হিসেবে নবসাহিত্যকদের সমালোচনা করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অনন্য প্রতিভাকে শনাক্ত করা সমালোচকের একটি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করেছেন তিনি। তাই তাঁর স্বীকৃতিতে আবিষ্কৃত ও প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন সুকুমার রায়, জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ আরো অনেক মেধাবী সাহিত্যিক।

বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসুর আরেক উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর অসামান্য গদ্যশৈলী। সাহিত্যসমালোচনার ভাষায় সাহিত্যিকের ব্যক্তিপ্রতিভা এবং স্বোপার্জিত বৈদগ্ধ্য একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যে এর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর শব্দ, তাঁর শৈলী কিংবা ব্যঞ্জনা শব্দ নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষায় বুদ্ধদেব গদ্যে রয়েছে নিজস্ব স্বরভঙ্গি। ব্যক্তিত্বের চিহ্নস্মারক হয়ে সেই ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের পরেই বাংলা গদ্যে সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেবের সমকালীন কবি কিংবা লেখকেরা যখন বাইরের ঘটনাবলী এবং বস্তুভিত্তিক দৃষ্টিচেতন (অবজেক্টিভিটি) শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন, বুদ্ধদেব সে পথে না গিয়ে আত্মসামগ্র্যকে (সাবজেক্টিভিটি) শিল্পাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মন্ময়তাও বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে না। তা বস্তুরই ভাবময় রূপ, সমাজ প্রতিবেশেরই উৎসারণ। বুদ্ধদেবের সমালোচনা ভাবনাবলি তাই সমাজ-বিবিক্ত নয়। সমালোচনায় যদিও তিনি পদ্ধতি হিসেবে

ঐতিহাসিক সাহিত্য বিচার এককভাবে স্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁর রবীন্দ্র অথবা আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক নানা সমালোচনায় দেশকাল সমাজকাঠামো তথা সময়ের অনিবার্য প্রভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই তাঁর বিচারভঙ্গিকে 'ইমপ্রেশনিস্টিক' বলা যায়। তবে তাতে সমালোচ্য বস্তু ও এর সাথে সম্পৃক্ত দেশকাল সময়-সঞ্জাত কার্যকারণ সম্পর্কিত যৌক্তিক বিশ্লেষণও রয়েছে। শিল্প সম্পর্কে তাঁর যে দর্শন– সেখান থেকে মূলত সমকালে অন্যের সাথে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সূত্রপাত- আর সেই স্বাতন্ত্র্য তাঁর প্রতিভা ও শ্রমের মিলনের হয়ে উঠেছে ইতিবাচক।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ (কালানুক্রমিক)

১. *কালের পুতুল* : নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৭ (১৯৪৬)

২. *An Acre of Green Grass* : Papyrus, Calcutta, reprint 1982 (1948)

৩. *সাহিত্যচর্চা* : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৬ (১৯৫৪)

৪. *রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য* : নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৩ (১৯৫৫)

৫. *স্বদেশ ও সংস্কৃতি* : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০ (১৯৫৭)

৬. *কালিদাসের মেঘদূত* (অনুবাদ) : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭৫ (১৯৫৭)

৭. *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* (অনুবাদ) : নাভানা, কলকাতা, ১৯৬১ (১৯৬১)

৮. *Tagore : Portrait of A Poet* : Papyrus, Calcutta, Enlarged Edition 1994 (1962)

৯. *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ* : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৬১ (১৯৬৩)

১০. *কবি রবীন্দ্রনাথ* : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৭ (১৯৬৬)

১১. *হোল্ডার্লিনের কবিতা* (অনুবাদ) : বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৪ (১৯৬৭)

১২. *রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা* (অনুবাদ) : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১ (১৯৭০)

১৩. *কবিতার শত্রু ও মিত্র* : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৭ (১৯৭৪)

খ. সহায়ক-গ্রন্থ

১. অমূল্য সরকার : *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০১

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা/ বাংলা ছোটগল্পের একশ' বছর* (১৮৯১-১৯৯০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *বীরবল ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *সমালোচনার কথা*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৫

৬. অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২য় সংস্করণ ১৩৮৬

৭. আজহার উদ্দিন খান : *বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯

৮. আনন্দ রায় (সম্পাদক) : *বুদ্ধবেদ বসু : নানা প্রসঙ্গ*, বর্ণালী, কলিকাতা, ১৯৭৮

৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ : *শুদ্ধতম কবি*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ৩য় সংস্করণ, ২০১১

১০. আবু সয়ীদ আইয়ুব : *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৩

১১. ক্লিন্টন বি সিলি : *অনন্য জীবনানন্দ/ জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক জীবনী* (ফারুক মইনউদ্দীন অনুদিত), প্রথমা, ঢাকা ২০০১

১২. ক্ষেত্রগুপ্ত : *মধুসূদন : কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮

১৩. গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *বুদ্ধদেব বসু : সঙ্গ-প্রসঙ্গ*, পত্রলেখা, কলকাতা ২০০৮

১৪. ড. অধীর দে : *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা* (১-৩ খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা-৭, নব সংস্করণ, ১৪০৬

১৫. ড. অভিজিৎ মজুমদার : শৈলীবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র. জানুয়ারি ২০০৭

১৬. ড. আশা দত্ত : *বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার ধারা*, গ্রন্থালয় প্রা. লি. কলকাতা ১৯৯৭

১৭. তপোধীর ভট্টাচার্য : *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২

১৮. তরুণ মুখোপাধ্যায় : *বুদ্ধদেব বসু : কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রতে*, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা ২০০৮

১৯. তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৮৮

২০. দময়ন্তী বসু সিং (সম্পাদক) : *বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য 'কবিতা' থেকে* (প্রথম খণ্ড, সম্পাদকীয় ও সমালোচনা), বিকল্প, কলকাতা ২০১০

২১. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য*, করুণা, কলকাতা ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

২২. দীপ্তি ত্রিপাঠী : *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৭

২৩. জীবনানন্দ দাশ : *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র*, গতিধারা কলকাতা ২০০০

২৪. জীবনানন্দ দাশ : *জীবনানন্দ দাশের কবিতা সমগ্র*, অবসর, ঢাকা ২০১৩

২৫. পবিত্র সরকার : গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২

২৬. প্রমথ চৌধুরী : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২

২৭. প্রণব ভট্ট (সম্পাদক) : *জীবনানন্দ নিয়ে*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা ২০০১,

২৮. বেগম আকতার কামাল : *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, ইত্যাদি, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০১০

২৯. বেগম আকতার কামাল (সম্পাদক) : বুদ্ধদেব বসুর *নির্বাচিত প্রবন্ধসমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ২০১৩

৩০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, প্র. প্র. ২০০৬

৩১. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় : *সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯

৩২. বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭

৩৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) : *বুদ্ধদেব বসু/ জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বর্ণায়ন, ঢাকা ২০১১

৩৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) : বুদ্ধদেব বসু, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, বর্ণায়ন, ঢাকা ২০০৯

৩৫. বিষ্ণু দে : *এলিয়টের কবিতা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭

৩৬. বিষ্ণু দে : *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৯৭

৩৭. ভূঁইয়া ইকবাল : বুদ্ধদেব বসু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

৩৮. মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : *স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮

৩৯. মাহবুব সাদিক : *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১

৪০. মোহিতলাল মজুমদার : *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি কলিকাতা, ৮ম সংস্করণ ১৯৯৭

৪১. মুহম্মদ মতিউল্লাহ (সম্পাদক) : *বুদ্ধদেব বসুর পত্রগুচ্ছ*, পত্রলেখা, কলকাতা ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

৪২. রফিকউল্লাহ খান : *রবীন্দ্র-বিষয়ক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (১-১৮ খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৬

৪৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ১৩৮১

৪৫. সুদক্ষিণা ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসু*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৭

৪৬. সিদ্দিকা মাহমুদা : *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা জুন ১৯৯২

৪৭. সুদীপ বসু : *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৯৭

৪৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ১৯৭৬

৪৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ ২০০০

৫০. সমীর সেনগুপ্ত : *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, বিকল্প, কলকাতা ২০০৮

৫১. সবিতা পাল : *বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস (আদিপর্ব)*, ফার্মা কে এল এম প্রা. লি. কলিকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৪

৫২. সরোজ বন্দোপাধ্যায় : *কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশন, কলিকাতা, প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৭৬

৫৩. সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, একুশে, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১

৫৪. হিমেল বরকত : সাহিত্য-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫৫. হীরেন চট্টোপাধ্যায় : *সাহিত্য-প্রকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪০২

৫৬. হুমায়ুন আজাদ : *আধার ও আধেয়*, আগামী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

গ. সহায়ক পত্রিকা

১. অহর্নিশ : (সম্পাদক- শুভাশিস চক্রবর্তী), বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, চব্বিশপরগনা, ২০০৮

২. উত্তরাধিকার : (সম্পাদক- নীলিমা ইব্রাহিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৪

৩. উত্তরাধিকার : (সম্পাদক- সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ), বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, বাংলা একাডেমী ২০০৮

৪. উলুখাগড়া : (সম্পাদক- সৈয়দ আকরম হোসেন), সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৫ এবং সংখ্যা : ১২, ফেব্রুয়ারি ২০১০

৫. একবিংশ : (সম্পাদক– খোন্দকার আশরাফ হোসেন), ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯০

৬. কলকাতা : (সম্পাদক- জ্যোতির্ময় দত্ত), সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারি ১৯৬৯, পুনঃপ্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা ২০০২

৭. জলার্ক : (সম্পাদক- মানব চক্রবর্তী), ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা ২০০৮

৮. দেশ : সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, বাংলা ১৩৭৯

৯. বিজ্ঞাপন পর্ব : (সম্পাদক- রবিন ঘোষ), কলকাতা, ৩৬তম বর্ষ : পৌষ ১৪১৫

১০. বৈদগ্ধ্য : (সম্পাদক- শেখর বসু রায়), বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, কলকাতা, মে ১৯৯৯

ঘ. সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ

1. Alokranjan Dasgupta : Buddhadeva Bose, Sahitya Akademi, New Delhi, 1977

1. Allen, Gay Wilson & Harry Clark: Literary Criticism (Pope to Croce), American Book Company, U.S.A 1941

2. T.S. Eliot : Selected Prose, Faber & Faber, London reprinted 1987

3. , Rene′ Wellek : Concept of Criticism, Yale University Press, Second Printing 1964

4. Wilfred L. Guerin, Earle Labor, Lee Morgan, Jeanne C. Reesman, & John R. Willingham : A Handbook of Critical Approaches to Literature, Oxford university press, 5th edition 2007